দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি: পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ

ভূমিকা ৩-১০

প্রথম অধ্যায় ১১-৭৬

ভারতে পরিবেশ ভাবনার বিবিধ ধারা-বৈচিত্র্য

১.০ ভূমিকা

১.১ প্রকৃতি ও পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক

১.২ নির্বাচিত সংস্কৃতপাঠ্যে পরিবেশ ভাবনা: বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত

১.৩ জৈন ও বৌদ্ধ পরিবেশ চিন্তা

১.৪ লোকায়ত ধারায় পরিবেশ

১.৫ আধুনিক কালের কয়েকটি পরিবেশ আন্দোলন

১.৬ রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা

১.৭ উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৭-১৩২

দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থান: স্বরূপ ও বিবর্তন

২.০ ভূমিকা

২.১ দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী: সাধারণ পরিচিতি

২.২ লৌকিক দেবদেবীর থান

২.৩ নির্বাচিত থানের উদ্ভব ও বিবর্তন

২.৪ থান ও লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি ভাবনা

২.৫ থানকেন্দ্রিক দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি ও উপকরণ

২.৬ লোকায়ত সমাজের মেলা-পার্বণ ও দক্ষিণবঙ্গের দেবদেবী

২.৭ দক্ষিণবঙ্গের নির্বাচিত লৌকিক দেবদেবীর থানের বিবরণ

২.৮ উপসংহার

তৃতীয় অধ্যায় *১৩৩-১৭৪*

ক্ষেত্রসমীক্ষা: পদ্ধতি, সমীক্ষা ও প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ

৩.০ ভূমিকা

৩.১ এলাকা ও বিষয় নির্বাচন

৩.২ ক্ষেত্রসমীক্ষার পদ্ধতি

৩.৩ বর্তমান সমীক্ষকের অভিজ্ঞতা ও সমীক্ষাপ্রাপ্ত মৌখিক আখ্যান

২.৪ উপসংহার

চতুর্থ অধ্যায় *১৭৫-২৫৩*

থানকেন্দ্রিক আখ্যানঃ পরিবেশবাদী দৃষ্টিতে বিচার ও বিশ্লেষণ

৪.০ ভূমিকা

৪.১ পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

৪.২ মৌখিক আখ্যানের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

৪.৩ থানকেন্দ্রিক আখ্যানের বিষয় বৈচিত্র

৪.৪ নির্বাচিত থানকেন্দ্রিক আখ্যানের পরিবশবাদী বিশ্লেষণ

৪.৫ উপসংহার

উপসংহার ২৫৪-২৫৮

পরিশিষ্ট- ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রাপ্ত আখ্যান ২৫৯-৩০০

গ্রন্থপঞ্জি ৩০১-৩১৪

ভূমিকা

কোনো জাতির যাপনচিত্রের মূল নকশা ধরা থাকে তার সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে। একটি জাতির উত্থান-পতন, তার ক্রমবিবর্তনের ধারা তার সাহিত্য ও পালিত আচার-সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। একটি জাতি আদিম স্তর থেকে বর্তমান স্তরে উন্নীত হওয়ার ইতিহাস নানা গ্রহণ-বর্জনের ইতিহাস। এই গ্রহণ-বর্জনের রাজনীতির কবলে পড়ে যে কোনও জাতির মূল স্বরূপ ও আদিকে খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টকর হয়। আসলে মানুষের দেহ ও মনের যে বিবর্তন তার অভিমুখ তথাকথিত 'সভ্য' হওয়ার দিকে। মানুষের এই সভ্যতার অভিমুখে যাত্রার জন্য তার অনেক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ফেলে আসতে হয়েছে। আর এর ফলে অনেক জাতির আত্মার কথা, তাদের নিজস্ব কথা আজকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। আর্য-অনার্য সংঘাত ও সমন্বয় এবং পরে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কবলে পড়ে বহু জাতির ইতিহাস ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। বাংলার শাস্ত্রীয় ও খাঁটি ব্রতের ইতিহাস পাঠ করলে এই বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়। যে কোনও জাতির রূপান্তরের ইতিহাস মোটের উপর এই রকম। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যেও যে কোনও জাতির প্রাণ ভ্রমরা লুকিয়ে থাকে তার লোকসংস্কৃতির মধ্যে। লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান বাইরের সামাজিক, রাজনৈতিক, সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন সময়ের বদলের মধ্যেও তার আদি ও মূল বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট হতে দেয় না। মানব সভ্যতার বিবর্তনের মধ্যেও লোকায়ত মানুষ তাদের সংস্কৃতির মূল ভাবকে অটুট রেখেছে বলেই লোকসংস্কৃতিকে জাতির আত্মা বলে অভিহিত করা হয়।

লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে আদিম অরণ্যচারী মানুষের পালিত সংস্কৃতি থেকে আজকের মানুষের সংস্কৃতির ও তার আচার-বিশ্বাসের ইতিহাস এই দেবদেবীর মধ্যে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেবদেবী মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনের মৌন সাক্ষী। মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনের নানা চিন্তাভাবনা থেকে শুরু করে তাদের কামনার বিচিত্র প্রকাশ এই দেবদেবীকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লৌকিক দেবদেবীর থান দেখতে পাওয়া যায়। লৌকিক দেবদেবীর থান লোকায়ত মানুষের কেবলমাত্র ধর্মের পরিসর নয়। লৌকিক দেবদেবী মানুষের প্রতিদিনের নানা সমস্যা, চাহিদা থেকে শুরু করে তার সুখ-দুঃখের সহায়। লৌকিক দেবদেবীর থান গ্রামের মধ্যে,

রাস্তার ধারে, পুকুরের পাড়ে বা গ্রামের প্রান্ত সীমানায় দেখতে পাওয়া যায়। লৌকিক দেবদেবীর এই অবস্থানের নিরিখেই এদের 'গ্রাম্য দেবদেবী' ও 'আঞ্চলিক দেবদেবী' হিসেবে অবিহিত করা হয়। লৌকিক দেবদেবী নিয়ে আলোচনা বা এদের নিয়ে যে গ্রন্থ দেখা যায় তা কতগুলি বিষয় নিয়েই সীমাবদ্ধ। এই আলোচনার মধ্যে দেখা যায় যে, লৌকিক দেবদেবীর মূর্তিভাবনা, এদের পূজাপদ্ধতি বা এদের মধ্য দিয়ে ধর্ম-সমন্বয়ের বিষয় কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তা আলোচনা করা। কিন্তু লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে অসংখ্য বিষয় আজ পর্যন্ত অবহেলিত বা অনালোচিত অবস্থায় পড়ে আছে। লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে এই অনালোচিত অংশের মধ্যে একটি হল এই দেবদেবীর আশ্রয়স্থল বা এদের থান। আমরা লৌকিক দেবদেবীর থানের স্বরূপ ও তার বিবর্তনের ইতিহাসকে পাঠের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের নানা অজানা ইতিহাস জানতে পারি।

দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থান এই সমস্ত এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকার কারণে গড়ে উঠেছে। জল-জঙ্গল ঘেরা ভৌগোলিক পরিসরে এখানকার মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে বাঁচতে হয়। এই সর্বাত্মক অসহায় পরিস্থিতিতে মানুষ কোনো অলৌকিক শক্তির কাছে আশ্রয় নিতে চেয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর থান নির্মাণের প্রাথমিক কারণ হলো মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার চাহিদা। দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থানগুলিকে নিতান্ত প্রাকৃতিকভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। এই থানগুলিকে দেখে মনে হতেই পারে যে, এই সমস্ত দেবদেবীকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। কেননা এই সমস্ত দেবদেবীর থানে মানুষের যত্নের অভাব দেখা যায়। থানগুলিকে দেখে প্রাথমিক ভাবে এমন চিন্তা হতেই পারে। কিন্তু বাইরের থেকে এই দেবদেবীর থানের যেটুকু দেখা যায় তা আসলে হিমশৈলের চূড়ার মতো স্বল্প। এই দেবদেবীর থানকে বিশদে পাঠ করলে লোকায়ত মানুষের নানা চিন্তাভাবনার বৃহৎ জগত প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

লৌকিক দেবদেবীর থানের বিবর্তন ধারায় ধরা আছে লোকায়ত মানুষের আদিম, অরণ্যকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার নানা ছাপ। এছাড়া থানগুলির ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে বুঝতে পারা যায়। আমরা দেখেছি যে, বহু দেবদেবীর থান কাঠখড়ের গণ্ডি টপকাতে পারেনি। লৌকিক দেবদেবীর বহু থান গাছের তলায়, ঝোপঝাড়ের মধ্যে, খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করে। আবার কোনো কোনো দেবদেবী খড়ের ছাউনিযুক্ত মাটির থানে

প্রজন্মের পর প্রজন্ম পূজিত হয়ে চলেছে। মানুষের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা আসা সত্ত্বেও এই থানের কোনো রকমফের হয়নি। আসলে এই সমস্ত দেবদেবী মানুষের আদিম, অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপনের সময় থেকে উঠে এসেছে। লৌকিক দেবদেবীর থান প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে অবস্থানের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের আদিম প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনযাপনের মানসিকতা প্রতিফলিত হয়। আবার বেশ কিছু থান মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশকে মেনে নিয়ে সুউচ্চ মন্দিরে পরিণত হতে দেখা যায়। ফলে লৌকিক দেবদেবীর থানের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের আদিম জীবনযাপনকে যেমন দেখা যায় ঠিক তেমন করেই মানব সভ্যতার বিকাশের ধারাকে বোঝা যায়। দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থান বাংলার ইতিহাসের বিরাট কালপর্বকে ধারণ করে আছে। লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরির ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে দেখলে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের নানা বিস্মৃত অধ্যায় সামনে চলে আসে। আমরা জানি যে, লৌকিক দেবদেবীর থান নির্মাণ ও বিস্তারের ইতিহাসে পাল ও সেন যুগ থেকে শুরু করে মুসলমান শাসকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। থানকেন্দ্রিক আখ্যানে তাই বল্লাল সেন, আলীবর্দী খাঁ প্রভৃতি শাসকের নাম উচ্চারিত হতে দেখা যায়। এছাড়া বাংলার জমিদারী শাসনের কালে বহু লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বহু থান তৈরিতে জমিদারের সরাসরি হস্তক্ষেপ দেখা যায়। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চল তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারার মধ্য দিয়ে লৌকিক দেবদেবীর থানকে জীবন্ত করে রেখেছে। লৌকিক দেবদেবীর থান লোকায়ত মানুষ সমবেতভাবে নির্মাণ করেছে। আবার কোনো ব্যক্তির দ্বারা, কোনো অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে এই সমস্ত থান তৈরি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক আখ্যানে থানের এই সমস্ত উৎপত্তির ইতিহাসকে ধারণ করে আছে। ফলে আমরা বলতে পারি যে, লৌকিক দেবদেবীর থানের মধ্যে বাংলার ইতিহাসের অনেক বিস্মৃত অধ্যায় এর মাটির দেওয়ালে লিখিত আছে। কিন্তু লৌকিক দেবদেবী নিয়ে গবেষণায় এই বিষয়টি সব সময় অবহেলিত হয়ে এসেছে। লৌকিক দেবদেবীর থানের উৎপত্তি থেকে শুরু করে এই থানে লোকায়ত মানুষের নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বাংলার অতীত ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য আমাদের সামনে হাজির হয়।

লৌকিক দেবদেবীর থান ও দেবদেবীর সম্পর্কে বিশদে জানতে গেলে কোনো বিদ্যায়তনিক পরিসরে বা কোনো পাঠ্য বইয়ের মধ্য দিয়ে এই জানা সম্ভব নয়। লৌকিক দেবদেবীর থান যেমন

উন্মুক্ত পরিসরে বিরাজ করে তেমনি এই থানকে জানতে চাইলে আমাদের ওই থানের কাছে যেতে হবে। আসলে লোকসংস্কৃতির যে কোনো পরিসর নিয়ে গবেষণা করতে গেলে ক্ষেত্রসমীক্ষা অনিবার্য। বাংলার মাঠ-ঘাট, নদীর পাড়ে অবস্থিত লৌকিক দেবদেবী ও তাদের থান সম্পর্কে জানতে চাইলে দিনের পর দিন ক্ষেত্রসমীক্ষা করেই জানা সম্ভব। এছাড়া লৌকিক দেবদেবীর থান ও দেবদেবীর পূজাচারের বিবর্তনের ইতিহাস তা জানতে গেলে এই সমস্ত দেবদেবীর থানে যে আচার-আচরণ পালিত হয় তাকে সামনে থেকে দেখা দরকার। লৌকিক দেবদেবীর থান ও তাদেরকে কেন্দ্র করে যে আখ্যান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে তাতে লোকায়ত মানুষের মনের বিচিত্র ভাবনা দেখা যায়। এই মৌখিক আখ্যান পেতে গেলে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নেই। ক্ষেত্র থেকে তথ্য ও পরে তত্ত্বের সহযোগে পাঠ করলে লোকসংস্কৃতির যে কোনোও বিষয়ের সম্পর্কে জানা সম্পূর্ণ হয়। ফলে লোকসংস্কৃতির যে কোনও উপাদানকে নিয়ে গবেষণা করতে গেলে ক্ষেত্রসমীক্ষা অপরিহার্য। এইজন্য বলা হয় লোকসংস্কৃতিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া গবেষণা একপ্রকার অসম্ভব।

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষায় বেশিরভাগ সময়ে দেখা যায় যে, সমীক্ষক সমীক্ষার সময় কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন ও ক্ষেত্রসমীক্ষার কয়েকটি পদ্ধতির দ্বারা চালিত হয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে। এর ফলে ক্ষেত্রসমীক্ষা নীরস ও প্রথাগত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু লৌকিক দেবদেবীর থানকে নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষায় এই প্রথাগত পদ্ধতিবিদ্যা দিয়ে সম্ভব নয়। লৌকিক দেবদেবীর থান সম্পর্কে জানতে গেলে দিনের পর দিন ক্ষেত্রে যেতে হয়। এবং ক্ষেত্রের ধরন ও সময় অনুযায়ী সমীক্ষার পদ্ধতি তৈরি করতে হয়। লৌকিক দেবদেবীর সম্পর্কে জানতে গেলে লোকায়ত মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এখানে ক্ষেত্রসমীক্ষার নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী তথ্য পেতে গেলে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কোনো বিদ্যায়তনিক পরিসরে লোকসংস্কৃতির গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষা নিরন্তর সময় ধরে হতে পারে না বা সমস্ত অঞ্চল জুড়ে হতে পারে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অঞ্চল নির্বাচন গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। এই অঞ্চল নির্বাচনের সময় ক্ষেত্রেসমীক্ষককে বিভিন্ন বিষয়কে মাথার রাখতে হয়। অর্থাৎ, কোন অঞ্চল সমীক্ষকের গবেষণার তথ্য নিয়ে সমৃদ্ধ বা সেই অঞ্চলের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের স্বরূপ কেমন? এই সমস্ত বিষয়গুলিকে

সমীক্ষকের অঞ্চল নির্বাচনের আগে ভাবতে হয়। এই অঞ্চল নির্বাচনের পরেই সমীক্ষককে ক্ষেত্রে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যদিও ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে নির্বাচিত অঞ্চলে পাইলট সার্ভে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পাইলট সার্ভের মধ্য দিয়েই এলাকার প্রাথমিক পরিচয় শুরু হয়। লৌকিক দেবদেবীর থান সম্পর্কে জানতে গেলে সমীক্ষিত অঞ্চল সম্পর্কে বিশদে জানা সবার আগে দরকার। ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাওয়ার আগে বেশ কিছু প্রস্তুতি দরকার। ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে এই প্রাক-ক্ষেত্রকর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে ভালোভাবে পরিকল্পনা করে নেওয়া ও প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ক্ষেত্রসমীক্ষার মৌলিক শর্ত হিসেবে ধরা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি বিজ্ঞান নির্ভর প্রক্রিয়া। ফলে ক্ষেত্রে অনাবশ্যক সময় নষ্ট করা মানেই ক্ষেত্রসমীক্ষাকে বিলম্বিত করা। যেটা বিদ্যায়তনিক পরিসরে গবেষণার জন্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় কাদের থেকে তথ্য নেওয়া হবে এই বিষয়ে সমীক্ষককে চিন্তাভাবনা করা জরুরি। ক্ষেত্রে গিয়ে সবার কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে এমনটা নাও হতে পারে। আবার সবার থেকে তথ্য নিতে গেলে তথ্যের মধ্যে নানা অসংগতি দেখা দিতে পারে। ফলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় এই তথ্যদাতাদের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক নানা তথ্য ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করতে গেলে সবসময় ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রথাগত পদ্ধতি কার্যকরী হয় না। সেক্ষেত্রে সমীক্ষক প্রয়োজন অনুসারে নিজের পদ্ধতি বদলে নিতে পারে। আসল কথা হলো, লৌকিক দেবদেবীর থানের আচার-সংস্কৃতি থেকে তার মৌখিক সাহিত্য সম্পর্কে জানতে গেলে ক্ষেত্রসমীক্ষার চিরাচরিত পদ্ধিতির যেমন সাহায্য নিতে হবে ঠিক তেমন করে ক্ষেত্রের অবস্থা বা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে হবে।

লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক গভীরভাবে যুক্ত। আসলে লৌকিক দেবদেবী আদিম মানুষের অরণ্যকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। লৌকিক দেবদেবীর থান ও এই দেবদেবীর মূর্তি ও পূজাপদ্ধতি ভালো করে দেখলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ভারতীয় সভ্যতার যাবতীয় বিকাশ তা প্রকৃতির অপার সান্নিধ্যের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক পরিবেশে প্রকৃতিকে রক্ষা করার মানসিকতা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ নানাভাবে তার চারপাশের পরিবেশকে রক্ষা করার কথা বলেছে। ফলে ভারতবর্ষের সমস্ত কর্ম ও প্রচেষ্টার মূলে

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিরায়ত সম্পর্কের ঐতিহ্য রক্ষা করার মানসিকতা প্রকাশ পায়। আবার লোকায়ত মানুষের সমস্ত কাজকর্মের সঙ্গে প্রকৃতি আত্মার আত্মীয়ের মতো জড়িয়ে আছে। লোকায়ত মানুষের প্রকৃতি নির্ভরতা তাদের আচার-সংস্কৃতির মধ্যে প্রকাশিত হয়। লোকায়ত মানুষের পরিবেশ রক্ষার মানসিকতা তাদের দেবদেবীকে পূজার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানুষ প্রকৃতির থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেছে। আর এইভাবেই মানুষের প্রকৃতি নির্ভরতা ও প্রকৃতি পূজা শুরু হয়েছে। মানব সভ্যতার পরবর্তী সময়ে এই প্রকৃতির নানা শক্তির উপর দৈবমহিমা আরোপ করেছে। এইভাবেই প্রকৃতিকেন্দ্রিক নানা দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছে। ফলে লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক খুবই নিবিড় তা বলাই বাহুল্য। লোকায়ত মানুষ লৌকিক দেবদেবীকে পূজার মধ্য দিয়ে আসলে তাদের চিরাচরিত প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের ইতিহাসকে টিকিয়ে রাখে।

আমরা জানি যে, ভারতবর্ষের সভ্যতা প্রকৃতির সঙ্গে হাত ধরাধরি করেই বিকশিত হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আজকের সময় পর্যন্ত সেই ঐতিহ্যবাহিত প্রকৃতি চেতনা নানা কাজকর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে পরিবেশ বিপন্নতার সময়ে দাঁড়িয়ে তাই অনিবার্য হয়ে পড়ে ভারতবর্ষের প্রকৃতি চেতনার ইতিহাসকে ফিরে দেখার।

আমরা প্রাচীন ভারতে প্রকৃতি চেতনার নানা স্তর পরম্পরাকে দেখতে পাই। বৈদিক ঋষিরা তপোবন কেন্দ্রিক জীবনযাপনের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে অপার সম্পর্কের কথা বলেছেন। বেদের নানা সূক্তে তাই বারবার করে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির মহিমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে দেখা যায়। সেখানে সূর্যকে সমস্ত প্রাণের আধার বলা হয়েছে আবার পৃথিবীকে মাতার সঙ্গে তুলনা করে তাকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। তাই পৃথিবীর উপাদানকে জোর করে কেড়ে নেওয়ার মানসিকতা এই সময়ে দেখা যায় না। প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থানের মধ্যে এই দেওয়া-নেওয়ার পরম্পরা বিকাশ লাভ করেছে। বৈদিক পরবর্তী সময়ে প্রকৃতিকে দর্শনের মধ্য দিয়ে অনেক উচ্চে স্থান দেওয়ার মানসিকতা দেখা যায়। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ও তার ভাবগম্ভীর অবস্থান মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে ও মানুষ প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার সঞ্চার করেছে। সভ্যতার ক্রমিক অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাপন থেকে শুরু করে তার চিন্তাভাবনার নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। আর অনিবার্যভাবে প্রকৃতি নিয়েও মানুষের চিন্তাভাবনা চিরাচরিত পথ থেকে সরে এসে অন্য খাতে বইতে লাগল। বৈদিক

যুগ বা তার পরবর্তী সময়ে মানুষ যেখানে প্রকৃতিকে 'মা' বলে সম্বোধন করছে পরবর্তী সময়ে প্রকৃতি সম্পর্কিত এই ধারণা টাল খেয়ে পড়ে। আসলে বেদ-পুরাণের পরবর্তী যুগে মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে সরে যায়। ভারতবর্ষের পরিবেশ চিন্তার ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে মানুষের প্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনার বদল হতে দেখা যায়। বৈদিক যুগ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের যুগে মানুষ প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে চলে যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্যের মনোভাব নিয়ে অত্যাচার করতে শুরু করে। মহাভারতে খাণ্ডবপ্রস্থ মানুষের এই মনোভাবের প্রতিফলন হিসেবে ধরা হয়। আবার অশোকের রাজত্বকালের সময় মানুষের প্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনার অনেক বদল ঘটেছে, না হলে কেন অশোক রাস্তার দুই পারে সামাজিক বনসৃজনের মতো করে বৃক্ষরোপণ করবে? আসলে এই সময় মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে শুরু করেছে, এই বৃক্ষরোপণ তার প্রমাণ। কিন্তু একসময়ে ভারতবর্ষে সর্বপ্রাণবাদের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সমস্ত প্রাণকে রক্ষা করার কথা উচ্চারিত হয়েছে। এই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় মানুষ প্রকৃতিকে সম্পদ হিসেবে দেখতে শুরু করে। ফলে এতদিনকার সম্পর্কের মজবুত ভীত মানুষের এই মানসিকতার জন্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর এর অনিবার্য ফল হিসেবে দেখা দিল পরিবেশ বিপন্নতা। বৈদিক যুগ বা তার পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের পরিবেশের ইতিহাস হল বিপন্নতার ইতিহাস। মানুষের ক্রমাগত ভোগের মানসিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতি থেকে দুই হাতে তারা সম্পদকে লুঠ করেছে। ফলে পরিবেশের স্বাভাবিক শৃঙ্খল ভেঙে পড়ে। এই পরিবেশ বিপন্নতা চরম আকার ধারণ করে নগর সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের নামে প্রকৃতিকে নির্বিচারে ধ্বংস করার জন্য। এর ফলে পরিবেশ রক্ষার জন্য নানা আন্দোলন শুরু হয়। এই সময়ে নানা সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। কল কারখানা, যন্ত্র সভ্যতার চরম বিকাশের জন্য, কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের ফলে প্রকৃতির জীবজ উপাদান সমূলে লোপাটের মুখে দাঁড়ায়। ফলে আজকের সময়ের পরিবেশের এই বিপন্নতার ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসকে জানতে গেলে প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তার সঙ্গে বর্তমানের পরিবেশেরচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা জরুরি হয়ে পড়ে।

আমরা আগেই বলেছি যে, লৌকিক দেবদেবী লোকায়ত মানুষের সব সময়ের সাক্ষী। আর এই সমস্ত দেবদেবী মানুষের আদিম অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন থেকে উঠে এসেছে। ফলে এই দেবদেবীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নিবিড়ভাবে যুক্ত। লোকায়ত মানুষের এই দেবদেবীর পুজোর মধ্যে প্রকৃতিকে রক্ষা করার মানসিকতা প্রকাশিত হচ্ছে। আজকের সময়ে যখন আমরা প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি, প্রতি মুহূর্তে নগরসভ্যতা প্রকৃতিকে গ্রাস করে চলেছে। সেখানে এই সমস্ত দেবদেবীর মাধ্যমে লোকায়ত মানুষ প্রকৃতিকে পুজো করছে ও পরিবেশের সমস্ত প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলছে। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মৌখিক আখ্যান গড়ে উঠেছে, সেখানে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়। লৌকিক দেবদেবী প্রাকৃতিকভাবেই থাকতে ভালোবাসেন এই বিষয় নিয়ে অসংখ্য মৌখিক আখ্যান লোক মুখে প্রচলিত। এই সাহিত্যগুলির মধ্যে মানুষের চিরায়ত প্রকৃতি লগ্ন হয়ে বেঁচে থাকার অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক পাঠ করার জন্য পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বলে একটি তাত্ত্বিক অবস্থান গড়ে ওঠে। এই সাহিত্যতত্ত্বটি মানুষের প্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনার খতিয়ানকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। মানুষ কোন মূল্যবোধের দ্বারা প্রকৃতিকে দেখছে বা সাহিত্য তৈরিতে প্রকৃতি কীরকম ভূমিকা পালন করছে এই সাহিত্যতত্ত্ব তার মৌলিক জিজ্ঞাসার মধ্যে রাখে। এই সাহিত্যতত্ত্ব মানুষের চিন্তাভাবনা ও তার পালিত সংস্কৃতিতে প্রকৃতিকে কীভাবে রক্ষা করছে সেই বিষয়টিকে বুঝতে চায়। এই সাহিত্যতত্ত্বের ফলে সাহিত্য ও মানুষের পালিত সংস্কৃতিকে পাঠ করার নতুন দিগন্ত খুলে যায়। এই তত্ত্বের ফলে লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সাহিত্য বা এই সমস্ত দেবদেবীকে ঘিরে মানুষের আচার-অনুষ্ঠানকে পাঠ করা বা বিচার-বিশ্লেষণ করার নতুন দিক উন্মোচিত হয়। লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে সাহিত্য-সংস্কৃতি মানুষের কেবলমাত্র ধর্মীয় ও বিনোদনের পরিসর নয়, এর মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের পরিবেশের সংরক্ষণের কথা প্রকাশ করছে। ফলে লৌকিক দেবদেবীর থান বাংলার সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ইতিহাসকে যেমন বহন করছে ঠিক তেমন করে এই সমস্ত দেবদেবীকে ঘিরে তৈরি হওয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষ তাদের প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনযাপনের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার মানসিকতাকে প্রকাশ করছে।

প্রথম অধ্যায়

ভারতে পরিবেশ ভাবনার বিবিধ ধারা-বৈচিত্র

১.০ ভূমিকা— বর্তমান সময়ে বিশ্ব-পরিবেশ বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরিবেশের এই বিপন্নতার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। কোনো হঠাৎ মুহূর্তে কোনো বিশেষ কারণে পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়েনি। মানুষের পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা ও বদলে যাওয়া জীবন যাত্রার ধরনের পরিবেশ বিপন্নতার প্রাথমিক উৎস বলে মনে করা হয়। আজকের সময়ে যন্ত্রসভ্যতা প্রতি মুহূর্তে গ্রামকে গিলে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশকে সমূলে ধ্বংস করে চলেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি পতনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মুনাফা লাভের দুর্নিবার আকর্ষণে মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রাকৃতিক সম্পদকে অবাধে লুঠ করে চলেছে। এবং একইসঙ্গে প্রকৃতির উপর নিজের আধিপত্যের মানসিকতা নিয়ে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে। আজকের সময়ে তাই পরিবেশের সমস্যা অনেক জটিল ও তাতে বহু স্তর দেখা যায়। কোনো সহজ হিসেবের মধ্য দিয়ে আমরা এই পরিবেশের সমস্যাকে বুঝতে পারি না। পরিবেশ বিপন্নতার সূত্রপাত অনেক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। আসলে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের ধরন-ধারণ বদলে যায়। এই বদলে যাওয়া উৎপাদন পদ্ধতি পরিবেশ বিপন্নতার বড় কারণ হিসেবে ধরা হয়। এখানেই আমাদের প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তা জানার প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়। প্রাচীন ভারতের পরিবেশ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের পরিবেশ পাঠের প্রাথমিক ইতিহাসকে জানা যায়। ভারতবর্ষের পরিবেশচিন্তার ইতিহাস জানতে গেলে প্রাচীন ভারতের পরিবেশ জানা জরুরি।

আমরা জানি যে, ভারতবর্ষের সভ্যতার একটি বড় দিক হল ধর্ম। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক পরিবেশে প্রকৃতিকে মানুষ পুজো করেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ প্রকৃতিকে কখনই নিজের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবেনি বরং ভারতবর্ষের সভ্যতার বিকাশ প্রকৃতির কোলেই গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবন দর্শনে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের গভীর আত্মীয়তার টান অনুভব করেছে। আর সেইজন্য প্রকৃতিকে তারা অপর হিসেবে ভাবেনি। প্রকৃতির থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করেছে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। প্রকৃতি থেকে কেড়ে বা লুণ্ঠনকারী মানসিকতা দ্বারা এই

সময়ের মানুষ চালিত হননি; পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। পরিবেশের সমস্ত প্রাণের প্রতি সমান মমত্ববোধ প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনদর্শণে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। পরিবেশের উপাদানকে মানুষ নিছক কোনো জড় বস্তু বলে মনে করেনি। পাহাড়, পর্বত থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুতে মানুষ দৈব মহিমার উপস্থিতি দেখেছে। আর তাই মানুষ পরিবেশের সমস্ত উপাদানকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পুজো করে তার অস্তিত্বকে বিকাশের দিকে নিয়ে গিয়েছে।

আমরা প্রাচীন ভারতের বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, মানুষ এই পর্বে প্রকৃতিকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাঠ করছে। আমরা বৈদিক সাহিত্যে প্রকৃতির অপার দানকে নানা ভাবে বর্ণনা করতে দেখি। বেদ ও উপনিষদের নানা শ্লোকে প্রকৃতিকে রক্ষা করার কথা বারবার করে উচ্চারিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ প্রকৃতি লগ্ন হয়েই জীবন ইতিবাহিত করতে চেয়েছে। জীবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশি কিছু চাওয়ার মানসিকতা আপাতভাবে চোখে পড়ে না। আসলে ভারতবর্ষের আধাত্মিক পরিবেশে ভোগকেন্দ্রিক জীবনযাপন প্রাধান্য পায়নি। ফলে আজকের সময়ে যখন পাশ্চাত্যের ভোগকেন্দ্রিক মানসিকতার জন্য পরিবেশ চমরভাবে বিপন্ন হচ্ছে প্রাচীন ভারতের পরিবেশচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা এখানেই বেশি করে জরুরি হয়ে পড়ে।

প্রাচীন ভারতে পরিবেশ একেবারেই বিপন্ন হয়নি এমন সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না। কিন্তু আজকের সময়ের মতো করে প্রাচীন ভারতে এই বিপন্নতা দেখা দেয়নি। পরিবেশ বিপন্ন না হওয়ার পিছনে প্রাচীন ভারতের সমাজ কাঠামো, তার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বোপরি ধর্মীয় বাতাবরণ সবথেকে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। সভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া সমাজ-ভাবনা ও অর্থনীতির ধরন ভারতবর্ষের পরিবেশকে বিপন্ন করে। যে ভারতবর্ষের বিরাট সত্তায় প্রকৃতি নিবিড় ভাবে মিশে ছিল পরবর্তী সময়ে সেই ভারতবর্ষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। আমরা জানি ভারতবর্ষের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রকৃতি ও নারীকে সমানভাবে দেখা ও পূজা করা হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় এই প্রকৃতি ও নারী সমানভাবে লাঞ্ছিত হতে থাকে। ভারতবর্ষের প্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনার ইতিহাসকে দেখলে আজকের সময়ে পরিবেশের দুরাবস্থার

প্রকৃত হদিশ পাওয়া যাবে। আমরা জানি যে, পরিবেশকে রক্ষা ও লালন-পালনের জন্য লোকায়ত মানুষের ভূমিকা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজের মধ্যেই পরিবেশ রক্ষা করার প্রকৃত মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায়। আদিবাসীদের নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করার মানসিকতা দেখা যায়। প্রকৃতিকে এই সমস্ত মানুষ নানা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক মনে করে পুজো করে এসেছে। প্রকৃতিকে লালন করা এই সমস্ত আদিবাসী মানুষদের ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে। আজকের সময়ে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য আমাদের এই সমস্ত জনজাতির কাছের ফিরে যেতে হবে। ফলে ভারতবর্ষের পরিবেশের ইতিহাস কোনো একরৈখিক মানদণ্ডে মাপা যাবে না। উদার, উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিসরের অভিজ্ঞতা যেমন ভারতবর্ষের আছে তেমন করে বর্তমান সময়ের যন্ত্র সভ্যতাকে সে প্রত্যক্ষ করেছে।

১.১ প্রকৃতি ও পরিবেশ: আন্তঃসম্পর্ক

পরিবেশ নিয়ে বর্তমান সময়ে চর্চার গুরুত্বপূর্ণ পরিসর তৈরি হয়েছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। মানুষকে প্রকৃতির সন্তান বলে মনে করা হয়। মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে মানুষ যখন নিতান্ত অসহায় ছিল, বিরাট প্রকৃতি তাকে বাঁচার প্রাথমিক খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। মানুষ তার নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসছে প্রাচীন কাল থেকেই। মানুষ প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যৌথ জীবনযাপন করত। তারপর মানুষ ধীরে ধীরে বাঁচার রসদ তৈরি করা থেকে নানাভাবে নিজেকে স্বাবলম্বী করেছে। মানুষ বন্য জীবন থেকে যখন সভ্য জীবনের দিকে পদার্পণ করতে লাগল তার মধ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণার বদল দেখা দিল। মানুষের সুস্থির জীবনযাপনের সময় প্রকৃতিকে নানা দার্শনিকতার মোড়কে ব্যাখা করেছে। মানুষ যখন যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী জীবনযাপনে অভ্যস্থ হতে শুরু করল এবং মানুষের মধ্যে নান্দনিক বোধের উন্মেষ হতে লাগল তখন থেকেই মানুষের মধ্যে প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা বা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে দার্শনিক চিন্তাভাবনা দেখা দিল। আমাদের স্বভাবতই প্রশ্ন আসে পরিবেশ ও প্রকৃতির মধ্যে মূলগত প্রভেদ কী? প্রকৃতি বলতে আমরা বুঝি বন্যতা, তার অনাবিল সৌন্দর্যকে। প্রকৃতি বলতে আমাদের

সামনে যে বিষয়গুলি এক ঝটকায় হাজির হয় তাহল, প্রকৃতি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যের সংস্থান করে দেয়। প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের বাসস্থানের নানা উপাদান প্রতিনিয়ত নিয়ে চলেছি। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত বিনোদনের অর্থাৎ আমাদের মানসিক, নান্দনিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটিয়ে থাকি। প্রকৃতি মানেই আমাদের কাছে বহুমাত্রিক ধারণা নিয়ে হাজির হয়। বিজ্ঞান যেমন করে প্রকৃতিকে বর্ণনা করে, মানুষের কল্পনায় প্রকৃতি সেভাবে আকার ধারণ করে না। আবার আমরা মানুষের প্রকৃতি বলতে অন্য বিষয় বুঝি। সব মিলিয়ে প্রকৃতি আমাদের কাছে নানাভাবে উপস্থিত হয়। আমরা বলতে পারি—

> প্রকৃতি এই অর্থে সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, আচার ব্যবহার ইত্যাদি যা কিছু মানবিক কৃত্রিমতায় তৈরি হয়েছে, তার বাইরে অবস্থিত।[১]

প্রকৃতিকে নিয়ে আলোচনায় মানুষের সংস্কৃতিতে কেমন করে প্রকৃতি ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছে দেখা হয়। আবার আমরা দেখতে পাই প্রকৃতিকে মানুষের পালিত সংস্কৃতির অপর হিসেবে ধরা হয়। কেননা মানুষের সংস্কৃতির যে ধারণা তার বিপরীতে প্রকৃতি তার বর্বরতা, হিংস্রতা নিয়ে অবস্থান করে। প্রকৃতি আবার এই হিংস্রতাকে কাটিয়ে তার অপার সৌন্দর্য, বিস্ময় ও বিশালতা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। এই প্রকৃতিকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হচ্ছে আবহমান কাল ধরে। প্রকৃতির নান্দনিক বর্ণনা যেমন একটা দিক আবার তেমন করেই প্রকৃতি মানবোত্তর অতীন্দ্রিয় ধারণা ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হচ্ছে। প্রকৃতির অপার গাম্ভীর্য, ধ্যানমগ্নতা আমাদের মনে বিস্ময় তৈরি করে। প্রকৃতির এই রূপ দেখে আমাদের মনে ঈশ্বরের ধারণা জন্ম নেয়। এইভাবে ঈশ্বরপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম এক হয়ে যাচ্ছে, যাকে আমরা ‘অধিবিদ্যক প্রকৃতি’ (Metaphysical nature) বলি। প্রকৃতিকে নিয়ে এই ধারণার প্রেক্ষিতে প্রকৃতি সংরক্ষণের ধারণা গড়ে ওঠে। এই সংরক্ষণের ধারণা হয়েছে প্রকৃতিকে আধিপত্যের মনোভাবের বিরুদ্ধাচরণ থেকে। বাইবেলের ধারণায় মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, ফলে ঈশ্বরের সন্তানের অধিকার আছে প্রকৃতির সমস্ত কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করার। খ্রিষ্টধর্মে এই আধিপত্য বিস্তারকারী চিন্তাভাবনার জন্য প্রকৃতি ধ্বংস হয়। এই ধারণার বিরোধিতা করে বলা হয়েছে প্রকৃতির সমস্ত উপাদানের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিরাজ করে। তিনি প্রকৃতির এই সমস্ত প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলেন। তাই প্রকৃতির কোনো উপাদানকেই ধ্বংস করা মানেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই

বিঘ্নিত করা হয়। আমাদের একটি প্রচলিত ধারণা হল, প্রকৃতি হল বাইরের বিষয়। এই প্রকৃতিকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বুঝতে পারি। ইন্দ্রিয়গাহ্য পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েই আমরা এই বাইরের প্রকৃতিকে পাই। এই হিসেবে নীল আকাশ, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত থেকে শুরু করে নীল সমুদ্রের জল এই সমস্ত পরিসরে প্রকৃতি আকার ধারণ করে। প্রকৃতির এই অবস্থানের ধারণা থেকে বলা হয় প্রকৃতির প্রকৃত অবস্থান বা তার সজ্জা গ্রামীন পটভূমিকাতে। এর বিপরীতে শহর প্রকৃতি লোপাটে ভূমিকা নেয়। শহরের কংক্রিটের জঙ্গলে প্রকৃতি ধরা দেয় না। বর্তমানে শহরের এই প্রকৃতিহীনতার কথা মাথায় রেখেই বলা হয় প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার কথা। প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় মানুষের অন্তরের প্রকৃতি এসে যায়। মানুষের এই আত্মিক বা মনের প্রকৃতির সঙ্গে নৈতিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি যুক্ত হয়ে পশু প্রকৃতির সঙ্গে আলাদা হয়ে যায়। যদিও মানুষের অন্তরের প্রকৃতি সবসময় নৈতিকতার দ্বারা চালিত হয় না। তখন সেই প্রকৃতির সঙ্গে পশু প্রকৃতির কোনো অভেদ থাকে না। ফলে প্রকৃতির অবস্থান কেবলমাত্র বহিঃস্থ নয়। মানুষের মনে এই প্রকৃতি অবস্থান করে ও এই অন্তরের প্রকৃতির উপর বাইরের প্রকৃতির আকার ও তার অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। আমরা পরিবেশ বলতে বুঝি যে—

> প্রকৃতির বুকে ছোট বড়ো সকল জীবেরই জীবনযাত্রার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এই জীবন নির্বাহ পদ্ধতি জীবের গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর যেমন নির্ভরশীল, তেমনি যে অবস্থায় জীবটি বাস করে, তার উপরেও নির্ভর করে। যে ভূখণ্ডে বা জলখণ্ডে জীবের স্বাভাবিক বাস, সেখানকার মাটি, আকাশ, বাতাস, জল, তাপমাত্রা ও প্রতিবেশী বিভিন্ন জীব নিয়েই গঠিত হয় পরিমণ্ডল। কোন জীবকে ঘিরে যে পরিমণ্ডল, সেই পরিমণ্ডলে বিদ্যমান বিভিন্ন অবস্থার সামগ্রিকতাকে জীবের পরিবেশ (Environment) বলে। সুতরাং পরিবেশ প্রকৃতির উপাংশমাত্র।[২]

ফলে আমরা পরিবেশ বলতে বুঝতে পারি, মানুষ যে পরিমণ্ডলে বাস করে তার চারপাশের সমস্ত পরিসরের সমবায়েই এর অস্তিত্ব। প্রকৃতি যেমন তার আপন অস্তিত্ব নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরিবেশ সেই তুলনায় অনেকখানি নির্ভর করে মানুষের হস্তক্ষেপের উপর। মানুষ তার চারপাশের পরিসরকে যেমন করে সাজাবে তার উপর নির্ভর করেই তার পরিবেশের আকার ধারণ করে। পরিবেশের ভালো-মন্দের উপর মানুষের হাত অনেকাংশে কাজ করে। প্রকৃতি মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই গঠিত হয়। যদিও আমরা জানি যে, প্রকৃতির অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে মানুষের নৈতিক বিচারের উপর। কিন্তু পরিবেশ

গড়ে ওঠে মানবিক নানা সংগঠনের সমবায়ে। এই কারণের বাড়ির পরিবেশ, গ্রামের পরিবেশ বা স্কুল-কলেজের পরিবেশের কথা প্রচলিত হয়েছে। এই পরিবেশ তৈরি হয় মানুষের সাহায্যেই।

পরিবেশ নিয়ে আজকের সময়ে আমাদের প্রতিনিয়ত ভাবতে হচ্ছে; কেননা আমরা যে সময়ে বাস করছি তা পরিবেশ বিপন্নতার সময়। ফলে আমাদের কাছে অনিবার্য হয়ে ওঠে আমাদের চারপাশের পরিবেশ নিয়ে ভাবতে বা পাঠ করতে। আর এই বর্তমানের সময় প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে পরিবেশ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে গেলে আমাদের সামনে অবশ্যই আসবে পরিবেশ বিপন্নতা বা পরিবেশের এই সমস্যার সূত্রপাত কবে থেকে? আমরা সবাই জানি মানুষ প্রকৃতিকে ভয় ও ভক্তি করে পূজা করে এসেছে। মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে পুজো করে এসেছে ও প্রতিটি উপাদানের একজন করে দেবতার কল্পনা করেছে। বৈদিক সময় থেকে আজকের সময় পর্যন্ত যদি আমরা ভারতবর্ষের লোকায়ত সমাজের মানুষ থেকে সব স্তরের মানুষের পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার পাঠ করি তাহলে পরিবেশ পাঠের দিগন্ত খুলে যেতে পারে।

পরিবেশ বিপন্নতার সময়ে দাঁড়িয়ে তাই খুব জরুরি হয়ে পড়ে আমাদের ঐতিহ্যগত পরিবেশ ভাবনাকে বুঝে নেওয়া। বর্তমান সময় প্রেক্ষিতে যখন আমরা প্রতিনিয়ত পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিবেশ রক্ষা বা প্রকৃতিকে রক্ষা করতে চাইছি; প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ সেই প্রকৃতিকে কত সহজেই পড়ে নিতে পারত তা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পট পরিবর্তন যেমন করে আমাদের সমস্ত কিছুকেই পণ্য করে তুলেছে; প্রকৃতিকে সেখানে সবচেয়ে বেশি করে পণ্য বলে মনে হয়েছে। আর মানুষ তাই প্রকৃতিকে আধিপত্য বিস্তার করে তাকে পণ্যের মতো করে ভেবেছে; সে ভুলেই গিয়েছে তার `ঐতিহ্যগত প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের খতিয়ান। ফলে অনিবার্য হয়ে পড়ে আমাদের ঐতিহ্যগত পরিবেশ ভাবনাকে ফিরে দেখার।

১.২ নির্বাচিত সংস্কৃতপাঠ্যে পরিবেশভাবনা: বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত

(ক) বেদে প্রতিফলিত পরিবেশ ভাবনা— প্রাগৈতিহাসিক সময়ে মানুষ প্রথমে প্রকৃতির দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত হত। মানুষের কৌম, দলবদ্ধ জীবনযাপনের ইতিহাস তার চারপাশের নানা পরিসরকে ভয়

পাওয়ার ইতিহাস। মানুষ যখন প্রকৃতির থেকে জীবনের মৌলিক উপাদানগুলোকে নিয়েছে, তার মন ভরে উঠেছে কৃতজ্ঞতায়। আবার সেই প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা দেখে মানুষ ভয় পেয়েছে; রাতের আঁধারে প্রবল ঝড়ে যখন গাছগুলো নুয়ে পড়ত আর এক ভৌতিক পরিবেশ তৈরি হত, তখন সে দিশেহারা হয়ে পড়ত। প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার কোনো উত্তর মানুষ সেদিন খুঁজে পায়নি। আবার যখন সে দাবানলের মধ্যে আগুনের সর্বগ্রাসী রূপ দেখেছে, ভয়ে প্রকৃতির কাছে মাথা নত করেছে। এই পর্বে মানুষ প্রকৃতিকে ভয় পেয়ে শ্রদ্ধা করেছে ও তাকে পুজো করেছে। আসলে মানুষ এই সময়ে বুঝতেই পারেনি প্রকৃতির ধ্বংস-লীলার কার্যকারণ। তাই সে প্রকৃতিকে অপার ভয় ও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখেছে আর ভয়ে মাথা নত করেছে। এই প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব যথার্থই বলেছেন—

> প্রাকৃতিক শক্তি যেমন বৃষ্টি, বন্যা, খরা, ঝড়, বজ্রপাত, দাবানল ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে মানুষের অক্ষমতা এবং জনহীন প্রান্তরে হিংস্র প্রানীকে ভয় পাওয়ার মধ্যেই সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক কুসংস্কারের উদ্ভব ঘটে এবং এর থেকেই ক্রমে সৃষ্টি হয় ধর্ম, এবং তা থেকে পুরোহিত গোষ্ঠী ও নানা আচার অনুষ্ঠানের।[৩]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই প্রকৃতিকে বুঝতে পেরেছে। যখন মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখল, প্রকৃতির সঙ্গে তার বোঝাপড়া খানিক উন্নত হল। যে প্রকৃতিকে ভয় পেয়ে দূরে সরে গিয়েছিল, মানুষ নিজের ব্যক্তিগত, দলের কারণে তাকে ব্যবহার করতে শিখল। প্রকৃতিকে সে বুঝতে শিখল। এইপর্বে মানুষ প্রকৃতিকে আর তেমন ভয়ের নজরে দেখল না। মানুষ প্রকৃতিকে ব্যবহার করে নিজের নিত্য প্রয়োজনকে মিটিয় নিল। আর এখানেই ঘটে গিয়েছে একটা বড় সমস্যা। মানুষ তার প্রয়োজনকে প্রতিদিন নিত্য নতুন করে রূপ দিতে থাকল। প্রকৃতি থেকে মানুষ অবাধে নিতে থাকল। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে ঐতিহ্য পরম্পরাগত সম্পর্ক সেই সূত্র খানিক নড়ে গেল বা বলা ভালো তা ছিন্নপ্রায় হতে থাকল—

> যেদিন মানুষ অরণি কাষ্ঠ থেকে আগুন জ্বালাতে শিখেছে, যে সময় থেকে ফসল ফলাতে শিখেছে, অরণ্য উচ্ছেদ করে নিজের আবাস নির্মাণ করতে শিখেছে, সেই দিন থেকেই স্বেচ্ছাচারী মানুষ প্রকৃতির বুকে তার অসহিষ্ণু, উদ্ধত পদচিহ্ন রেখে গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রকৃতির স্বাভাবিকতার অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটিয়ে।[৪]

এরপর থেকে মানুষ প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। মানুষ বুঝে গিয়েছে যে, প্রকৃতি কেবল ভয় পাওয়ার পরিসর নয়। এই ভয়ের প্রসঙ্গ যখন মানুষের মন থেকে সরে গেল, তখন থেকেই মানুষ

প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। *‘পরিবেশ নিয়ন্ত্রণবাদ’* এই প্রসঙ্গে আমাদের জানায় অরণ্যচারী মানুষ কীভাবে সেখান থেকে সরে এসে নগর পত্তন করে। মানুষ যখন শ্রমের প্রশ্নে কাজের বিভাজন করল, যখন উৎপাদনের পদ্ধতি ও উৎপাদনের অর্থ এই বিষয়গুলো সামনে আসল, তখন থেকেই মানুষ প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গেল ও নিজের প্রভুত্ব শক্তিকে প্রকৃতির উপর প্রয়োগ করতে লাগল। পশুদের প্রথমে মানুষ কৃষিকাজে লাগায়। কিন্তু পরে এই ব্যবহারের ধরন বদলে যায়। সিন্ধু সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই মানুষ গরুকে নির্বীজকরণ করছে কৃষিকাজের জন্য। ফলে আমরা বুঝতেই পারি মানুষ কিভাবে পরিবেশের সমস্ত প্রাণকে নিজের কাজে ব্যবহার করছে। কৃষিকাজ যেমন মানুষকে জীবনের নানা পরিসরে নিরাপত্তা এনে দিয়েছে তেমন করে মানুষ পরিবেশের নানা উপাদানকে বিপন্ন করে তুলেছে। কৃষিকাজের ফলে মানুষের বেশি চাষযোগ্য জমি দরকার হয়ে পড়ে; এরফলে মানুষ নতুন নতুন করে জায়গা খুঁজতে থাকে, এর অনিবার্য ফল হিসেবে দেখা যায় অরণ্য নিধন। আমরা এমন বলতে পারি না যে, বৈদিক সমাজ বা বৈদিক সমাজের আগে থেকেই পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা পূর্ণ মাত্রায় ছিল। পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের ধারণা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে গিয়েছে। এবং প্রকৃতিকে নানা দার্শনিকতায় নিয়ে যেতে মানুষের শ্রমের বা জীবিকার স্থিতাবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি প্রথম অবস্থায় মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা তার প্রতিদিনের নানা প্রয়োজনের নিরিখেই গড়ে উঠেছিল। এই প্রয়োজনের মধ্যে প্রবল ছিল তার সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির থেকে বাঁচার চাহিদা বা প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আরও প্রবল শক্তির কাছে নিজের আশ্রয় খুঁজে নেওয়া। বেদের নানা সূক্তে আমরা দেখতে পাই প্রতিটি দেবতা কোনো না কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর বেদের সূক্তে যে দেবতার বন্দনা পাওয়া যায় তাতে একই সঙ্গে যেমন দেবতাকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা দেখা যায় তেমন করে আবার সেই দেবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা দেখা যায়—

> প্রাচীন মানুষরা প্রকৃতির উপর যে তাঁদের জীবন জীবিকা নির্ভরশীল, এই সত্যটা উপলব্ধি করে তাঁরা সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বৃষ্টির প্রতি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেছেন। প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজ জানতেন, এই শীত, বৃষ্টি এবং খরা তাঁদের শস্য এবং পালিত পশুদের ক্ষতি করতে পারে। ক্রমশঃ তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের জীবনের ভালোমন্দের সঙ্গে এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রকৃতিকে একটি অজ্ঞেয় শক্তি পিছন দিক হতে পরিচালনা করছে। সুতরাং তাঁরা মন্ত্রে/ কবিতায়, এই শক্তিগুলির বন্দনা/ স্তুতি/ প্রশংসা কাব্যিকভাষায় প্রকাশ করলেন।[৫]

বৈদিক সমাজের মানুষ প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশকে নানারূপে কল্পনা করে সেই প্রকৃতির বন্দনা করেছে। বৈদিক সমাজ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে জীবন্ত বলে মনে করত। বৈদিক সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর মানুষ এক একটি দেবতার অধিকার আরোপ করেছে বা বৈদিক দেবতারা এক একটি প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজিত হত। যেমন—অগ্নি-আগুন জ্বালার প্রতীক, বরুণ— আলো বা দিনের দেবতা, ইন্দ্র— বজ্র/ বৃষ্টির দেবতা, মিত্র—রাত্রির দেবতা, আদিত্য—সূর্যের অন্য এক নাম, সূর্য—আলোকরশ্মির দেবতা, সাবিত্রী—ইনি সূর্যের সঙ্গে যুক্ত, ঊষা—ভোর রাত্রির দেবী, মরুৎ--ঝড়ের দেবতা, বায়ু—বাতাসের দেবতা।

বৈদিক সাহিত্যে দেবীর তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমরা আগেই বলেছি যে, বৈদিক সমাজ কৃষিভিত্তিক। ফলে কাজে শ্রমের বিভাজন চলে এসে নারীকে অনেক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে বৈদিক সমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে, এরফলে তাদের দেবদেবী কল্পনায় দেবীর থেকে দেবতার প্রাধান্য বেশি হয়েছে। বৈদিক সমাজে দেবতার প্রাধান্য বেশি নিয়ে নিশীথ চক্রবর্তী জানান—

> প্রাচীন সমাজ সম্ভবত প্রকৃতির অপ্রমেয় শক্তির মধ্যে নারীর কোমলতা খুঁজে না পেয়ে প্রাকৃতিকে পুরুষ বীর্য্যের প্রতীক মনে করেছে।[৬]

আমরা আগেও বলেছি যে, বৈদিক সমাজে নারীর আধিপত্যকে ছোট করা হয়েছে তার প্রধান কারণ উৎপাদন ব্যবস্থার বদলের জন্য। এই বদলে যাওয়া সমাজ-অর্থনীতি নারীকে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে ঠেলে দেয়। বৈদিক সাহিত্যে দেবীর নাম বলতে উষা, পৃথিবী ও সরস্বতী ছাড়া তেমন কোন দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত দেবীর উল্লেখ থাকলেও এদের কোনো নিজস্ব পরিচয় ছিল না। এদের পরিচয় কোনো না কোনো দেবতার প্রত্নী, কন্যা বা মাতা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবীকে আকাশের স্ত্রী হিসেবে দেখান হয়েছে। ‘দ্যাবাপৃথিবী’র ধারণার মধ্যে আকাশ আর পৃথিবীকে যৌথ হিসেবেই দেখান হয়েছে এবং এখানে আকাশ পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৈদিক সমাজে প্রকৃতির কাছে নিবেদনের মাধ্যমে প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করার বিষয় দেখতে পাই আবার নারীর প্রাধান্য কমিয়ে দেওয়ার মধ্যমে প্রকৃতিকে লাঞ্ছনা করা

হচ্ছে এই বিষয় সমানভাবে উপস্থিত। কিন্তু শশীভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন, পৃথিবীর সঙ্গে আকাশ উচ্চারিত হলেও এই পৃথিবী নিজের মহিমা হারিয়ে ফেলেননি। তিনি বলছেন-

> বৈদিক ঋষিগণ প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী মাতা রূপেই পৃথিবীর স্তব করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধাহূতি প্রদান করিয়াছেন; মুক্ত কণ্ঠে তাহাদের ডাকিয়া বলিয়াছেন— 'মাতাপৃথিবীমহীয়ং'- বিস্তীর্ণাপৃথিবীআমারমাতা (১/১৬৪/৩৩)।[৭]

আমরা বৈদিক সাহিত্যে এমন অনেক সূক্ত পাব যেখানে বলা হচ্ছে 'দৌ' পিতা বর্ষাকালে মাতা পৃথিবীকে গর্ভবতী করছে ও সেখান থেকে শস্য উৎপাদিত হচ্ছে। বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আমরা দেখতে পাই মানুষ পৃথিবীর কাছে শস্য কামনা করে প্রার্থনা করছে। সেখানে বলা হচ্ছে যেন পৃথিবী তাদের সন্তানদের ধন দানের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ আয়ু, সকল প্রকার পাপ থেকে রক্ষা করে ও তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বৈদিক সমাজে পৃথিবী-পূজার প্রসঙ্গে বলেছেন—

> যজ্ঞ করিবার সময় এই দ্যাব্যা-পৃথিবীর নিকট আশীর্বাদ প্রার্থণা করিতে দেখা যায়। ঋষিকবিগণ যে পৃথিবী-মাতার সন্তান বলিয়া সগর্বে নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন সেই পৃথিবী-মাতার ভিতরে তাঁহারা সর্বপ্রকার বাৎসল্য, সুকোমল স্নেহ, চিত্তের ঔদার্য এবং অসীম ক্ষমাগুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, পৃথিবীকে যে এই মাতৃরূপে বর্ণনা, ইহা বৈদিক কবিগণের নিছক কবি-কল্পনা মাত্র নহে;... পৃথিবীর সীমাহীন বিস্তার, তাঁহার রূপবৈচিত্র্য এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্য তাঁহার অন্নদা এবং ধনদা রূপ,- সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে লুক্কায়িত অনন্ত প্রাণশক্তি-নিরন্তর অসংখ্যরূপে তাঁহার প্রকাশ- এই সকল একত্র হইয়া মুগ্ধ কবিগণের চিত্তে একটা বিস্ময়-জনিত শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়াছিল।[৮]

পৃথিবীকে মাতারূপে কল্পনা ও তার সঙ্গে আকাশের মিলনের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবী শস্যবতী হওয়ার বর্ণনায় আমরা বৈদিক সমাজের মানুষের যে মনোভাব পাই তা আজকের সময়ে সঙ্গে মেলে না। আজকের সময়ের পরিবেশ বিপন্ন তার বড় কারণই হল মানুষের প্রকৃতিকে নির্বিচারে শোষণ করার মানসিকতা। বৈদিক সমাজ পৃথিবীকে মাতার সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে তার সন্তান ভেবে তার কাছে শষ্য থেকে জীবনের নানা প্রয়োজন প্রার্থনা করেছে। এই মানসিকতার জন্য বেদের পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ থেকে শুরু করে তার প্রকৃতি বিপন্নতার মুখোমুখি হয়নি।

ভারতীয় জীবন সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে লগ্ন হয়েই অতিবাহিত হয়েছে। বৈদিক যুগের মানুষরা মনে করত যে, দেবতাদের জন্য তাদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ হচ্ছে।

এইজন্য বৈদিক সমাজ পরিবেশের নানা শক্তির উপর এক একটি দেবতার অধিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট করে তাদের বন্দনা ও স্তব করেছেন। সেখানে ইন্দ্রকে স্তব করার হচ্ছে আর বলা হচ্ছে, বৃত্র দ্বারা যে নদীকে আটকে রাখা হয়েছিল ইন্দ্র সেই নদীকে মুক্ত করে দিয়ে সাগরের দিকে প্রবাহিত করে দিয়েছে। ফলে গোটা বিষয়ে কেবলমাত্র ইন্দ্র মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। এখানে আসলে প্রচ্ছন্নভাবে বলা হচ্ছে, নদী যদি তার প্রবাহ পথে বাধা পায় তাহলে পৃথিবীর চাষবাসের উপযোগী থাকবে না। ফলে পৃথিবীতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে। আবার *ঋগ্বেদে* সূর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> চিত্রং দেবানামুদ্গাদনীকং চক্ষুমিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ ।
>
> আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী চান্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।।[৯]

অর্থাৎ, আমাদের স্থাবর, জঙ্গমের প্রাণ হল সূর্য। এছাড়া সূর্যকে পৃথিবীর প্রাণ বলা হচ্ছে। সূর্যকে পৃথিবীর প্রাণ বলার নানা কারণ আছে। আমাদের যাবতীয় প্রাণের উৎস হল সূর্য। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে আমরা দেখতে পাই সূর্যকে দেবতাদের অগ্রজ বলা হচ্ছে। বেদে সূর্যকে সমস্ত বিশ্বচরাচরের প্রাণ প্রকাশক চিৎসত্তা রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা, ঋগ্বেদের ১/৯৫/৩ নম্বর সূক্তে দেখতে পাই এই চলমান সূর্যকে হংসের চলমানতার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। ফলে আমরা বুঝতেই পারি, সূর্যকে বেদের সময়ে আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের জড়পিণ্ড বলে মনে করা হত না। বেদে সূর্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেখানে সূর্যের তিন রূপ দেখতে পাই—সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ। এই সূর্যের অবস্থানকে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে। ফলে আমরা বুঝতেই পারি বৈদিক মানুষের কাছে সূর্যের গুরুত্বের কথা ও পৃথিবীর প্রাণ বিকাশে সূর্যের গুরুত্বের কথা—

> পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস হল সূর্য। তার কিরণ, তার তাপ ও আলোকশক্তির রূপান্তরের ফলে এবং সৌরশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে জড় ও জীবের রাসায়নিক জৈবরাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। ...সেই বিচারে সূর্য সকল স্থাবর জঙ্গমের আত্মাস্বরূপ।[১০]

বেদে দেখতে পাওয়া যায় যে, সূর্য সাতটি ঘোড়া-যুক্ত অশ্বের সঙ্গে প্রদক্ষিণ করছে। বিভিন্ন সূক্তের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই সূর্যের গতিপথ থেকে শুরু করে ঋতু ও দিন রাত্রির ব্যখ্যা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের ৭০ নম্বর সূক্তে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ ও তার গোটা পরিবেশের সম্পর্কে মানুষের কৃতজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদকে কোনোভাবেই জোর করে নেওয়া নয় ; সেই সম্পদকে

নানা আচার-অনুষ্ঠান ও আবেদন-নিবেদনে মধ্য দিয়েই মানুষ পেতে চাইছে। এই সূক্তের একটি জায়গায় পৃথিবীকে মা ও আকাশকে পিতা বলা হয়েছে। এই মাতা ও পিতার যৌথ মিলনের ফসল হল পৃথিবীর সমস্ত সন্তান। এই সূক্তে আমরা কেবল পৃথিবীর স্তবগান দেখতে পাই না। এখানে একইসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ ও অ-প্রাণদের প্রতি সমান মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা। পরবর্তী সময়ে এই ভাবনার বিস্তার দেখতে পাব বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্যে।

ঋগ্বেদের অনেক অংশ জুড়ে আছে সূর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা। এখানে সূর্যকে সমস্ত প্রাণের উৎস বলছে ও সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের সপ্ত অশ্বের রথে চড়ে সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ করছে এবং তিনি কখনই ক্লান্ত হন না। সূর্যকে ঘিরেই সমস্ত প্রাণ আবর্তিত হচ্ছে। বৈদিক সমাজে পরিবেশ সচেতনতার ছবি আমরা দেখতে পাই। অর্থববেদে বায়ু ও সূর্য সারা বিশ্বকে কীভাবে রক্ষা করছে তার উল্লেখ দেখতে পাই—

> বায়োঃ সবিতুর্বিদথানি মন্মহে যাবাত্মন্বৎ বিশথো যৌ চ রক্ষথঃ। যৌ বিশ্বস্য পরিভূ বভূবথুস্তৌ নো মুঞ্চতমং হসঃ।[১১]

এখানে বলা হচ্ছে বায়ু ও সূর্য জগতের স্থাবর ও জঙ্গমরূপে পৃথিবীকে পালন করছেন। বৈদিক সাহিত্যে আমরা একটা বিষয় লক্ষ করি যে, কোনো একটি প্রাকৃতিক শক্তিকে অনেক নামে ভূষিত করা হয়েছে। আমরা বুঝতে পারি এই নানা নাম দেওয়ার মধ্যে আসলে বৈদিক মানুষ পরিবেশের এই সমস্ত পরিসরগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। আমরা দেখতে পাই সূর্যকে যেমন বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে তেমন জলকেও নানা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা জলকে নিয়ে *‘অপ’*, *‘উদক’* প্রভৃতি নানা প্রতিশব্দ বৈদিক সাহিত্যে দেখতে পাই। বৈদিক সাহিত্যে জলকে জীবন বলেই সম্বোধন বেশি করে করা হয়েছে। এছাড়া জলের প্রয়োজনীয়তার দিকটি মাথায় রেখে ‘অমৃত’ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। জলের সঙ্গে সমস্ত প্রাণের গভীর যোগকে মাথায় রেখেই বৈদিক সাহিত্যে জলকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে—

> অপস্বন্তরমৃত্বপ্সু ভেষজম। অপামুত প্রশস্তিভিরশ্বা ভবথো বাজিনো গাবো ভবথ বাজিনীঃ।[১২]

এখানে বলা হচ্ছে জলের সাহায্যে আমরা অমর ও ব্যাধিশূন্য হতে পারি। এই অমর কিন্তু দেবতাদের মতো করে অমর নয়। এখানে বলা হচ্ছে জলের সাহায্যে আমরা সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক উপাদান

পেয়ে বেঁচে থাকতে পারি। আবার বেদের কোথাও কোথাও বলা হচ্ছে জলের মধ্যে ঔষধ আছে। জল অন্নের আধার স্বরূপ, জল স্নেহময়ী জননীর মতো আমাদের লালনপালন করে।

আমরা আগেই বলেছি যে, বৈদিক সাহিত্যে প্রতিটি প্রাকৃতিক শক্তির আধার এক একটি দেবতাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইন্দ্র বৈদিক-সাহিত্যে সব থেকে বড় স্থান জুড়ে আছে। বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রের অবস্থান বা তার ব্যাপ্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

ইন্দ্র ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, অন্তরীক্ষ নির্মাণ করেছেন, পর্বতগণকে স্থির করেছেন। ...ইন্দ্র সূর্য ও ঊষাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জল প্রেরণ করেন, সপ্ত নদীকে প্রবাহিত করেন, তিনি নিজের তেজে অন্তরীক্ষ পূর্ণ করেন। ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা।[১৩]

আমরা জানি ইন্দ্রের বৃত্রাসুর বধের কাহিনি। এই বৃত্রাসুর বধের মধ্য দিয়ে ইন্দ্র পৃথিবীতে বৃষ্টিধারা এনেছিল আর সমস্ত নদী জলে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ইন্দ্রের এই কাজকে বৈদিক ঋষিরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন বেদের বিভিন্ন সূক্তে। যেখানে বৃত্র নামক অসুরের বৃষ্টিদানে বাধা ও ইন্দ্র তাকে পরাজিত করে পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করে তোলে। কৃষিভিত্তিক বৈদিক সমাজে বৃষ্টি কৃষিকাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই বৃষ্টি না হলে মানুষের যে চরম খারাপ অবস্থা হবে সেই গুরুত্বের কথা মানুষ অনুভব করেছে। এই বৃষ্টিকে যে পৃথিবী পর্যন্ত বইয়ে দিতে পারে তাকে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাবে সেটাই স্বাভাবিক। এই বৃত্রাসুর বধ আসলে রূপকের মতো; যাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে নানা ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে। বৃত্রবধকে কেন্দ্র করে যে আলোচনার পরিসর তৈরি হয়েছে সেখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ইন্দ্র বৃত্র নামক অসুরকে বধ করে পৃথিবীতে বৃষ্টি আনেন ও পৃথিবীকে শস্যবতী করেন—

> অধিকাংশ পণ্ডিত ‘বৃত্র’ শব্দে মেঘকে বুঝিয়েছেন। তাঁদের মতে বৃত্রেরই অপর নাম অহি। অবশ্য ঋগ্বেদের কোনো কোনো স্থলে বৃত্রকেই অহি বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের অনুবাদক ও টীকাকার রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, মেঘের নাম বৃত্র বা অহি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে পৌরিণিক বৃত্র অসুরের গল্প উৎপন্ন।[১৪]

আমরা বিভিন্ন বেদ থেকে ইন্দ্র সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনি পাই তার বেশিরভাগই ইন্দ্রের মেঘ থেকে বৃষ্টি আনার কাহিনিকে বলা হয়েছে। এই বৃষ্টি আনার কাহিনি হিসেবে ইন্দ্রের মৈনাক পর্বতের ডানা

কাটার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাহিনিকে বেদের টীকাকাররা রূপক হিসেবে দেখেছেন। এখানে বলা হচ্ছে ইন্দ্র চলমান পর্বতের ডানা কেটে স্থির বা দৃঢ় করে। সায়নাচার্যের মতে পর্বত শব্দের অর্থ পর্বযুক্ত মেঘ। এই মেঘ যদি উড়ন্ত অবস্থায় থাকে তাহলে বৃষ্টি হওয়া সম্ভব না। মেঘ থেকে বৃষ্টি হতে গেলে মেঘকে জমাট ও স্থির হতে হবে। ইন্দ্র আসলে এই উড়ন্ত বা চলমান মেঘকে থামিয়ে, একত্রিত করে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছিল—

ত্বং তমিদ্র পর্বতৎ মহামুরুৎ বজ্রেন

বজ্রিন পর্বশশ্চকর্তিথ।

অবাসৃজো নিবৃতাঃ সর্তবা অপঃ স্ত্রা বিশ্বং

দধিষে কেবলং সহঃ।[১৫]

এখানে বলা হচ্ছে পর্বতকে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ছিন্ন করেছে এবং জলপথের বাধা সৃষ্টিকারী পর্বতকে সরিয়ে জলকে প্রবাহিত করে দিয়েছে। ফলে আমরা দেখতে পাই সারা বেদ জুড়ে ইন্দ্রের স্তব গান। আসলে আমরা আগেই বলেছি বৈদিক সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক আর কৃষিকাজে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বৈদিক মানুষ অনুভব করেছে। সেখানে বৃষ্টি প্রদানকারী বা পৃথিবীতে বৃষ্টি আনার জন্য ইন্দ্রের কাছে মানুষ নতজানু হয়ে ‘দেবরাজ’ বলে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে।

ঋগ্বেদের সময়ে অর্থনীতির বনিয়াদের ক্ষেত্রে কৃষিকাজের বড় ভূমিকা দেখা যায়। এই সময়ে মানুষ পশুপালন থেকে কৃষিকাজে বেশি গুরুত্ব দেয়। কৃষিকাজে আমরা দেখতে পাই শ্রম লাঘবের জন্য বলদ ও লাঙলের ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষিকাজে জল ও শস্যের জন্য আমরা দেখতে পাই ক্ষেত্রপালের কাছে প্রার্থনা করতে। বৈদিক সমাজে মানুষ প্রকৃতির থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নিচ্ছে নিবেদনের মাধ্যমে। আমরা বুঝতেই পারি প্রকৃতিকে মানুষ বর্তমানের মতো করে ব্যবহার করছে না। ঋগ্বেদে কৃষি-দেবতা ক্ষেত্রপতির উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে—

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনের জয়ামসি।

গামশ্বং পোষয়িত্ব স নো মৃলতীদৃশে।।

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।[১৬]

এখানে বলা হচ্ছে মানুষের নিজের মঙ্গলের জন্য ক্ষেত্রকে জয় করা হবে। এখানে জলের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। ঋগ্বেদের অনেক অংশে দেখা যায় জলের জন্য মানুষের দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে। এই পর্বে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক সহাবস্থানের। আমাদের এই ধারণা জোরাল হয় তার কারণ আমরা বিভিন্ন বেদের মধ্যে দেখতে পাই মানুষ তাদের বাঁচার জন্য খাদ্য থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিস তা দেবতাদের কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পূরণ করতে চাইছে। আমরা খুব কম ক্ষেত্রে পাব মানুষ প্রকৃতির থেকে জীবনের বাঁচার রসদকে জোর করে নিচ্ছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত থেকে আমরা দেখতে পাব যে, কৃষিক্ষেত্রের প্রারম্ভিক নানা পর্যায়; যেখানে কৃষিকাজের জন্য প্রাচীন পদ্ধতি থেকে লাঙল ও বলদের ব্যবহার। আবার আমরা দেখতে পাই যে, পশুদের জন্য জলপানের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জলকে পরিশ্রুত করার চেষ্টা। ফলে বৈদিক যুগে মানুষের মধ্যে পরিবেশ চেতনা বা পরিবেশের সংরক্ষণের ভাবনা প্রকাশিত হয়।

বেদে পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, জল ও মাটি প্রভৃতির বর্ণনা আছে। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে মানুষ পৃথিবীর এই সমস্ত পরিসর থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়েছে। আমরা তাই বেদে পরিবেশের এই সমস্ত উপাদানের বন্দনা দেখতে পাই। বেদের বিভিন্ন সূক্তে আমরা দেখি যে, মাটি, জল ও বায়ুকে বন্দনা করার মাধ্যমে প্রার্থনা করছে যাতে মানুষের এই সমস্ত উপাদানের কখনও ঘাটতি না হয়। বেদের বিভিন্ন সূক্তে আমরা দেখতে পাই ধরিত্রীকে জননী হিসেবে বন্দনা করছে। বেদের মণ্ডলগুলিতে ধরিত্রীকে সমস্ত প্রাণের আধারভূমি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা যে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেছেন তাতে এই ধরিত্রীর সঙ্গে মানুষের নাড়ীর যোগ আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলছেন এই জননীকে যেন কেউ নিজের স্বার্থের জন্য ক্ষত না করে বা তাকে লাঞ্ছিত না করে। অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তে আমরা দেখতে পাই—

> ধরিত্রীকে অমলিন, অক্ষত ও অব্যাহত রাখার সংকল্পে, পরিবেশ ও প্রকৃতির সংরক্ষণে ও পরিপোষণে এবং তাকে সকল প্রকার স্বার্থসিদ্ধির স্থূল হস্তাবলেপনের বাইরে দূরে রেখে।[১৭]

বৈদিক সমাজে মানুষের পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা কেবল তার কাছ থেকে অন্ন বা বাসস্থানের জন্য নয়। প্রকৃতির যে অপার সৌন্দর্য আমাদের প্রতিনিয়ত মনের খিদে পরিপূর্ণ করছে বৈদিক ঋষিরা সেই ঋণের কথা স্বীকার করছেন কাব্যিক শ্লোক সমূহের মধ্য দিয়ে। অর্থবেদের একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে—

> গিরিযস্তে পর্বতা হিমবন্তোহরণ্যং তে পৃথিবী স্যোনমস্তু।
>
> বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবাংভূমি পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম।
>
> অজীতোহ হতো অক্ষতোহধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম।।[১৮]

পৃথিবীর যে অপার সৌন্দর্য এবং তাকে দেখে মানুষের মনে যে আনন্দ তার কথা বলা হচ্ছে। এখানে আরও বলা হচ্ছে যে, পৃথিবীর এই সৌন্দর্যের উৎস যেন কোনো দিন শেষ না হয়। অথর্ববেদের কোনো কোনো সূক্তে পৃথিবী, মেঘ বা আকাশের সম্পর্ক এমন করে দেখানো হচ্ছে যেখানে মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতা ধরা পড়ে—

> এই ধরিত্রী আমার জননী, আমার মাতা। আমি এই ধরিত্রীর সন্তান। আমাদের পিতৃতুল্য মেঘেরা পৃথিবীর ওপর বৃষ্টিকরুণা বর্ষণে আমাদের পরিপোষণ করেন।[১৯]

প্রাচীন ভারতে মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে এই সম্পর্কের খতিয়ানে আমারা আসলে উৎপাদন-কেন্দ্রিক মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাই। পৃথিবীর বুকে যে শস্য তা আকাশ ও পৃথিবীর মিলনের মধ্য দিয়ে উৎপাদিত হয়। বেদে দেখতে পাই মানুষ নিজেকে যেমন প্রকৃতির সন্তান বলেছে ও তার সমস্ত উপাদানকে ব্যবহার করছে। কিন্তু এই ব্যবহার যথেচ্ছ নয়। মানুষের প্রয়োজনে যদি ধরিত্রীকে খনন করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে তাহলে সেই খনন করা ভূমিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনাও সমান জরুরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

> যৎ তে ভূমে বিখনামি ক্ষিত্রং তদপি রোহতু।
>
> মা তে মর্ম বিমৃগ্ধরি মা তে হৃদয়মর্পিপম।।[২০]

ফলে আমরা বুঝতেই পারি প্রাচীন ভারতে মানুষ পরিবেশ নিয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল এবং শুধু সচেতন বললেই তা শেষ হয়ে যায় না, পরিবেশের সংরক্ষণ চিন্তাও সমানভাবে তাদের মাথায় কাজ করত। বৈদিক সাহিত্যে পরিবেশের সমস্ত উপাদানের সংরক্ষণের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমন করে

পরিবেশের সমস্ত উপাদানের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের কথাও সমানভাবে উচ্চারিত হয়েছে। যজুর্বেদে আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের সৃষ্টিকর্তা একজন ঈশ্বরের কল্পনা করা হয়েছে। এই সর্বশক্তিমান পৃথিবী, বাতাস, জল, আলো সমস্ত কিছু তৈরি করেছেন তাঁর নিজের শরীর থেকে। তিনি কেবল পৃথিবীর অজীবজ উপাদান তৈরি করেননি। তিনি সমস্ত জীবজ উপাদান তাঁর শরীর থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপরেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বাইবেলে যেখানে বলা হচ্ছে যে, মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাই মানুষ ঈশ্বরের অন্য সৃষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে এমন কোনো স্পর্ধিত উচ্চারণ শোনা যায় না। যজুর্বেদে আমরা শুনতে পাই—

> Along with all these elements of the enviroment he has created human benigs. Here we do not find any special concession given to human being to surpass or to master the other factors.[২১]

ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্যের বিষয়টিকে কখনই খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। উপনিষদের সময়ে মানব জীবনে প্রকৃতির ভূমিকাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপনিষদে বৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়ার কথা অর্থাৎ জল থেকে বাষ্প হওয়া ও সেখান থেকে মেঘ তৈরি হওয়া এবং শেষে বৃষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদে বৃষ্টির সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করে মানব জীবনে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হচ্ছে—

> অপো বাবান্নাদ্ভূয়স্তস্মদযদা সুবৃষ্টির্ণ ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যেতীত্যথ যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ... ।[২২]

অর্থাৎ, বৃষ্টি হলে ফসল ভালো হবে এবং মানুষের খাদ্যের সমস্যা থাকবে না। উপনিষদের সময়ে আমাদের ভারতবর্ষের জীবিকা বা খাদ্য যে চাষবাসের মধ্য দিয়েই আসত ও তা পুরোপুরি বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল এই শ্লোকটি তার প্রমাণ।

(খ) রামায়ণে প্রতিফলিত পরিবেশ ভাবনা

রামায়ণের সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক চেহারা অনেকখানি বদলে যায়। সারা বৈদিক সাহিত্যগুলিতে আমরা আর্য ঋষিদের দেখতে পাই নিজের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় উপাদানকে আবেদনের মধ্য দিয়ে পূরণ করতে চাইছে। এই পর্বে মানুষের জীবনযাপনের জন্য নানা বিরুদ্ধ শক্তির

সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে; ফলে স্বাভাবিকভাবেই এরা চরম কোনো শক্তির কাছে আশ্রয় নিয়েছে। রামায়ণের সময়ে ভারতবর্ষ আর কেবলমাত্র দেবতার কাছে আবেদন-নিবেদনের পর্যায়ে থেমে থাকেনি। রামায়ণের সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সুস্থিরতা আরও মজবুত হয়েছে। আমরা এই কথা বলছি তার কারণ আমরা ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়েই জানি যে, মানুষ শিল্প বা দর্শণের কথা তখনই ভাবতে পেরেছে যখন তার বাসস্থান থেকে তার খাদ্যের বিষয়গুলি মজবুত ভীত পেয়েছে। রামায়ণে সময়ে তাই পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের ধারণা অনেকখানি আলাদা। কিন্তু মোটের উপর বলা যায় যে, রমায়ণের সময়েও মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লগ্ন হয়েই জীবন অতিবাহিত করত। রামায়ণ সমগ্র জাতির জীবনের মূল কথাগুলি বলে। রামায়ণ ভারতবর্ষের কর্ষণজীবী মানুষের কথা বলে। রামায়ণে রামের লঙ্কা জয়ের জন্য যাত্রা আসলে কৃষিসভ্যতা বিস্তারের আখ্যান। আমরা জানি যে অহল্যার মুক্তির আখ্যান, যেখানে অভিশাপ-গ্রস্ত অহল্যার পাষাণে পর্যবসিত হওয়া ও রামের পায়ের স্পর্শে প্রাণ ফিরে পাওয়া অনুর্বর ভূমিকে শস্য শ্যামল করে তোলার বিষয়কে রূপকের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে—

> ভূমি হলচালনার অযোগ্যরূপে অহল্যা পাষাণ হয়ে পড়েছিল এবং সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের অন্যতম ঋষি গৌতম যে একদা গ্রহণ করলেও অভিশপ্ত বলে পরিত্যাগ করে যাওয়াতে দীর্ঘকাল তা ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন প্রস্তরময় ভূমিকে সজীব করে আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই রামায়ণের যুদ্ধ এক অর্থে কৃষিবিস্তারের দ্বারা আর্য সভ্যতা বিস্তারের যুদ্ধ।[২৩]

রামায়ণ জুড়ে আছে কর্ষণজীবী মানুষের কাহিনি। রামায়ণে জনক মিথিলার রাজা হলেও কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল; জনকের হলকর্ষণ ও সীতা জন্মের কাহিনি সেই বিষয়কে প্রমাণ করে। গোদাবরীর তীরে রাম ও সীতার বসবাসের সময় তাদের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়া ও পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে বন্ধন স্থাপন করা; এই সমস্ত কিছু প্রমাণ করে রামায়ণের সময়ে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অন্য জীবকুলের সম্পর্কের খতিয়ান। আমাদের মনে পড়বে যে, সীতাহরণের সময়ে সীতা তার সন্ধানরেখা জানিয়ে দিচ্ছিলেন অরণ্যের প্রাণের মধ্যে ও জটায়ুর কাছে আর সীতার অনুসন্ধানকালে রাম নানা উদ্ভিদের কাছে সীতার সন্ধান চাওয়ার মধ্যে প্রমাণ করে প্রকৃতির সমস্ত প্রাণের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল পরস্পরের সাহায্যকারী হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের খতিয়ানকে এইভাবে বলেছেন—

> যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে ও প্রাণের লীলা অপরূপ মহিমায় প্রকাশিত হয়, তারই মাঝে প্রকৃতিকে ধ্যানপরায়ণ ঋষিরা একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ...প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের সত্তার গভীর আত্মীয়তার উপলব্ধি করতে পেরে আর্য ঋষিরা বলতে পেরেছিলেন— যদিদং কিঞ্চিৎ জগত সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা কিছু সবই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। যেখানে তারা বাস করতেন, যেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাদের ছায়া দিয়েছে ফুল ফল দিয়েছে, কুশ সমিধ জুগিয়েছে। তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে বনের(অর্থাৎ প্রকৃতির) আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে সব দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, সেই দানগুলি যে মাটির দান নয়, গাছের দান নয়, শূন্য আকাশের দান নয়— একটি চৈতন্যময় অনন্ত আকাশের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবন, এইটিই তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন।[২৪]

আমরা সহজেই বুঝতে পারি রামায়ণের সময়ে মানুষ প্রকৃতির দানের মধ্যে দেবতার ঐকান্তিক উপস্থিতিকে প্রাধান্য দিতেন। এই কারণে রামায়ণের সমস্ত বন, উপবন থেকে শুরু করে তপোবন পর্যন্ত সবাই সজীব সত্তায় উন্নীত হয়েছে। আমরা রামায়ণের পরিবেশের যে ইতিহাস দেখতে পাই তা যথার্থই মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণের সখ্যতার ইতিহাস। আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মৈনাক পর্বতকে ঘিরে তৈরি হওয়া আখ্যানের কথা। এখানে মৈনাক পাহাড়কে জীবন্ত সত্তা বলে মনে করা হচ্ছে। আবার রামের লঙ্কা যাওয়ার জন্য সমুদ্র পার হওয়ার কাহিনিতে দেখতে পাই যে, রাম সাগরে সেতু নির্মাণের জন্য গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করছে। আমরা জানি যে, এই সেতু বা ব্রীজ নির্মানের জন্য আজকে পরিবেশ চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে। রামায়ণের সময়কালে এই সেতু বন্ধনের জন্য কিন্তু মানুষের আধিপত্যের দিক দেখা যায় না। আমরা সেখানে দেখতে পাই দৈব-নির্ভরতার কথা বা আবেদনের কথা। ফলে বুঝতেই পারি তখনকার সময়ে মানুষের প্রকৃতিপাঠের ধরণকে। রামায়ণে মানুষের তপোবন-কেন্দ্রিক যে জীবনযাপন সেখানে আমরা বাস্তুতন্ত্রের সঠিক সহাবস্থান দেখতে পাই। চিত্রকূট পর্বতের ঋষিদের জীবন থেকে এখানে যে প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া পরিবেশের ভারসাম্যের দিক প্রকাশিত হয়। আবার দণ্ডকারণ্যের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও তার জলবায়ুর যে বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে আসে সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি রামায়ণের সময়ে মানুষ প্রকৃতির কোলেই বেড়ে উঠেছে। ফলে সমস্ত রামায়ণ জুড়েই আছে প্রকৃতির প্রতি মানুষের নির্ভরতার কথা। রাজপ্রাসাদের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা কৃষিনির্ভরতার কথা ভুলে যায়নি।

রামায়ণের সময়ে মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সুরক্ষা এসেছে কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকে তখনও আধিপত্যের মনোভাব নিয়ে দেখেনি। তারা প্রকৃতিকে পুজো করেছে তার মহত্ত্বের কথা স্বীকার করে। রামায়ণে তপোবনের জীবন থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদের জীবনে প্রকৃতি নির্ভরতার কথা বারবার উচ্চারিত হতে দেখা যায়। ফলে রামায়ণ প্রাচীন ভারতের পরিবেশকে মানুষ কীভাবে পাঠ করছে তার একটি রূপরেখা আমাদের সামনে চলে আসে।

আমরা রামায়ণে যে সমস্ত বনের উল্লেখ পাই তাদের চরিত্র অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করতে পারি— মহাবন বা অরণ্য, তপোবন এবং শ্রীবন। মহাবন বা অরণ্যে প্রকৃতি ঘন জঙ্গল, দুর্গম আজকের কথায় যাকে আমরা বন্য-প্রকৃতি বলি, এই মহাবন সেই ধরনের। এই বনে মানুষের বসতি থাকে না। আবার তপোবন বললে আমাদের কাছে এর প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের ছবি ভেসে ওঠে। লোকালয় থেকে বহুদূরে এই তপোবনের অবস্থান। গুরু-শিষ্য থেকে শুরু করে আশ্রমবাসীরা এই বনে বাস করত। তপোবনের প্রকৃতির সঙ্গে এখানকার মানুষদের সম্পর্ক অনেকটা আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। বনের পশুপাখি থেকে সমস্ত প্রাণের নিরাপদ আশ্রয় ছিল এই তপোবন। অন্যদিকে শ্রীবন ছিল নগর বা গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বন। আমরা এই বনকে অনেকাংশে মানুষের তৈরি বলতে পারি। মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় নানা কিছু এই বন থেকেই আহরণ করত। এখানে মানুষের বসতি ছিল। এবং এর রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব মানুষের উপর দেওয়া থাকত। আমরা এই শ্রীবনে বনসৃজনের বিষয়টি দেখতে পাই। এই তিন প্রকারের বনের উল্লেখ করার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, রামায়ণের সময়ে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কেমন ছিল তা বোঝার জন্য। আমরা বুঝতেই পারি রামায়ণের সময়ে তিন ধরনের বন ও তাদের বাস্তুতন্ত্রের রকমফের। অরণ্য বা মহাবনে মানুষ তেমন যাতায়াত করত না। ফলে বোঝাই যায় এই বন তার সমস্ত বন্য-প্রকৃতিকে নিয়ে বিরাজ করত। আবার তপোবনে রাজারা গেলেও সেখানকার প্রাণীদের তারা হত্যা করত না। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে আশ্রমবাসী তথা অন্যদের সম্পর্ক হিংসাশূন্য হত। শ্রীবন যেহেতু লোকালয়ের মধ্যেই গড়ে উঠত তাই মানুষ এখান থেকে প্রতিদিনের নানাবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করত এবং এর সংরক্ষণ করত সমানভাবে। আমরা এই বনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ধরণ দেখে বুঝতে পারি রামায়ণের সময়ে মানুষ কেবল প্রকৃতির শোভা দেখেই মুগ্ধ হয়নি তাকে তারা সংরক্ষণও করেছে।

আমরা রামায়ণের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি যে, রামায়ণের সময়েও মানুষ প্রকৃতির কাছে সহায়তা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে এসেছে। আমরা দেখেছি রাম, সীতা থেকে শুরু করে অন্য অনেক চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। এইবার আমরা আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করব যেখানে আজকের সময়ের মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। রামায়ণের রাম চরিত্রের উদারতার কথা আমরা সবাই জানি। এই রামের প্রকৃতিপ্রেম ও তাকে রক্ষার জন্য তার প্রার্থনাও আমরা রামায়ণে দেখতে পাই। কিন্তু, এই রামের চরিত্রের কোনো কোনো আচরণে প্রকাশ পায় আজকের সময়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের আধিপত্যের দিক। এই আধিপত্যকামী পুরুষ প্রকৃতি ও তার সহোদরা নারীকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করে । সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও তার পাতাল প্রবেশের কাহিনি আমাদের সেই সত্যের দিকে নিয়ে যায়। সীতা পৃথিবী কন্যা ও তার সতীত্ব পরীক্ষা আসলে পৃথিবীকেই অত্যাচারিত করা, তাকে লাঞ্ছিত করা। সীতার পাতাল প্রবেশের পর রামের আস্ফালন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় নারী বা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি উঠে আসে। সীতাহারা রামচন্দ্র বলেন—

> তুমি সীতাকে আন, আমি মৈথিলীর জন্য উন্মত্ত হয়েছি। যদি মহীতল থেকে সীতাকে তার পূর্ব রূপ ফিরিয়ে না দাও তবে পর্বত ও বন সমেত তোমাকে ধ্বংস করব, ভূমির উচ্ছেদ করব, সমস্ত জলময় হয়ে যাবে।[২৫]

এখানে রামের সীতাবিরহের শোক যেমন সত্য, ঠিক তেমন করে প্রকাশ পাচ্ছে রামের পৃথিবীর প্রতি আধিপত্যের অহংকার বা দম্ভ। তাই রামের বসুধার প্রতি রাগ প্রকাশকে আমরা পাঠ করতে পারি প্রকৃতি ও নারীর প্রতি পুরুষের আধিপত্যের মনোভাবের নিরিখে।

(গ) মহাভারত ও পরিবেশ

রামায়ণের সময় থেকে মহাভারতের সময়কার ভারতবর্ষের অনেক কিছুই পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা রামায়ণের কৃষিজীবী সভ্যতার বিস্তারের কাহিনি পাই। কিন্তু, মহাভারতের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই আছে রাজপরিবার ও তাদের নানা রাজনৈতিক ক্ষমতার ইতিহাস। মহাভারতকে ভারতবর্ষের সমস্ত কিছুর আকরগ্রন্থ হিসেবে দেখা হয়। এইজন্য ভারতবর্ষের পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনায় মহাভারত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। মহাভারতের নানা দার্শনিকতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে নানা

আলোচনা দেখতে পাই। আমরা প্রথমেই দেখি দুষ্মন্তের তপোবনে যাওয়া ও সেখানকার প্রকৃতিকন্যা শকুন্তলাকে বিয়ে করা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মহাভারতের তপোবনকেন্দ্রিক মানুষের জীবনযাপন থেকে সেখানকার পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্কের খতিয়ান পাই। তপোবনে দুষ্মন্তের শিকারে উদ্যত হওয়া ও সেখান থেকে বিরত হওয়ার প্রসঙ্গে আমরা বুঝতে পারি তপোবনের পরিবেশের কথা। আমরা সহজেই বুঝতে পারি তপোবনকেন্দ্রিক পরিবেশে মানুষ ও প্রকৃতির অন্য প্রাণের সম্পর্ক কেমন ছিল আর সেই পরিবেশে মানুষের আচরণ কেমন হবে তার ধরন-ধারণ। আমরা দেখতে পাই শকুন্তলার সঙ্গে তপোবনের অন্য প্রাণের সম্পর্ক; যেখানে অন্য প্রাণদের শকুন্তলা নিজের আত্মীয় বলে মনে করছে। শকুন্তলার বিদায়পর্বের সময়ে শকুন্তলার সঙ্গে প্রকৃতির অন্য প্রাণের সম্পর্ক কত নিবিড় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তপোবনের যে পরিবেশ ও দুষ্মন্তের প্রাসাদ কেন্দ্রিক পরিবেশের মৌলিক তফাতের কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন। তিনি আমাদের জানান যে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারেনি তার বড় কারণ শকুন্তলার তপোবন থেকে রাজপ্রাসাদে আসার জন্য। রাজপ্রাসাদে শকুন্তলা আসলে খণ্ডিত নারী। তপোবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতিকন্যা শকুন্তলার নিজস্ব বাসস্থান। তপোবনের প্রকৃতি ও পরিবেশেই শকুন্তলা মানানসই; সেখান থেকে উপড়ে শকুন্তলাকে কংক্রিটের জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া আসলে খণ্ডিত শকুন্তলাকে নিয়ে যাওয়া। তাই শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের চিনতে না পারা যেন রূপকের মতো। আমাদের এই ধারণা আরও মজবুত হয় যেখন দুষ্মন্ত ভুলে যাওয়া শকুন্তলাকে চিনতে পারে সেই তপোবনের মধ্যেই। মহাভারতের এই আখ্যানটিতে আসলে শহর বা রাজপ্রাসাদের জীবনযাপনের সঙ্গে তপোবনকেন্দ্রকি জীবনযাপনের দ্বন্দ্বকেই তুলে ধরে। এখানে আমরা আরও বলতে পারি নগর হাত বাড়িয়েছে অরণ্যের দিকে। তপোবনের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে শকুন্তলাকে যখন দুষ্মন্তের প্রাসাদে এলো তখন এই প্রকৃতি কন্যাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। অরণ্যপ্রকৃতি নাগরিক সভ্যতার কাছে এসে অসম্মানিত হবে সেটাই স্বাভাবিক। তাই কবি এখানে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের মিলন কোন নাগরিক পরিসরে ঘটায়নি, প্রকৃতির জয়গান করে প্রকৃতির মাঝেই দুইজনের মিলন ঘটিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি কাব্যের কথা মনে পড়ে, ‘কুমারসম্ভবম’। এই কাব্যের ‘অকাল বসন্ত’ ও মদন ভস্মের কাহিনি আমাদের মনে করিয়ে দেয় আধুনিক সময়ের কৃত্রিম পরিবেশ রচনার বিষয়টি। এই প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী আমাদের চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন-

তুষারবৃত হিম-পর্বতশিখরে তপস্যারত মহাদেব।...সখা বসন্তকে নিয়ে মদন গেলেন শিব-সকাশে। অকালে বসন্ত- প্রকৃতির সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং ধ্যানও ভেঙে গেল শিবের। কিন্তু শিব পার্বতীর দিকে তাকালেন না, তাঁর ক্রোধের আগুনে ভস্মীভূত হলেন মদন। ...কিন্তু শীত- তীব্রতার পরিবর্তে বসন্ত- বায়ুর প্রীতিকর উষ্ণতা, ফুলের গন্ধ ও শোভা, কোকিলের ডাক কেন এত বিরক্তি উৎপাদন করল তাঁর? হয়তো এজন্যই- এই বসন্ত স্বাভাবিক বসন্ত নয়। কৃত্রিম ও বানানো এক পরিবেশ, সিনেমার দৃশ্যের মতো। যেন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে কৃত্রিম ফুল-পাতা, অ-প্রাকৃতিক আলো এবং যান্ত্রিক সুরপ্রক্ষেপ দিয়ে বানিয়ে তোলা বসন্তের ছলনা। শিব সহ্য করতে পারেননি প্রকৃতি-পরিবেশের এই মিথ্যা- নির্মাণ।[২৬]

রবীন্দ্রনাথের *‘তপোবন’* প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলছেন—

তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্তসমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।[২৭]

মহাভারতে ভরদ্বাজ এক জায়গায় বলবেন যে, বৃক্ষের মধ্যে সমস্ত প্রাণের প্রকাশ আছে। ফলে ভারতবর্ষের তপোবনকেন্দ্রিক পরিবেশে মানুষের যে জীবনযাপন সেখানেই যে প্রকৃত ভারতবর্ষের আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মহাভারতের সময়ে আমরা একটা বিষয় লক্ষ করি যে, এখানে বৃক্ষরোপণের কথা বলা হচ্ছে। এই বৃক্ষরোপণের প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে সামাজিক বনসৃজনের কথা; এই বৃক্ষরোপণের বিষয় আরও জোর পাবে অশোকের সময়ে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৫৮তম অধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, বৃক্ষরোপণ মানুষের মহৎ কাজ। ভীষ্ম এই অধ্যায়ে বলছেন যে, বৃক্ষ শুধু রোপণ করলেই হবে না, বৃক্ষকে নিজের পুত্রের মত করে লালনপালন করতে হবে। বৃক্ষর সঙ্গে রোপণকর্তার সন্তান-সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমরা মহাভারতের সময়ে মানুষের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের ধরণ বুঝতে পারি।

বর্তমান সময়ে মানুষের পরিবেশের উপর নিজের আধিপত্যের ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ নিজের সুবিধার জন্য প্রতিদিন নানাভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছে। প্রাচীন ভারতে বিশেষ করে মহাভারতে সময়ে এমন একটি ঘটা আমাদের সামনে আসে যেখানে সরাসরি মানুষ প্রকৃতির উপর আঘাত হানছে নিজের সুবিধার জন্য, যদিও তা ধর্মের মোড়কে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মানের জন্য খাণ্ডবদহনের কাহিনিটি। অরণ্যের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করে নাগরিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হল এই খাণ্ডবদাহনের ঘটনায়। এখানে প্রকৃতি ও

দেবতার বিরুদ্ধে সরাসরি মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এই যুদ্ধে শেষপর্যন্ত মানুষ জয়লাভ করে। আমরা জানি এই বনেই বাস করত তক্ষক নাগ এবং বন পোড়ানোর জন্য তার বাসভূমি লোপাট হয়ে সে একা হয়ে পড়ে। মহাভারতে এই নাগের সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধ আসলে প্রকৃতির প্রাণের নিজের অস্বিত্বের জন্য লড়াই হিসেবে দেখা যেতে পারে। যে ইন্দ্রকে বৈদিক সমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে, মহাভারতে সেই ইন্দ্র মানুষের কাছে পরাজিত হয় আর মানুষ দেবতাকে পরাজিত করে প্রকৃতির উপর সরাসরি আধিপত্য বিস্তার করে। এখানে কেবল আধিপত্য বিস্তার করে না নাগরিক জীবনের অংশ স্বরূপ ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণ করে। ফলে, আমরা বুঝতেই পারি নাগরিক সভ্যতা প্রকৃতির উপর প্রবলভাবে আঘাত হেনে মানুষের যে চিরকালীন প্রকৃতির সঙ্গে সহজাত সম্পর্ক তা ছিন্ন করে দেয়। সারা মহাভারত জুড়ে এমন ঘটনা আমরা অনেক দেখতে পাব যেখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সহজ সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে আবার কোথাও মানুষ এই প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে। আর এই আধিপত্যের বিষয় আরও চরম আকার নিতে থাকে সময়ের ক্রমিক অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে।

১.৩ জৈন ও বৌদ্ধ পরিবেশ চিন্তা

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রকৃতি বড় অংশ জুড়ে আছে। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছে প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলে। গৌতম বুদ্ধের জন্ম, নির্বাণ থেকে শুরু করে সমাধি পর্যন্ত প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে। এই দুই ধর্মের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকলেও মোটের উপর প্রকৃতিকে রক্ষা, সংরক্ষণ নিয়ে একই কথা বলেছে। জৈন ধর্মে সর্বপ্রাণবাদের উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। জৈনধর্মে বিশ্বের সমস্ত উপাদানকে দুই ভাগে ভাগ করেন— জীব ও অজীব। কিন্তু এই দুইয়ের অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপর। জৈনধর্মে বলা হয় প্রকৃতির প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতার কথা। এই ধর্মে বলা হয়, প্রাণ ও অপ্রাণ মিলিয়ে মানুষ এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাই মানুষের নৈতিক দায়িত্ব হল এই সমস্ত উপাদানের সংরক্ষণ করা। জৈনধর্ম থেকে শুরু করে বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হল অহিংসা। এই অহিংসা, পরিবেশের সমস্ত প্রাণ ও অ-প্রাণের প্রতি বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এখান থেকেই জৈনধর্মের 'সর্বপ্রাণবাদ' ধারণার উদ্ভব। আজকের সময়ে পরিবেশ বিপন্নতার কারণ হল, আমাদের ভোগকেন্দ্রিক মানসিকতা। আমাদের

প্রয়োজনের বাইরে গিয়ে, আমাদের সঞ্চয়কেন্দ্রিক মানসিকতার জন্য প্রকৃতি তার বিপুল সম্পদ নিয়েও আজকে নিঃস্ব হতে বসেছে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের এই মানসিকতাকে সমালোচনা করা হয়েছে। জৈনধর্মে বলা হয়েছে যে, ভ্রমর যেমন করে ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ করে ফুলের কোনো ক্ষতি না করেই, তেমন করে মানুষকেও প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নিতে হবে—

> A house holder to accumulate wealth as a bee collects nectar from a flower without harming either the fragrance or the beauty of a flower. A human being is required to make appropriate use of nature so that the continuity of a benefical pattern of man and nature relationship is not threatened.[২৮]

গৌতম বুদ্ধ তাঁর বাণীতে বারবার করে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলেছেন। তিনি আমাদের নৈতিক আদর্শের চর্চা করতে বলেছেন এবং এই নৈতিকতার মধ্য দিয়েই আমরা প্রকৃতির প্রতি আরও বেশি দায়বদ্ধ হতে পারব। জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে, যেখানে বলা হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ বা সমস্ত কিছু একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল এবং একটির পতন অন্য প্রাণের অস্তিত্ব সংশয়াপন্ন করে তোলে। বাস্তুতন্ত্রে বলা হয় যে পরিবেশের সমস্ত উপাদান শৃঙ্খলিত ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তাই একে অপরের সংরক্ষণ খুবই জরুরি। জৈনধর্মে ঠিক এই কথাই বলা হয়। এই দুই ধর্ম-ভাবনায় মানুষের দুঃখের কারণ হিসেবে মানুষের ভোগবাদী চিন্তাভাবনাকে দায়ী করা হয়েছে। আর এই ভোগবাদী চিন্তার জন্যই মানুষ প্রকৃতিকেও ভোগ্যপণ্য করে তুলেছে। এই দুই ধর্মমতে হিংসা ও ভোগ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে প্রকৃতি বিশেষ স্থান পেয়েছে। গৌতম বুদ্ধ জীবনের সমস্ত প্রজ্ঞা লাভ করেছেন প্রকৃতির শান্ত সমাহিত পটভূমিকায়। বৌদ্ধধর্মে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে দূরে গিয়ে সবার জন্য ভাবার কথা বলা হয়েছে। আর এই একই বিষয় তাদের ধর্ম ভাবনায় স্থান লাভ করেছে। বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ নিয়ে বলা হয়েছে—

> The Buddhist envirnonment philosophy is a shift form ego-centric stance to an eco-centric orientation।[২৯]

বৌদ্ধধর্মে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে প্রসারিত হয়ে মনের বিকেন্দ্রিকতা লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের মত অনুসারে মানুষ পরিবেশের সমস্ত প্রাণকে প্রেম-করুণা ও দয়ার মধ্য দিয়ে লালনপালন করার কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুই ধর্মমতে অহিংসাকে

যেমন পালনের কথা বলা হয়েছে ঠিক তেমন করেই সমস্ত রকমের জীবহত্যাকে নিষেধ করা হয়েছে। আসলে এই দুই ধর্মমতে পরিবেশের সমস্ত উপাদানের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক আত্মীয়তার কথা বলা হয়েছে।

আমরা জাতকের গল্পগুলির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ ভাবনা বা প্রকৃতির গুরুত্ব। জাতকের গল্পগুলি তৈরি হয়েছে বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব লাভের পূর্ব-জন্মে নানা পশুপাখি হয়ে জন্মলাভ ও প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের আখ্যান দিয়ে। আমরা জাতকের গল্পে পরিবেশের জীববৈচিত্র্য দেখতে পাব। এই আখ্যানগুলিতে কেবলমাত্র নানা পশুপাখির উপস্থিতি দিয়েই শেষ হয়নি। এখানে পশুপাখির থেকে শুরু করে নানা রকমের বৃক্ষের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের আদলেই আখ্যানগুলি তৈরি হয়েছে। বুদ্ধ জাতকের গল্পগুলির চরিত্র পশুপাখি থেকে শুরু করে নানা বৃক্ষ চরিত্র হিসেবে হাজির হয়েছে। এই বৃক্ষ ও পশুপাখি চরিত্র হিসেবে উপস্থিতি প্রমাণ করে এই ধর্মে মানুষকেই কেবল প্রাধান্য দেয় না, এই ধর্মের সমস্ত প্রাণের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্যে আমরা প্রায় দেখতে পাই বৃক্ষকে আশ্রয় করে বৃক্ষদেবতার উদ্ভব হয়েছে। বৃক্ষধর্মজাতক, পলাশজাতক-১ ও পলাশজাতক-২ প্রভৃতি জাতকে বৃক্ষে নানা দেবতার অধিষ্ঠানের উল্লেখ পাই—

> হীনযান মতে চব্বিশজন বুদ্ধের উল্লেখ আছে যাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বোধিবৃক্ষের সাথে যুক্ত।...ভারতহুত স্তুপবেষ্টনীর দেওয়ালগিরীতে দেশী বিদেশী নানা জাতের লতাপাতা, ফুলফল, গাছপালার সাথে খোদিত আছে ছয়টি বোধিবৃক্ষ।[৩০]

বুদ্ধের জন্মলাভ, নির্বাণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জুড়ে আছে বৃক্ষের অবদান। এই শাক্য রাজার জন্ম হয় লুম্বিনী উদ্যানে এক শাল বৃক্ষের তলায়, আবার নৈরঞ্জনা নদী তীরে এক পিপুল বৃক্ষের তলায় বসে তাঁর বিশেষ জ্ঞান লাভ হয় আর সমাধি হয় হিরণ্যবতী নদীর তীরে। ফলে আমরা বুঝতেই পারি বুদ্ধের জীবনপ্রবাহ সমস্তটাই প্রকৃতির কোলে প্রবাহিত হয়েছে।

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে সবাই যখন ভোগের দিকে প্রতিনিয়ত দৌড়চ্ছে, আমাদের প্রতিদিনের জীবন ভোগকেন্দ্রিক হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবেশের বিনাশ সাধিত হচ্ছে। সেখানে বুদ্ধদেবের জীবন ও আদর্শ বর্তমান জীবনযাপনের যে অভিমুখ তার বিপরীত দিকে চালিত হয়। একজন রাজপুত্র হয়ে সমস্ত বিলাস-বৈভব ত্যাগ করে, অহিংসাকে ব্রত করে প্রকৃতির অপার

শান্তির মাঝে জীবন অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের ঐতিহ্য লালিত প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবন অভ্যাসের কথা বলেন। বুদ্ধের নিজের জীবনযাপন থেকে তার প্রচারিত ধর্মে তাই আমরা বারবার করে প্রকৃতির এই বিরাট ভূমিকার কথা শুনতে পাই । প্রকৃতির মধ্যে যে সবার সমান গুরুত্ব ও সবার সমান অধিকার আছে তা বৌদ্ধধর্মের মূল কথা। আজকের সময় যখন মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ভাবছে, সেখানে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম বাণীতে পারস্পরিক নির্ভরতার কথা বারবার প্রকাশিত হয়েছে। এই ধারণার থেকেই বুদ্ধের দর্শনকে বলা হয়েছে 'রিলিজিয়াস ইকোলজি'।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতিতে পরিবেশ নিয়ে যে আলোচনা বা চিন্তাভাবনার কথা আছে তার নিরিখে 'ডিপ ইকোলজি'র তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। আমরা জানি এই দুই ধর্মে পরিবেশে বসবাসকারী জীবজ ও অজীবজ উপাদানের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে প্রকৃতি পবিত্র। বৌদ্ধধর্মের পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনার মধ্যে বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের সনংরক্ষণকে যেমন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমন করেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের বাঁচার অধিকারকে। বৃক্ষ ও বনভূমিকে সংরক্ষণ করা বৌদ্ধধর্মে আধ্যাত্মিক কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এই বিশ্বকে 'গৃহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'গৃহ' বলতে কোনো চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী ধারণা নয়। এই গৃহের ধারণা অনেক ব্যাপ্ত, কোনো প্রাচীরের ঘেরাটোপ এই গৃহের ধারণায় আসে না। এই ধর্মে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষ জন্মের পর ও মৃত্যুর পরেও এই গৃহে আশ্রয় নেয়। আসলে এই গৃহের ধারণার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ থেকে তার সব প্রাণ ও অপ্রাণকে একটি সমবায়ে আনতে চেয়েছে। এই গৃহ তাই নিখিল বিশ্বকে নির্দেশ করে। আবার বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে 'নির্বাণ' ও 'প্রজ্ঞার' মাধ্যমে এই 'গৃহে' প্রবেশ করা যায়। গৌতম বুদ্ধ তাই রাজপরিবারে যে ক্ষুদ্র গৃহ তাকে ত্যাগ করে প্রকৃতির মাঝে গিয়ে প্রজ্ঞা ও নির্বাণ লাভের মধ্য দিয়ে তার আসল গৃহে প্রবেশ করার ছাড়পত্র নিয়ে নেয়। বৌদ্ধধর্মের 'ধম্ম'র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বন ও বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করা। আমরা আগেই আলোচনা করেছি বৌদ্ধধর্মের পরিবেশ-বিষয়ক চিন্তার মূল কথা হল পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকে সমান মর্যাদা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা।

বুদ্ধের এই পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাকে পরবর্তীকালে অশোকের সময়ে বিশেষভাবে কার্যকরী হতে দেখি। অশোকের সময়ে আমরা দেখতে পাই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য তিনি নানা কর্মসূচি পালন করছেন। যেখানে বলা হচ্ছে বনের পশু শিকারের জন্য অযথা বনে আগুন লাগান যাবে না। আমাদের মনে পড়ে বর্তমান সময়ে মানুষ নিজের সুবিধার জন্য বনকে কীভাবে পুড়িয়ে তাকে ধ্বংস করছে। আশোকের সময়ে এমন নির্দেশ আমাদের কাছে প্রমাণ করে প্রকৃতি সম্পর্কে তার মনোভাবের ধরণকে। আমরা জানি অশোক প্রজাদের নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। অশোক এই প্রজাদের মতো করেই পরিবেশের সমস্ত প্রাণকেও নিজের সন্তানের মতো করে ভাবতেন। আর সেই জন্য তার অনুশাসনে বারবার করে পরিবেশ ও তার নানা উপাদানকে রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুর করে তাকে সংরক্ষণের বিষয় ধরা আছে। অশোক বলেছেন—

> আমি পথের দুইপার্শ্বে বটবৃক্ষ রোপণ করেছি, যা মানুষ ও পশুদের ছায়া বিতরণ করবে। আমি আম্রকুঞ্জ ও উদ্যান রচনা করেছি ও প্রতি আট ক্রোশের অন্তর পথশালা নির্মাণ, বিশ্রামাগার ও জলপানের জন্য কূপ খনন করেছি।... এবং প্রত্যেক স্থানে মানুষ ও পশুর জন্য প্রপা বা জলসত্রের ব্যবস্থা করেছি। এই স্বাচ্ছন্দ্যগুলি অতি প্রয়োজনীয়।[৩১]

আমরা দেখতে পাই যে, আশোকের সময়ে সামাজিক বনসৃজনের মতো বিষয়গুলি গুরুত্ব পাচ্ছে। আশোকের পঞ্চম স্তম্ভলেখতে আমরা জীবসংরক্ষণের বিষয়টি বিশদে পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (৪/১/১০-১৭) আমরা দেখতে পাই, কীভাবে বনের নিধন করে কৃষিকাজের জন্য জমি তৈরি করা হচ্ছে। জঙ্গল পুড়িয়ে চাষের জমি তৈরি করার প্রবণতা আগেই ছিল কিন্তু তা বহু পরিমানে বেড়ে যায় অশোকের সময় থেকে। আমরা অশোকের পঞ্চম স্তম্ভ লেখায় এই বিষয়টি স্পষ্ট দেখতে পাই। অশোক ও তার পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই বন থেকে হাতি এনে পোষ মানানো হচ্ছে। ফলে আমরা বুঝতে পারি মানুষ বন্যপ্রাণকে নিজের ক্ষমতা ও সম্পত্তি প্রদর্শণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। অশোকের সময় রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষরোপণ অশোকের মহানুভবতা ও প্রকৃতি প্রেম যেমন প্রকাশ পায় তেমন করেই আমাদের আরও একটি বিষয় ভাবিয়ে তোলে, এই পথের পাশে বৃক্ষরোপণ কী সামাজিক বনসৃজনের মতো নয়? বোঝাই যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বৃক্ষ নিধনে সামিল হয়েছিল। না হলে সামাজিক বনসৃজনের মতো রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ কেন করা হবে? আমরা জানি অশোকের সময়ে মানুষ বেদের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন থেকে সরে এসেছে নগর সভ্যতায়। আর তাই

আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, রাস্তার পাশে গাছ সাফাই হয়েছে। তাই অশোকের এই নির্দেশ যেমন আমাদের বনসৃজন মনে করায় সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে মানুষ নানা প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করেছে। ইরফান হাবিব অশোকের সময়ে অরণ্য ও কৃষিকাজের মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল তার ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন-

> জমির ভাগ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিবাদ হত। অরণ্যবাসীদের সঙ্গে কাঠুরিয়াদের সংঘাত হত, যত্রতত্র বৃক্ষ ভূপতিত করে কেটে ফেলা হত। গাছপালায় ঘেরা কুঞ্জবন ছিল শীতল স্থান, কিন্তু, কাঠকয়লা প্রস্তুতকারীরা কাঠ জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলত, শিকারীরা ঘুরে বেড়াত পশুপক্ষী মারার জন্য। মহিলারা শান্তিপূর্ণভাবে আসত বন থেকে ফল সংগ্রহ করে তাদের গ্রামে বিক্রি করার জন্য। অরণ্যের সীমানায় এবং এর ভেতরে খুঁটি পুতে বেড়া দেওয়া হত, নজরদারীর জন্য উঁচু পাটাতন বসানো হত এবং বন্যপ্রাণী তাড়ানোর জন্য কাকতাড়ুয়া রাখা হত। অন্যভাবে বললে অরণ্য সব সময় আক্রান্ত হত।[৩২]

ফলে আমরা দেখতে পেলাম অরণ্য কীভাবে মানুষের সম্পত্তি হয়ে উঠছে ও মানুষের প্রকৃতি নিয়ে যে ধারণা তার আমূল বদল ঘটছে। অর্থশাস্ত্রে (৩০০ খ্রি. পূর্ব- ১০০) দেখান হয়েছে মানুষ কীভাবে অরণ্যকে ব্যবহার করছে তার ধর্মীয়, সামাজিক, সংস্কৃতিক তথা নিত্য প্রয়োজনে। সেখানে বলা হচ্ছে অরণ্য থেকে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে ঝুড়ি, দড়ি থেকে শুরু করে অস্ত্রের বাঁট তৈরি করছে। এর সঙ্গেই মানুষ বন্যপ্রাণকে নানাভাবে নিজের প্রয়োজনে নির্মম ভাবে ব্যবহার করছে—

> ...এই তালিকায় ছিল অরণ্যজাত উৎপাদিত বস্তু, ঔষধি গাছ, অসংখ্য বন্যপ্রাণীর চামড়া ও দেহাংশ। বন্যপ্রাণীর দাঁত-এর মধ্যে গজদন্তকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। অরণ্য সম্পদের মধ্যে হাতিকে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উৎস বলে মনে করা হত।[৩৩]

এর ফলেই অরণ্যের সঙ্গে তার স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে বৌদ্ধধর্ম ভাবনায় পরিবেশ সংরক্ষণের দিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে যে পরিবেশের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা বিপন্ন হতে শুরু করেছে তা প্রমাণিত হয়।

১.৪ লোকায়ত ধারায় পরিবেশ

মানুষ যতদিন অরণ্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাকে খরা ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে বেশি ভাবতে হয়নি। কেননা মানুষ জল-জঙ্গল থেকে কিছু না কিছু বেঁচে থাকার উপাদান সংগ্রহ করে নিত। কিন্তু, মানুষ যখন কৃষিকাজ থেকে শুরু করে অন্য জীবিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল তখন কৃষিকাজের জন্য বৃষ্টি অনিবার্যভাবে দরকারী হয়ে পড়ল। আর বৃষ্টি না হওয়ার জন্য দেখা দিল খরা। মানুষ অরণ্যের জীবনেও আর ফিরে যেতে পারল না। ফলে তাকে মুখোমুখি হতে হল খরা, দুর্ভিক্ষ নামক নতুন সমস্যার মধ্যে। এখানে প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করার একটা বড় কারণ তৈরি হল। কেননা, মানুষ চাইল বৃষ্টির জল না হলেও সেই সমস্যা মেটানোর বিকল্প উপায় বের করতে। এই বিকল্প উপায়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায় নদীর প্রবাহ ঘুরিয়ে দেওয়া, মাটি খুঁড়ে জল বের করে আনা। মানুষ এভাবেই প্রকৃতির উপর নিজের প্রভুত্ব বিস্তার শুরু করতে লাগল। আমরা জানি যে, আমাদের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠার ইতিহাস। মানুষ প্রকৃতির অপার সান্নিধ্যে নিজেকে পুষ্ট করেছে। এই প্রকৃতি কোন বাইরের বিষয় তার কাছে ছিল না। প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই প্রকৃতি মানুষের কাছে চরম সত্য, আপন করেই জেনেছে। ভারতবর্ষের কৌম্য জীবনযাপনের সময় থেকে শুরু করে নাগরিক সভ্যতার মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ আজকের মতো করে আকার ধারণ করেনি। সেখানে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই তাদের সহজ সরল জীবন অতিবাহিত হত। অরণ্য তথা বৃহৎ প্রকৃতিকে সে মায়ের আসন থেকে নানা দার্শনিকতার দ্বারা উচ্চাসনে স্থান দিয়েছে। তাই প্রাচীন ভারতে অরণ্যকে সংরক্ষণের প্রশ্নই আসেনি। যা আজকের সময় পর্বে সব থেকে বেশি করে প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পর্বে মানুষ প্রকৃতির অপার বিস্তারের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। তাই প্রকৃতির সঙ্গে তার নাড়ির যোগ তৈরি হয়েছে। এইবার আমরা লোকায়ত স্তরে মানুষ প্রকৃতিকে কেমন করে দেখছে বা প্রকৃতির প্রতি মানুষের মনোভাব কেমন ছিল তা জানার চেষ্টা করব।

বৈদিক সমাজ ও তার নাগরিক পরিসরকে ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা গ্রামীন বা লোকায়ত জীবনকে দেখি, তাহলে এই লোকায়ত সমাজের মধ্যে পরিবেশ চেতনার প্রকৃত স্বরূপটি দেখতে পাব। সিন্ধুসভ্যতার পূর্ববর্তী সময়ে, আমরা কোনো নাগরিক সমাজকে দেখতে পাই না। আমরা জানি যে, বৈদিক আর্যরাও গ্রামকেন্দ্রিক সমাজে বসবাস করত। আমরা এটাও জানতে পারি যে, এই গ্রামগুলি গড়ে উঠেছিল অরণ্যকে কেন্দ্র করে। এই অরণ্যকে সঙ্গে নিয়েই মানুষ তার চারপাশের বসতি গড়ে

তুলেছিল। ফলে আমরা বলতেই পারি বৈদিক যুগের গ্রামজীবন ছিল অরণ্যকে ঘিরে। বৈদিক সমাজ বা প্রাক-বৈদিক সমাজের লোকায়ত ভাবনায়, তার আচার অনুষ্ঠানে প্রকৃতি বিশেষ স্থান পেয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক লোকায়ত সমাজে নারীর প্রজনন শক্তির সঙ্গে পৃথিবীর শস্য উৎপাদন ক্ষমতার মিল দেখে গড়ে উঠেছে অনেক জাদু-বিশ্বাস। তাই নারী ও প্রকৃতিকে লোকায়ত সমাজ সমান গুরুত্বে পুজো করেছে। বৈদিক সমাজ-কাঠামো পুরুষতান্ত্রিক হওয়ার জন্য এই সময়ে আমরা দেবীর তেমন উল্লেখ দেখতে পাই না। কিন্তু, প্রাক-বৈদিক লোকায়ত সমাজ যেহেতু মাতৃতান্ত্রিক ছিল সেই কারণে দেবীর সংখ্যা বেশি দেখা যায়। আর এই সমাজ কাঠামোয় দেবী ও প্রকৃতিকে পুজো করার মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষ তার ঐতিহ্যগত প্রকৃতি ভাবনা প্রকাশ করেছে। আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন অনার্যদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। এরপরে এই দুই জনগোষ্ঠী পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সহাবস্থান করলেও তাদের চিন্তাভাবনা ও আচার আচরণের মূলগত প্রভেদ থেকে গিয়েছে। বাংলার ব্রতগুলি বিশ্লেষণ করলে এই সত্য সামনে আআসে। আমরা জানি ব্রতের জন্ম বিভিন্ন কামনা থেকে। এই কামনাতে প্রাথমিকভাবে ধরা ছিল শস্য ও বৃষ্টি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা। এছাড়া উর্বরতাকেন্দ্রিক কামনার ছবিও ব্রতের মধ্যে ধরা আছে। এই কামনায় কোথাও প্রকৃতির উপর আধিপত্যের মনোভাব নেই। আমরা জানি ব্রত নারীর নিজস্ব এলাকা। ফলে নারী তার অন্য সত্তা প্রকৃতির কাছে বাঁচার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করছে লুণ্ঠন করার মানসিকতা থেকে নয়। আমরা যদি শাস্ত্রীয় ব্রতগুলিকে সরিয়ে রাখি তাহলে দেখতে পাব লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনার ধরণকে। লোকায়ত সমাজ সাধারণত প্রজননকেন্দ্রিক ও উর্বরতাকেন্দ্রিক কামনার দ্বারা ব্রতগুলি তৈরি করেছে। ব্রতের দেবদেবী উর্বরতা বা ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই সমস্ত ব্রতে আমরা কৌম্য, দলবদ্ধ সমাজের প্রকৃতিকেন্দ্রিক নানা আচার-অনুষ্ঠান দেখতে পাব; যেখানে নারী ও প্রকৃতি সমানভাবে দেখা হয়। আমরা জানি লোকায়ত সমাজ নারীকে উর্বরা শক্তির প্রতীক বলে মনে করে। নারীর সন্তান জন্মদান থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চলনের সঙ্গে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য মিলে এক হয়ে যায়। এই ধারণা থেকে প্রকৃতি ও মাতৃ-পূজার প্রচলন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এই প্রকৃতিভাবনা বা নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিপন্নতার মুখোমুখি হল। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরের সহচর্যে জীবনযাপন করত। কিন্তু বর্তমান সময় মানুষ শুনল মানুষের প্রকৃতি নির্ভরতা

পতনের শব্দ। এই মানুষ নিশ্চতভাবে নারী নয়, পুরুষ। সে তার ক্ষমতার বলে প্রকৃতিকে দখল করে। মানুষের পরম্পরাগত যে প্রকৃতি পাঠ তা সে এই সময় ভুলে যায়। এর ফলে মানুষ প্রকৃতিকে রক্ষা করতে ভুলে গিয়ে তাকে ভোগ করতে লাগল। ক্ষমতার রাজনীতি ও মুনাফার আশায় মানুষ নিজের থেকে প্রকৃতিকে 'অন্য' করে দিল। পুরুষ যেখানে শস্য উৎপাদন বা বৃষ্টির জন্য নিজের ক্ষমতা বলকে সঙ্গী করে প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করতে চায়। নারী তার পালিত আচারের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির কাছে কামনা জানায় জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান পেতে। আমরা লোকধর্মে প্রকৃতিপূজার আধিক্য দেখতে পাই। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় তার মধ্যেও থাকে প্রকৃতিকে রক্ষা ও সংরক্ষণের বিষয়। যারমধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনা প্রকাশিত হয়। ব্রতে পৃথিবী-পূজার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকে রক্ষা ও সমস্ত প্রাণের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা উচ্চারিত হয়েছে। এই পৃথিবী-পূজার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> আমরা সবাই পৃথিবীর উপর বাস করি। মা যেমন সন্তানের শত অত্যাচার বুক পেতে নেন, পৃথিবী দেবীও তেমনি আমাদের শত অত্যাচারে বিচলিত হন না। যে পৃথিবীমাতা আমাদের এত করেন, তাকে সন্তুষ্ট রাখলে সংসারের মঙ্গল হয়।[৩৪]

ব্রতে যে সমস্ত আচার পালন করা হয় তাতে ধরা থাকে কৌম সমাজের উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস। এই পালনীয় ব্রতগুলিতে মানুষ আসলে প্রকৃতিকে পুজো করেছে এবং তার কাছে প্রয়োজনীয় উপাদানকে প্রার্থনা করেছে। বৈদিক সমাজের আগে এই অনার্যদের পালিত ব্রতে আমরা পাই প্রকৃতির উপাসনা। লোকায়ত সমাজে প্রকৃতি পূজা মানুষের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিল। আদিম, কৌম্য সমাজ যে প্রথম থেকেই প্রকৃতিকে পুজো করে আসছে এবং আজকের সময় সেই আদিম, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের আচার-অনুষ্ঠানের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে তার প্রমাণ এই ব্রতগুলি। নীহাররঞ্জন রায় লোকায়ত সমাজের প্রকৃতি পূজা সম্পর্কে বলেছেন—

> ভারতীয় আদিবাসীরা অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসীদের মতো, বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। বাঙলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছপূজা এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বট গাছ। অনেক পূজায় ও ব্রতোৎসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মস্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আম্রপল্লবে ঘটের প্রয়োজন হয়, যে কলা-বৌ পূজা হয়, অনেক

ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ-সমস্তই সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে।[৩৫]

আসলে আদিম সময়ে মানুষ বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তিকে জয় করতে নানা জাদুবিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারস্ত হয়েছে। এই সময়ের লোকায়ত মানুষ বিভিন্ন অলৌকিকতা ও জাদুবিশ্বাসকে নির্ভর করে আচার অনুষ্ঠান ও বিধি নিষেধ তৈরি করেছে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দলবদ্ধ মানুষের পরিবেশ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে আর এই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর পরবর্তী সময়ে দেবত্ব আরোপ করেছে। লোকধর্মে প্রকৃতিপূজার প্রাধান্য আমরা সেই প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। কৃষি ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য এরা প্রকৃতি পূজার সঙ্গে ধর্মভাবনা যুক্ত করেছে। লোকায়ত সমাজের ধর্ম ভাবনার মূলেই আছে প্রকৃতিকে পূজা করার প্রসঙ্গ—

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ চন্দ্র, সূর্য, তারা, প্রকৃতির নানা উপাদানের অর্চনা করে এসেছে। বিভিন্ন লৌকিক আচার-বিশ্বাসের মধ্যে তা আজও বর্তমান। এই আচার বিশ্বাসের উৎস প্রকৃতির থেকে, আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কিত চেতনা থেকে। পৃথিবীপূজা, ক্ষেত্র (ভূমি) পূজা, নদীপূজা, তারাব্রত, মাঘমণ্ডলের ব্রত ইত্যাদি আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংকরায়ণের ফল। ধরিত্রী, ধাত্রী, ধরণী নামে পৃথিবী পূজিতা। ...শস্যবৃদ্ধির কারক রূপে ক্ষেত্রপতির পূজা, উর্বরাশক্তির বৃদ্ধির কামনায় নদী, হ্রদ, ঝরণা, সাগরের পূজা, কূপ জলাশয় খননের সময় বিভিন্ন পূজা ও ধর্মানুষ্ঠান-এ সবই মিশ্র সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে।[৩৬]

আজকের সময়ে আমরা যেখানে প্রকৃতির উপর বৈজ্ঞানিক শক্তি প্রয়োগ করে পরিবেশকে দূষিত করে তুলেছি সেখানে লোকায়ত মানুষ নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির থেকে সেই প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিকে কেন্দ্র করে সব থেকে বেশি জাদুবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। ভারতবর্ষ তথা বাংলায় আমরা বর্ষাকালে একটি বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠান গ্রাম্য অঞ্চলে দেখতে পাই। এই অনুষ্ঠানের নাম অম্বুবাচী পারাণ। এই সময় সাতদিন মানুষ আগুন জ্বেলে রান্না করে না, মাটি খনন করে না বা এমন কিছু করে না যেখান থেকে তাদের মনে হতে পারে যে পৃথিবীর আঘাত লাগছে। লোকায়ত সমাজ বর্ষাকালে মনে করে পৃথিবীর ঋতুমতি অবস্থা চলছে। তাই এই সময় তারা কেউ পৃথিবীকে আঘাত করতে চায় না। যদি কেউ এই সময় পৃথিবীকে আঘাত করে তাহলে শস্যের ফলন ভাল হবে না। এই অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে আসলে লোকায়ত মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতা প্রকাশ পায় বলে মনে করা হয়। লোকায়ত মানুষের এই পৃথিবী-পূজার মধ্যে কোন ধরনের মানসিকতা প্রাকাশ পায় বা এই পূজার মধ্যে তাদের চিন্তাভাবনার ধরণ কেমন তা নরেন্দ্রনাথ ভটতাচার্য বলছেন—

> ...এই বিশ্বাসই আদিম মানুষের চোখে নারির সঙ্গে পৃথিবীর অভিন্নতা এনে দিয়েছে, মানবিক ফলপ্রসূতার ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করে প্রকৃতির ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা হয়েছে। ... পৃথিবীর ফলোৎপাদিকা শক্তিকে মেয়েদের সন্তান উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার রীতি পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান।[৩৭]

একে ফার্টিলিটি ম্যাজিক বলা হয়। লোকায়ত সমাজে এই উর্বরতাকেন্দ্রিক ভাবনার জন্য লিঙ্গপূজা ও যোনিপূজা প্রচলন দেখা যায়। এখানে মানুষ মনে করে নারীর মধ্যে যে উর্বরতা শক্তি আছে তাদের স্পর্শমূলক জাদুক্রিয়ার জন্য সেই উর্বরতা ভূমিতে সঞ্চালিত হবে ও বেশি শস্য পাওয়া যাবে।

লোকায়ত সমাজের পূর্বপুরুষ পূজার সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি জড়িয়ে আছে। আমরা জানি আদিম, কৌম মানুষ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকে জীবনের শেষ বলে মনে করতেন না। তারা মনে করত যে মৃত্যুর পরেও তাদের পূর্বপুরুষ নানাভাবে তাদের রক্ষা করে চলেছে। এই ধারণা থেকে তারা পূর্বপুরুষের পূজা করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে তাদের পূর্বপুরুষ কোনো বৃক্ষে, অরণ্যের বনস্পতিতে বা তাদের পাশে আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের রক্ষনাবেক্ষণ করছে। এই বিশ্বাসের জন্য তারা সেই বৃক্ষের কোনো ক্ষতি করে না বা তারা সেই স্থানকে নিরিবিলি রাখতে পছন্দ করে। ভারতের বিভিন্ন উপজাতির এই বিশ্বাসের ফলে স্থানীয় অরণ্যে মানুষের যাতায়াত কম হয় ও সেই অরণ্যর জীববৈচিত্র্য থেকে শুরু করে তার সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ অটুট থাকে। আমরা সহজেই বুঝতে পাই যে, লোকায়ত মানুষের নানা বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে সচেতন বা অবচেতন মনে কাজ করে পরিবেশ রক্ষা করার বিষয়। তাই এই সমস্ত মানুষ তাদের প্রতিদিনের যাপিত জীবন থেকে শুরু করে বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানে পরিবেশের সংরক্ষণ করে আসে তাদের ঐতিহ্য পরম্পরাকে মনে রেখে। আজকের সময়েও আমরা দেখতে পাই লোকায়ত মানুষ বৃক্ষ প্রতীকে দেবদেবীকে পুজো করে আসছে। ভারতবর্ষ ও বাংলার নানা গ্রামীন এলাকায় দেবদেবীরা বৃক্ষে অবস্থান করছে বলে মানুষর বিশ্বাস করে। এই বৃক্ষ ও তার চারপাশে কেউ ক্ষতি করে না বা যে বৃক্ষে দেবদেবী বাস করছে তার কোনো ডালপালা মানুষ কাটে না। আমরা দেখতে পাই এই সমস্ত দেবদেবী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাস্ত্রীয় নয়। লোকায়ত মানুষের

দ্বারা এই দেবদেবী ও তাদের আবাসস্থলকে পুজো করা হয়। ফলে আমরা দেখতে পাই এই সমস্ত বৃক্ষকে পুজো করার মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের প্রকৃতিক রক্ষা করার মানসিকতাকে।

প্রাক-বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বৈদিক যুগেও আমরা দেখতে পাই মানুষ প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন ধরণের উপাদান পাওয়ার জন্য অনুকরণমূলক, স্পর্শমূলক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে। এই সমস্ত অনুকরণমূলক ও স্পর্শমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ প্রকৃতির আনুকূল্য পেতে চেয়েছে। যেমন আজকের সময়ে আমরা বৃষ্টি হওয়া ও না হওয়ার কারণ হিসেবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজি। এবং বৃষ্টি যাতে হয়, বৈজ্ঞানিক কারণের যাতে তা বাস্তবায়ন হয় তার চেষ্টা করতে দেখা যায়। কিন্তু লোকায়ত মানুষ এই চিন্তার দিকে পা বাড়ায় না। লোকায়ত মানুষের যদি বৃষ্টি দরকার হয় তাহলে তার অনুকরণে সে কোনো ভাঁড়ে ছিদ্র করে সেখান থেকে বৃষ্টির অনুকরণ করে বা ব্যাঙের বিয়ে দেয় এবং তারা বিশ্বাস করে এরফলে বৃষ্টি হবে। ফলে আজকের সময়ে যখন মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তায় ভর করে প্রকৃত সত্য জানতে পারছে তেমন করে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাকে বিপন্ন বা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যা লোকায়ত মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। এই সমস্ত স্পর্শমূলক ও অনুকরণমূলক আচার-অনুষ্ঠান তৈরি হয়েছে প্রাক-বৈদিক যুগে। আর্যরা ভারতবর্ষের এসে এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান থেকে অনেক কিছু নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। এইভাবেই গড়ে উঠেছে আর্য-অনার্যের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে মিশ্রসংস্কৃতি। আমরা আগেই বলেছি এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরা থাকে লোকায়ত মানুষের বিভিন্ন চাহিদা। আজকের সময়ে বট অশ্বত্থ থেকে নানা ধরনের বৃক্ষ পূজার মধ্যে আদিবাসী, অনার্য নরনারীর পালিত আচারের স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মানুষের প্রকৃতির অন্য প্রাণকে রক্ষা ও সংরক্ষণের বিষয় ধরা আছে। প্রকৃতির যে অপার দান তাকে মনে রেখে মানুষ কৃতজ্ঞতায়, ভয় ও শ্রদ্ধাভরে তাকে বন্দনা করেছে—

> অনেক পূজায় ও ব্রতোৎসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মস্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আম্রপল্লবে ঘটের প্রয়োজন হয়, যে কলা-বৌ পূজা হয়, অনেক ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ-সমস্তই সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব ধারণা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের গাছ-পাথর পূজা, প্রজনন শক্তির পূজা, পশুপক্ষীর পূজা প্রভৃতির স্মৃতি বহন করে।[৩৮]

আমরা জানি যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ কাঠামোয় উদারতার নাম করে কীভাবে লোকায়ত মানুষের ঐতিহ্য ও তার আচার-অনুষ্ঠানকে আত্মসাৎ করে নিজের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। আর্য ও বেদ থেকে শুরু করে পুরাণ পর্যন্ত সমস্ত দেবতাদের একটি নির্দিষ্ট গড়ন আমরা লক্ষ করা যায়। এই দেবতারা প্রত্যেকেই এক একটি প্রাকৃতিক শক্তির দেবতা বা বলা ভালো সেই শক্তির নিয়ন্ত্রণকারী। মানুষ এই দেবতাদের কাছে নানা চাহিদা জানিয়েছে ও তার রাগ থেকে বাঁচতে চেয়েছে। আবার এই দেবতাদের শক্তিকে পশুর শারীরিক শক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন ইন্দ্রের শক্তি বৃষের মতো আর মরুৎগনের শক্তি বন্য হস্তির মতো এবং সে যখন গর্জন করে তা সিংহের মত শোনায়। আমরা এখানে বুঝতে পারি মানুষ তার প্রত্যক্ষ জগতের শক্তি আর তার মানসিক জগতের শক্তির আধারকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আমারা পশুবলি থেকে শুরু করে বন্য প্রানকে রক্ষা করার নানা উদ্যোগ নিতে দেখতে পাই। আমরা দেখি যে নানা ধর্মের মোড়কে ‘অহিংসা’র নাম নিয়ে জীববলি বন্ধ করা হচ্ছে। আমরা জানি যে, অহিংসাকে বৌদ্ধধর্ম থেকে শুরু করে জৈনধর্ম প্রসারিত করে। এই অরণ্যচারী মানুষরা তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান অরণ্য থেকেই আহরণ করত। আমরা জানি এই আদিবাসীদের পরিবেশ পাঠ বৈদিক সমাজ থেকে শুরু করে নাগরিক সভ্যতা থেকে ভিন্ন। তারা অরণ্যকে লালনপালন করে নানা পূজা আচার ও ঐতিহ্য সূত্র ধরেই। কিন্তু আমরা দেখি অহিংসার নাম করে এদের বনভূমি থেকে আলাদা করা হচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি কৃষিজীবী সমাজ যখন তাদের জমিকে বিস্তৃত করতে চাইল তখন অনিবার্যভাবে অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপন যাদের ছিল তারা চরম সংকটের মুখে পড়ল; এর ফলে এই সমস্ত অরণ্যচারী মানুষরা বাধা দেয় এই কৃষিজীবী মানুষদের আর এখানে একটি রাজনীতির কবলে পড়ে এই মানুষরা। অহিংসার নাম করে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ এদের পশুবলি থেকে শুরু করে পশু হত্যাকে নিষেধ করে দেয়। কিন্তু বৈদিক যাগযজ্ঞে পশুবলি প্রচলতি ছিল। আমাদের মনে হয় কেবল বন্যপ্রাণের প্রতি ও পৃথিবীর অন্য প্রাণের প্রতি মমত্বের কারণেরই এই হত্যাকে বন্ধ করা হয়নি। এর মধ্যে ধরা আছে ওই অরণ্যচারী মানুষদের জব্দ করে তাদের বাঁচার উপাদান থেকে দূরে সরিয়ে নিরাশ্রয় করে দেওয়ার কৌশল। অশোকের অনুশাসনে অহিংসার যেমন ভালো দিক আছে তেমন করে আমরা দেখতে পাই এই অনুশাসনের ফলে জাতিচ্যুত (out caste) হয়ে একা হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। মনুসংহিতার আমরা দেখতে পাই, প্রাণী হত্যা, প্রাণী

ও প্রাণীর চামড়ার ব্যবসা, মাছধরা বনজ সম্পদ লুঠ করা প্রভৃতিকে নিচু জাতের কাজ বলে চিহ্নিত করা হয়ছে। এবং একে জাতিচ্যুত কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু, এই জাতিচ্যুত কাজের ফলেই সমস্যার মধ্যে পড়ে অরন্যের অধিবাসীরা। কেননা তাদের জীবনের সবটাই নির্ভর করে অরণ্যকে কেন্দ্র করে। যারা অরণ্যের সম্পদকে লুণ্ঠন করে তাদের সম্পর্কে এই অনুশাসন যুক্তিযুক্ত। কিন্তু, এই অনুশাসনের ফলে এই অরণ্যচারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে ঘাতক হিসেবে। আর সবাই জানি এদের নানা ধর্মীয় উৎসব থেকে শুরু করে আচার অনুষ্ঠানে বলি দেওয়া একটি প্রধান অঙ্গ। তাই এদেরকে সহজেই ব্যাধ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আমরা এই সমস্যাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই বর্তমান সময় প্রেক্ষিতে, যেখানে হুল উৎসবকে চিহ্নিত করা হচ্ছে বন্য প্রাণকে নিধনের কারণ হিসেবে। আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে এই আদিবাসীদের বন্যপ্রাণী থেকে শুরু করে তার বনজ সম্পদকে নেওয়া আসলে তাকে ছিনিয়ে নেওয়া নয়। তাদের এই সম্পর্ক পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখে চলে। তাদের এই আদান-প্রদানে পরিবেশ ও প্রকৃতি বিপন্ন হয় না বরং তার বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি এদেরকেই ঘাতকে বলে চিহ্নিত করেছে। তার ফলে এই সমস্ত মানুষরা নিজের জাতিগত জীবিকা ছেড়ে দিয়ে কৃষিকাজে শ্রমিক হয়ে যায়। কিন্তু এই সবের মধ্যে আমরা বলতে পারি লোকায়ত সমাজের ঐতিহ্য লালিত প্রকৃতি পূজার মধ্যে দিয়ে আসলে তারা পরিবেশের সংরক্ষণের কথা বলে আসছে আবহমান কাল ধরে।

১.৫ রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সমাজের সমস্ত পরিসরে রবীন্দ্রনাথ মৌলিক চিন্তাভাবনার ছাপ রেখে গিয়েছেন। আজকের সময়ে যখন প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে, পরিবেশ নানাভাবে বিপন্নতার সামনাসামনি হচ্ছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, চিন্তাভাবনা ও সর্বোপরি পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ভারতের পরিবেশ চর্চার ইতিহাস বা তার ধরন-ধারণ জানতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে সেই আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। প্রকৃতিকে নিয়ে বহু বাংলা সাহিত্য লিখিত হয়ে চলেছে। এই তালিকায় বিভূতিভূষণ থেকে শুরু করে অনেকের নাম

এক লহমায় আমরা উচ্চারণ করতে পারি। কিন্তু, আমাদের আলোচনায় রবীন্দ্রসাহিত্য ও মননকে নির্বাচনের সবথেকে বড় কারণ হল, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র প্রকৃতিকেন্দ্রিক সাহিত্য লিখে থামেননি। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ নিয়ে নানা চিন্তাভাবনার ছাপ রেখেছেন তাঁর নানা প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে; যেখান থেকে ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের স্বরূপ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে প্রকৃতির বর্ণনা করেননি। তিনি মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের খতিয়ানকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃতির জয়গান যেমন করেছেন ঠিক একইভাবে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশের সমসস্ত উপাদানের সংরক্ষণের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়েই আমরা ভারতবর্ষের পরিবেশচিন্তার পারম্পর্যকে বুঝতে পারি। প্রাচীন ভারতের পরিবেশচিন্তা রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। তিনি প্রাচীন ভারতে মানুষের প্রকৃতির কোলে সভ্যতার বিকাশের কথা বলছেন। আর এই কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রাচীন ভারতের পরিবেশেচিন্তার স্তর-পরম্পরাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি একই সঙ্গে আধুনিক নগর সভ্যতার কবলে পড়ে ভারতবর্ষের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছন্নতার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন। ফলে বর্তমানে মানুষের প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তাভাবনার বিশ্বস্থ দলিল হল রবীন্দ্রসাহিত্য ও তাঁর চিন্তাভাবনা। আসলে রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই আমরা ভারতবর্ষের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের খতিয়ানকে বুঝতে পারা যায়। আবার একইভাবে বর্তমান সময়ের পরিবেশের বিপন্নতার ইতিহাসকে জানতে পারা যায়। ফলে ভারতবর্ষের পরিবেশের স্বরূপ জানার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা ও তাঁর সাহিত্যকে বাদ দিয়ে কোনো ভাবেই সম্পূর্ণ হয় না।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনায় ধরা পড়েছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অনাদিকালের সম্পর্কের কথা। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জানাশোনার ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সাহিত্য ও চিঠিতে তাঁর সঙ্গে এই পৃথিবী, প্রকৃতির অনাদি কালের সম্পর্কের কথা বলেছেন—

> এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কতো দূরদূরান্তর দেশদেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্যালোকের আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত বৃহৎভাবে

> সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছে শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।[৩৯]

রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মূল কথা এই পত্রের মধ্যে ধরা আছে। আসলে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক করে দেখেছেন। নিজেকে তাই প্রকৃতির সমস্ত উপাদানের সঙ্গে এক করে দেখতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার খতিয়ান তাঁর জীবনী সাহিত্য থেকে জানতে পারব। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা ও শৈশবে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের ইতিহাস জানা যায় *'জীবনস্মৃতি'* (১৯১২) ও *'ছেলেবেলা'* (১৯৪০) নামে দুইটি গ্রন্থে। শৈশবের দিনগুলিতে যখন তাঁকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, শৈশবে রবীন্দ্রনাথের মন সেই বন্দী অবস্থাকে কোনভাবেই মানতে পারেনি। বদ্ধতার ঘেরাটোপকে পেরিয়ে তাঁর মন বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'তে এই বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মিলতে না পারার যন্ত্রনার কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। *'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'* প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বন্দী অবস্থার মাঝেও প্রকৃতির সান্নিধ্য কেমন করে লাভ করেছেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন—

> কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তবুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে সকাল-সন্ধ্যার ছায়া এপার- ওপার করত- হাঁসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত জলে ডুব দিয়ে, আষাঢ়ের জলে নীলবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সার বাঁধা নারকেলগাছের মাথার উপরে ঘনিয়ে আনত বর্ষার গম্ভীর সমারোহ।[৪০]

রুদ্ধদ্বারের মধ্যে আবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের মনে বাইরের প্রকৃতির যেটুকু প্রকাশ তার কাছে ধরা দিচ্ছিল তাতেই কিশোর মনের কাছে অনেক। আমরা 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় পাতায় রবীন্দ্রনাথের বদ্ধদশা এবং বাইরের উন্মুক্ত প্রকৃতির ডাক এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও এই বদ্ধদশা ভেঙে উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার আহ্বান বারবার করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের মনে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি কেবলমাত্র সৌন্দর্য নিয়েই হাজির হয়নি, পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের সময়ে প্রকৃতি তাঁর মনে কেবলমাত্র রোমান্টিকতায় ভর করে হাজির হয়নি। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-চেতনার বিস্তার

লাভ করেছে। এবং এই বিষয় যেমন সত্য তেমন করে পিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকৃতি তাঁর কাছে কেবল মনোমুগ্ধকর পরিসর হিসেবেই থাকেনি। ব্রাহ্মধর্মের উপাসক দেবেন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি ঔপনিষদিক চেতনার মাধ্যমে ধরা দিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের এই প্রকৃতিভাবনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ ও পুরাণের মধ্যে ভারতের যে প্রকৃতি স্বরূপ ধরা আছে, সেই ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে কৌশোরে। আসলে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্পর্কে ধরনাকে ঠিক করে দিয়েছিল তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের ফলে প্রকৃতির কাছাকাছি যেমন তিনি আসতে পেরেছিল তেমন করে উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে জীবনকে নতুন করে ভাবতে শিখেছিল-

> শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই।[৪১]

পিতার সঙ্গে হিমালয়ে ঘুরতে যাওয়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রকৃতির বিশালতা, তার গম্ভীরতা এই সব কিছু মনে গভীর ছায়াপাত করে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকে প্রকৃতির থেকে দূরে থাকার যন্ত্রনা যেমন অনুভব করেছেন ঠিক তেমন করে প্রকৃতির অপার সান্নিধ্যে এসে তাঁর বালক মনে প্রকৃতির আসন পাকা স্থান করে নিয়েছে। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে সময় অতিবাহিত কালেই রবীন্দ্রমননে প্রকৃতির অভিসার শুরু হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারেন—

> আমার মনে পড়ে সকালবেলায় সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়।... ভগবতগীতা গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু কপি করে দিতুম তাঁকে।...সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেম-এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল শ্রেণির সমুচ্চশাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।[৪২]

কলকাতাতে বসবাসকালে যে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি ছিল অপর হিসেবে, সেই প্রকৃতি বাবার সঙ্গে ভ্রমণের সময়ে একান্ত আপন হিসেবে ধরা দিল। এই পর্বের রবীন্দ্র-প্রকৃতি-চেতনায় ভারতীয় ঐতিহ্য

দ্বারা লালিত প্রকৃতি বিস্তার লাভ করেছে, যেখানে বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের প্রকৃতিভাবনা তাঁর কাছে হাজির হয়েছে। ছেলেবেলায় প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিসর্গনীতির দ্বারা ধরা দিয়েছে। প্রকৃতির যে সৌন্দর্য তাতেই কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন ভরে ছিল। সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনা রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতি চেতনায় কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতির যে আসল রূপ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নিবিড়তা জানতে রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতে হয়েছে জমিদারী কাজে নিজেকে যুক্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত। কলকাতাতে থাকার সময় তিনি দেখেছেন মানুষ প্রকৃতি থেকে কীভাবে নিজেদের সরিয়ে রাখছেন। জমিদারীর কাজে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় তিনি দেখেছেন প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের চিত্রকে। প্রকৃতি ও মানুষের যৌথ জীবনযাপনের চিত্র দেখে রবীন্দ্রনাথের গ্রাম বাংলার পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশভাবনা তৈরিতে গ্রাম বাংলার লোকায়ত মানুষের প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই পরিবেশভাবনা পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের নানা কর্মসূচিতে প্রকাশ হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে জমিদারের কাজের জন্য বাংলার লোকায়ত পরিবেশভাবনা ও মানুষের প্রকৃতির কোলেই বেড়ে ওঠার চিত্রকে তিনি ছিন্নপত্রাবলীর প্রতিটি পাতায় বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কর্মজগতে ও শান্তিনিকেতনে তাঁর পরিবেচিন্তায় এই বাংলাদেশের পরিবেশ কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জমিদারের কাজে প্রত্যক্ষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার ফলেই শান্তিনিকেতনে মানবমুখি পরিবেশ পরিকল্পনা করতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশভাবনা গড়ে উঠতে বিদেশ ভ্রমণ সমানভাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিদেশ ভ্রমণের সময়ে সেখানকার প্রকৃতির সঙ্গে বা সেখানকার মানুষের পরিবেশ ভাবনাকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও বিদেশের প্রকৃতি চেতনার মূলগত প্রভেদকে। আমেরিকার মানুষের প্রকৃতি চেতনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

> অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয়নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে, আপনার সঙ্গে যুক্ত করেনি, তেমন অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে- তাঁর সঙ্গে মিলিত করে নেয়নি। নগর-নগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।[৪৩]

পাশ্চাত্যের মানুষের প্রকৃতি থেকে দূরে চলে যাওয়া এবং কংক্রিটের জঙ্গলে জীবনের সার্থকতাকে খোঁজার মানসিকতাকে রবীন্দ্রনাথ মানতে পারেনি। প্রকৃতি থেকে মানুষের এই দূরে সরে যাওয়াকে আসলে মানুষ নিজেকেই সবার উপরে স্থান দিচ্ছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় ভারতবর্ষের তপোবনকেন্দ্রিক, অরণ্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবন অতিবাহিত হওয়াকেই আদর্শ বলে মনে করেছেন। আর এই ভাবনার নিদর্শন দেখা যায় শান্তনিকেতনের পরিবেশভাবনার মধ্যে। বিদেশ ভ্রমণের কারণেই তিনি দেখতে পেয়েছেন মানুষ কীভাবে সবুজের অভিযানকে রোধ করছে। বিদেশে প্রকৃতির সবুজকে ধ্বংস করে শিল্পের যে উৎসব চলছে তাতে পরিবেশের চরম ক্ষতি বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করছেন। বিদেশ ভ্রমণের জন্যই রবীন্দ্রনাথ বেশি করে ভারতীয় ঐতিহ্য লালিত পরিবেশ সম্পর্কে বেশি শ্রদ্ধাশীল ও তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মন করে চলে যেতে চেয়েছে কালিদাসের কালে; যেখানে প্রাচীন ভারতে প্রকৃতির কোলে, গ্রামীন সমাজ নিরাপদ জীবনযাপন করেছে। প্রাচীন ভারতের মাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে জীবনপ্রবাহ তাকেই রবীন্দ্রনাথ বারবার করে ফিরে পেতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই বারবার নিজেকে মৃত্তিকার সন্তান বলেছেন, বারবার করে আশ্রয় পেতে চেয়েছেন এই বিশাল ধরিত্রীর বুকের কাছে। মাটিকে মা বলে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

> যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে।[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ এই ধাত্রীদেবতার কাছে মাথা নত করে জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছেন। তিনি এই পৃথিবী মাতার সমস্ত উপাদানকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। প্রকৃতির উপাদান তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবলমাত্র ভোজনের সামগ্রী নয়, উৎসবের সামগ্রী। গাছের ফল রবীন্দ্র মানসিকতায় কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নয়। এই ফলের রং, রস রবীন্দ্র চেতনায় অন্য অর্থ বহন করে। প্রকৃতির নানা উপাদান কেবলমাত্র আমাদের জৈবিক চাহিদা মেটাবার জন্য নয়। প্রকৃতির এই সমস্ত উপাদানকে নেওয়ার মধ্যে সহাবস্থানের যে সম্পর্ক আছে তা টিকিয়ে রাখার কথা রবীন্দ্র-চেতনায় তথা রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ চেতনায় বারবার করে বলা হয়েছে।

আজকের সময়ে যখন সভ্যতার উন্নতির জন্য চারপাশের পরিবেশের শৃঙ্খলাকে ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আট্টালিকার দম্ভ যখন আকাশকে ঢেকে দেওয়ার স্পর্ধা দেখাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতের চিরকালীন পরিবেশের ঐতিহ্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার আয়োজন করছে। প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারকে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধ, চিঠিতে বারবার সমালোচনা করেছেন ও আজকের পরিবেশ বিপন্নতার জন্য রবীন্দ্রনাথ মানুষের সর্বগ্রাসী, ভোগকেন্দ্রিক ক্ষুধাকেই দায়ী করছেন। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক, অতীতচারী মন ফিরে যেতে চেয়েছে কালীদাসের কালে যেখানে গ্রামকে ঘিরে থাকে সবুজের আস্তরণ। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনযাপনের আদর্শ স্থাপনের জন্য শান্তিনিকেতনে নানা পরিকল্পনা করেন যেখানে মানুষ প্রকৃতির মাঝেই জীবনের যাবতীয় শিক্ষা অর্জন করবে। রবীন্দ্রনাথ *'হলকর্ষণ'* থেকে অরণ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন। এই সমস্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের জীবনে প্রকৃতির অবদান ও মানুষের প্রকৃতিকেন্দ্রিক মানসিকতার সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব নিতে বলেছেন—

> মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হয়েছে; তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারদিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন- মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে।[৪৫]

মানুষের এই লোভের জন্য পৃথিবী থেকে প্রাণের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ পরিবেশের সমস্ত প্রাণকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। পরিবেশের সমস্যা হয় তখনই যখন পরিবেশের উপাদানগুলি নিজের যে অবস্থান তাকে লঙ্ঘন করে মানুষ নিজের অধিকার স্থাপন করতে চায়। মানুষ ছাড়া প্রকৃতির কোনো উপাদান এই অধিকার লঙ্ঘনের কথা বলে না। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির পাঠশালা থেকে শিখেছেন প্রকৃতির সমস্ত প্রাণের যৌথ অবস্থানের শৃঙ্খলাকে। শিলাইদহে ভ্রমণের সময় তিনি মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মীয়তার সম্পর্ককে সামনে থেকে দেখেছেন। প্রকৃতির সমস্ত প্রাণের এই সহজ সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর সৌন্দর্যের মূল কথা ধরা আছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি মানুষের সহজ-সরল জীবনযাপনের মধ্যেই প্রকৃতির প্রাণের বিকাশ ও তার সৌন্দর্য তাকে উপলব্ধি করেছেন—

> আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্র, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে, এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবী ভারী ভালোবাসি।[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ তাই বারবার এই পৃথিবীর কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন। এই পৃথিবী সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আত্মীয়তার টান অনুভব করেছেন। পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ককে তিনি কেবলমাত্র সাময়িক বলে মনে করেননি এই সম্পর্কের ইতিহাস যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে বলে তিনি মনে করেন। পৃথিবীর সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলবেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের সঙ্গে যে চেনাজানা তা আজন্মকালের বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর গভীর জানাশোনার কথা বলেন। মূক পৃথিবীর মধ্যে যে অজস্র কথার ভীড় আছে তা প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কান পেতে শুনতে পান। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনায় এই পৃথিবীর অজানাকে জানতে পারা ও প্রকৃতির গানকে শুনতে চাওয়ার ব্যাকুল বাসনা দেখা যায়। আমরা যদিও বললাম যে, এই পৃথিবীকে রবীন্দ্রনাথ মূক বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে এই পৃথিবী সজীব প্রাণ হিসেবেই হাজির হয়। পৃথিবীর জড়ের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ প্রাণের প্রকাশকে দেখতে পেয়েছেন। রবীন্দ্র চেতনার রঙে প্রকৃতির সমস্ত উপাদান রঙীন হয়ে ওঠে। প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাই জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে অনন্ত প্রাণের প্রকাশকে দেখেছেন। জৈনধর্মে যে 'সর্বপ্রানবাদ' তার ঐতিহ্য রবীন্দ্র মনন ও সাহিত্যে দেখা যায়। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণের সময় ও ঠাকুরবাড়ির উপনিষদের আবহাওয়ায় বড় হয়ে ওঠার ফলে রবীন্দ্র মননে পৃথিবী 'ধরিত্রী মাতা' হিসেবে কল্পিত হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে এই ভাবনার বিস্তারিত রূপ আমরা দেখতে পাই শান্তিনিকেতনের নানা পরিবেশকেন্দ্রিক কাজের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ চেতনায় মানুষ একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রকৃতির সমস্ত প্রাণ যেমন করে একে অপরের সাহায্যে নিজেদের অবস্থানকে অটুট ও সহজ সুন্দর করে রাখছে তেমন করেই মানুষও প্রকৃতি থেকে সেই শিক্ষা নিয়ে চারপাশের পরিবেশকে সুন্দর করে তোলার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন। রবীন্দ্রনাথ বারবার করে মরুবিজয়ের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ মরুভূমির বন্ধ্যাদশা কাটিয়ে সেখানে সবুজের বান বইয়ে দেওয়ার কথা বলেন । রবীন্দ্রনাথের হলকর্ষণ অনুষ্ঠান এই চিন্তাভাবনার ফল হিসেবে ধরা হয়। যেখানে তিনি পৃথিবী মাতাকে হলকর্ষণের মাধ্যমে

শস্যবতী করে তোলার কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কোন উপাদানকে জোর করে কেড়ে নেওয়ার বিরোধিতা করেছেন। এই নেওয়া যেন এক তরফা না হয়। আমরা যেমন করে ধরিত্রী মায়ের থেকে উপাদানকে নিচ্ছি তেমন করে আমাদের মৌলিক কর্তব্য হল ধরিত্রী বা পৃথিবীকে কিছু ফিরিয়ে দিয়ে তার উপাদানের ভারসাম্যকে বজায় রাখা। আসলে রবীন্দ্রনাথ পরিবেশের সমস্ত উপাদানের মধ্যে যে পারস্পরিক সহাবস্থানের ইতিহাস আছে তার উপর জোর দিতে চাইছেন। তাই তিনি বলেন—

> হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্যের পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণির প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন।[৪৭]

এই ফিরিয়ে দেওয়ার মানসিকতার জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আয়োজন করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি *'বর্ষা উৎসব'* এবং ১৯০৭ সালে পুত্র শমীন্দ্রনাথের উদ্যোগে *'ঋতু উৎসব'* পালন করেন। এই সমস্ত উৎসবের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবেশচিন্তার কথা বলেন। এছাড়া এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সময়ে মানুষের পরিবেশের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তারের অহংকারকে সমালোচনা করে ভারতবর্ষের তপোবনকেন্দ্রিক জীবনযাপনের কথা বলেন; যেখানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লগ্ন হয়ে জীবন অতিবাহিত করত। রবীন্দ্রনাথের *'পল্লীপ্রকৃতি'* (১৩৬৮) প্রবন্ধে পরিবেশচিন্তার মূল কথা ধরা আছে। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশে সংরক্ষণের কথা বলে গিয়েছেন। পরিবেশ সংরক্ষণ চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাইতে বৃক্ষরোপণ উৎসবের মধ্যে। এবং ১৫ জুলাই শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ হলকর্ষণ উৎসব পালন করেন। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি পরিবেশ বিপন্নতার সমাধানের কথা বলেন। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী প্রকৃতি পাঠের ইতিহাসকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথের এই পরিবেশ চেতনায় পিতার সঙ্গে ভ্রমণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহলে ঔপনিষদিক ভাবধারায় প্রবাহিত প্রকৃতি চেতনাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এরপর জমিদারের কাজে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণের সময়ে এই প্রকৃতিপাঠ অন্য মাত্রা লাভ করে। এই জমিদারী কাজে ভ্রমণের সময়ে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের ইতিহাসকে বুঝতে পারেন। বাংলার গ্রমীন পরিবেশে লোকায়ত মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির

নিবিড় সম্পর্কের ইতিহাসকে তিনি পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত করবেন। রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রা তাঁর প্রকৃতি চেতনাকে আরও মজবুত করে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শন ও যন্ত্র সভ্যতার বিস্তার সেখানকার পরিবেশ বিপন্নতার প্রধান কারণ বলে তিনি মনে করেন। পাশ্চাত্যের পরিবেশ চিন্তার ধরন-ধারণকে পাঠের মধ্য দিয়েই তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনযাপনের কাছে ফিরে আসেন। শান্তিনিকেতনে তপোবনকেন্দ্রিক জীবনকে ফিরিয়ে আনতে চাওয়া আসলে রবীন্দ্রনাথের এই যন্ত্রসভ্যতার থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের সহজ-সরল জীবনকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ নানা সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে যেমন পরিবেশ রক্ষার কথা উচ্চারণ করেছেন। একইসঙ্গে তিনি সাহিত্যের বিরাট পরিসরে এই পরিবেশ চেতনাকে বিস্তারের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় বারবার করে ফিরে এসেছে প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা ভারতবর্ষীয় সভ্যতার কথা। এবং একইসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে যন্ত্র সভ্যতার বেড়া ভেঙে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের মাঝে ফিরে যাওয়ার কথা। ফলে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের প্রকৃতি চেতনার মূল স্বরূপকে পাওয়া যায়। মানুষ ও প্রকৃতির যে অনাদি কালের সম্পর্ক, সেই ইতিহাসকে তিনি ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন। আজকের সময়ে পরিবেশ বিপন্নতার যুগে তাই রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে।

১.৬ আধুনিক কালের কয়েকটি পরিবেশ আন্দোলন

বেদের মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্পর্কের খতিয়ান তা পরবর্তী সময়ে বদলে যায়। এই বদলে যাওয়া প্রকৃতিপাঠ ও মানসিকতার জন্য পরিবেশের বিপন্নতার সূত্রপাত। সময়ের ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ও উৎপাদনের ধরন-ধারণ বদলের জন্য এই পরিবেশ বিপন্নতা আরও বড় আকার ধারণ করে। বেদ-পুরাণের সময়ে পরিবেশের শৃঙ্খলা যে একদম অটুট ছিলও তা বলা যায় না। কিন্তু সেই সমস্যা আজকের সময়ের মতো বিরাট আকার ধারণ করেনি। বর্তমানে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজের মুনাফার জন্য অবাধে লুট করে চলেছে আর এর কারণে ভারত তথা বিশ্ব পরিবেশ প্রতি মুহূর্তে হুশিয়ারি দিচ্ছে। এই পরিবেশ বিপন্নতার সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষ পরিবেশ রক্ষার জন্য নানা

আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ভারতবর্ষের বুকে সংগঠিত কয়েকটি পরিবেশ রক্ষার জন্য আন্দোলনের রূপরেখা জানা জরুরি হয়ে পড়ে।

পরিবেশ সচেতনতা এবং পরিবেশকে সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা প্রাচীন ভারতে নানা চিন্তাভাবনা দেখতে পাই। এই পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সব থেকে এগিয়ে বিশনয়ি সম্প্রদায়ের মানুষরা। বিষ্ণুর উপাসক এই সম্প্রদায় নিজেদের জীবনযাপনের যে কষ্ট সেই কষ্টের মধ্য দিয়ে শিখেছে পরিবেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা। এরা যে অঞ্চলে বাস করত সেখানে যখন প্রকৃতির দিগন্ত জুড়ে বিস্তার ছিল মানুষ সেই প্রকৃতিকে অবাধে লুট করেছে। এর ফল হিসেবে এখানে পরিবেশের ভারসাম্য টাল খেয়ে পড়ে ও খরা থেকে শুরু করে এখানকার সমস্ত প্রাণ প্রকৃতির নানা উপাদানের অভাবে মারা যাচ্ছিল। এই যে প্রকৃতির যথেচ্ছ ব্যবহার ও তার ফল হিসেবে তাদের বাসস্থান মরুভূমিতে পর্যবসিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যাচ্ছিল। এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য তারা প্রকৃতি ও তাদের চারপাশের পরিবেশকে রক্ষা করার মানসিকতা গড়ে তোলে। এই পরিবেশ রক্ষার জন্য মানসিকতা বা ভারতে প্রথম পরিবেশ রক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল যে বিশনয়ি সম্প্রদায়, সেই বিশনয়ি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জাম্বজি বা জাম্বেশ্বর ভগবান ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম রাজস্থানে জন্মগ্রহন করেন। তিনি প্রচার করেন প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের প্রয়োজনের জন্য নেওয়া যেতে পারে কিন্তু তাকে লুণ্ঠন করা কোনভাবেই উচিৎ নয়। বিশনয়িদের পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে যে সমস্ত নিয়ম পালন করার কথা বলা হয়েছে তার ক্রমতালিকা হল—

> ১। হিন্দু হিসেবে বিশনয়িরা বিষ্ণুর উপাসনা করেন। কিন্তু মৃতদেহ করব দেন। উদ্দেশ্য পঞ্চভূতের এই দেহ ভূত(ক্ষিতি বা ভূমি)-তে ফিরিয়ে আনা। ২। বিশনয়ি ছুতোর বা সূত্রধরেরা কখনই সজীব গাছ কাটেন না। তারা ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেন। গাছটির মৃত্যু হলে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড় ইত্যাদিতে গাছটি পতিত হলে একমাত্র তখনই সেই গাছটি তারা ব্যবহার করেন। ...৪। যদিও অনেক সময়েই মাঠের ফসল চিঙ্কারা কৃষ্ণসার ইত্যাদি হরিণেরা খেয়ে ফেলে তবুও সেইসব পশুদের ক্ষেত থেকে কেউ বিতাড়িত করেন না। ৫। কোন গাছ বা পশুকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া বিশনয়িদের কাছে পরম গর্বের।[৪৮]

এই সম্প্রদায় বৃক্ষ তথা পরিবেশের সমস্ত উপাদানকে পরম যত্নে লালন পালন করে। পরিবেশকে রক্ষার জন্য পরবর্তী সময়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে। এই পরিবেশকেন্দ্রিক আন্দোনের জন্য অনেকের প্রাণ প্রর্যন্ত গিয়েছে। এই যে পরিবেশ রক্ষার জন্য আন্দোলন তার হাতেখড়ি এই বিশণয়িরাই প্রথমে

শিখিয়েছে বলে মনে করা হয়। গাছ ও পশুদের জন্য আত্মদানের কাহিনি শোনা যায় ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে অমৃতাদেবীর গাছ রক্ষার জন্য প্রাণ দেওয়া। যোধপুরের রাজা অভয় সিংহের বাড়ির মেরামতির জন্য খেজরালি গ্রামে গাছ কাটতে যায়। অমৃতাদেবী এই গাছ কাটার প্রতিবাদ করেন। এরপর তারা গাছ কাটার প্রতিবাদ করে নিজেদের প্রাণ দেয়। এরপর থেকে এই আন্দোলন পাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এবং এই পরিবেশ আন্দোলনের জয় হয়। আসলে এই ধর্ম-সম্প্রদায় পরিবেশের সমস্ত প্রাণকে রক্ষা করেছে ও তাতে ধর্মীয় ভাবাবেগ জড়িয়ে আছে। এই ধর্মের একটি বড়ো দিক হল যে, এই ধর্মের গুরু কৃষ্ণসার হরিণকে মারতে বারণ করেছে কেননা এই হরিণরা হল এই ধর্মগুরুর অবতার। পৃথবীতে কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়কে প্রকৃতির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে দেখা যায়নি। এই দিক থেকে বিশনয়িদের এই আন্দোলন আজকের সময়ে পরিবেশবাদী আন্দোলনে অন্য মাত্রা যোগ করে। আসলে এই বিশনয়িদের ধর্মে প্রকৃতির বড় ভূমিকা গ্রহণের কারণ হল এদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এককালে যখন এরা প্রকৃতির কোলে লালনপালন হয়েছে তখন এরা বুঝতেই পারেনি প্রকৃতির অবদানকে। তাই এরা নির্বিচারে প্রকৃতিকে নিধন করেছে। যখন সেই সবুজ গ্রামে খরা ও অনাবৃষ্টির কবলে পড়ল তখন তারা সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে এই সম্প্রদায়ের প্রকৃতিকে পুজো ও তাকে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে নিজের জীবন থেকে উঠে আসা অভিজ্ঞতার ফল হিসেবেই ধরা হয়। আর এদের প্রকৃতির জন্য জীবন উৎসর্গ ধর্মকেন্দ্রিক প্রকৃতি পুজোকে অন্য মাত্রা দান করে।

পরিবেশ রক্ষার জন্য আদিবাসী সমাজের লড়াই ইতিহাসের পাতায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এই আদিবাসীদের অরণ্যকে রক্ষার জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত মানুষের পরিবেশভাবনা প্রকাশিত হয়। আদিবাসী সমাজের সঙ্গে অরণ্য তথা প্রকৃতির সম্পর্ক নিবিড় তা তাদের পালিত আচার-সংস্কৃতিকে পাঠ করলে বোঝা যায়। এই অরণ্যের সন্তানদের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে অরণ্য থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা হয়েছে। ফলে সঙ্গত কারণেই এদের সমবেত আন্দোলন তৈরি হয়েছে। অরণ্যকে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী সমাজ নিজের মায়ের মতো করে ভালোবাসে ও তাকে রক্ষা করে। এই সমস্ত জনজাতিদের প্রকৃতিকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা ও তাকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলন আজকের সময়ে তাই খুবই প্রাসঙ্গিক। এক সময়ে ছোটনাগপুর অঞ্চল গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। কোল জাতি এই অরণ্যকেন্দ্রিক পরিবেশে বসবাস করতে থাকে। আমরা জানি

এই কোল জাতির প্রধানকে বলা হয় মুণ্ডা। এই মুণ্ডাদের গ্রাম ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হল ‘সারানা’। যেখানে মুণ্ডারা বাস করত, সেই গ্রামের চতুঃসীমায় আদিম অরণ্যের কয়েকটি পুরাতন বৃক্ষকে তারা রক্ষা করত। এই বৃক্ষকে তারা ‘সারানা’ বলত। এরা মনে করে এই বৃক্ষে তাদের দেবতা বাস করে ও তাদের গ্রাম পাহারা দেয়। এইজন্য এরা এই বৃক্ষকে পুজো করে ও বলি দেয়। অরণ্যের কোলে এদের গ্রাম-ব্যবস্থা ও অরণ্যকে কেন্দ্র করে জীবনযাপনে কোনো সমস্যা ছিল না। অরণ্যকেন্দ্রিক এই মুণ্ডাদের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রকৃতি বড় ভূমিকা পালন করে। এদের খাদ্য, বাসস্থান থেকে শুরু করে জীবনের নানা প্রয়োজন এরা অরণ্য থেকে সংগ্রহ করেছে। কিন্তু প্রকৃতির থেকে উপাদান নেওয়ার মধ্যে কোন প্রভুত্বকামী মানসিকতা কাজ করেনি। এদের আজন্ম কালের সংস্কারের মধ্যেই ধরা আছে প্রকৃতি মায়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নেওয়ার মধ্যে প্রকৃতিকে উপদ্রব না করা। এই আদিম ভারতের অরণ্যের সন্তানদেরকে কিছু বাইরের মানুষ মুনাফার জন্য অরণ্য থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে; তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে বাইরের শক্তির সঙ্গে অরণ্যের সন্তানের সংগ্রাম। এই মুণ্ডাদের প্রকৃতির থেকে উচ্ছেদের ইতিহাস ও কারণ মহাশ্বেতা দেবী আমাদের জানাচ্ছেন–

> ছোটনাগপুরের অন্তর্গত সিংভূম, রাঁচি, পালামৌ এসব জেলায় মুণ্ডা, ওরাঁও, হো আদিবাসীদের বসতি ছিল। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ ১৭৫০-১৮০০ সালের সময়ে এখানে বাইরের জমিলোভী মানুষজন ঢুকে পড়ে। এর ফলে আদিবাসীদের চাষবাস ও গ্রাম-সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়তে লাগল। জঙ্গল হাসিল করে তারা যে খুঁটকাট্টি গ্রাম পত্তন করেছিল, তা আর তাদের রইল না।[৪৯]

আমরা দেখতে পাই যে জমি বা অরণ্য ছিল মুণ্ডাদের নিজস্ব অধিকার বাইরের জোতদার থেকে শুরু করে ইংরেজদের হাত ধরে তাদের সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ইংরেজরা জমিদারদের কাজে লাগিয়ে এদের বন থেকে তাড়িয়েছে আবার খ্রিষ্টান মিশনারিরাও এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই আদিবাসীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। যে বিশাল অরণ্যের পরিসরে এই সমস্ত জাতি স্বচ্ছন্দে বাস করত। এই বাইরের ‘দিকু’দের হাতে এদের যাবতীয় স্বাধীনতা হারিয়ে আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করে। এই প্রেক্ষিতে অরণ্যের সন্তান বিরসার আন্দোলন। যেখানে বিরসা আন্দোলন করছে বাইরের শত্রুদের হাত থেকে অরণ্য জননীকে মুক্ত করার জন্য। আসলে এই বিরসা মুণ্ডার মতো আদিবাসীরা মনে করে অরণ্য তাদের অধিকার। এই অধিকার মা আর সন্তানের মধ্যে যে সম্পর্কের অধিকার সেই রকম অধিকারের কথা এখানে বলা হচ্ছে–

> অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ-ভারতের আদি অধিকার। যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে ঘুমোচ্ছিল, তখন থেকেই কৃষ্ণ- ভারতের কালো মানুষেরা জঙ্গলকে মা বলে জানে।[৫০]

এই অধিকারের বোধ নিয়েই বিরসা মুণ্ডা 'উলগুলান'-এর ডাক দিয়েছিল। অরণ্যের এই আদিবাসীরা দেখতে পাচ্ছিল কীভাবে তাদের অরণ্য জননীকে প্রতিদিন বাইরের লোকের হাতে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছিল। বাইরের মানুষ নিজেদের মুনাফার লোভে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বসবাসকারী আদিবাসীদের সুস্থির ভীতকে টলিয়ে দিয়ে মজুর, শ্রমিকে পরিণত করেছিল; আবার তেমন করে প্রকৃতির সম্পদকে নির্বিচারে লুণ্ঠন করছিল। বিরসা মুণ্ডা এই সত্যি উপলব্ধি করেছিল বলে বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল। ইতিহাসের এই সত্যকে মহাশ্বেতা দেবী বর্ণনা করেছেন তাঁর *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসে। ইতিহাসের সত্য থেকে উপন্যাসের সত্যের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মূলের তেমন কোনো হেরফের হয় না। উপন্যাসে অরণ্যের অধিকার প্রসঙ্গে বীরসা মুণ্ডা বলছেন—

> জঙ্গল তো সকল মুণ্ডার মা! কিন্তু বিরসা বুঝতে পারছিল ওর অরণ্যজননী কাঁদছে। অরণ্য ধর্ষিতা, দিকুদের হাতে, আইনের হাতে বন্দিনি। জননী অরণ্য বলেছিল, 'মোরে বাঁচা বিরসা। আমি শুদ্ধ শুচি নিষ্কলঙ্ক হব।[৫১]

এই উপলব্ধি কেবলমাত্র বিরসার নয়, এই উপলব্ধি সব আদিবাসী সমাজের। আদিবাসী রক্তের মধ্যে এই আদি অরণ্য জননীর অবস্থান। তাই বিরসার এই আন্দোলন অরণ্যকে লুণ্ঠনকারী, প্রকৃতিকে মুনাফার চোখে দেখা মানুষদের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী সমাজ তাদের অতীত ঐতিহ্যে ফিরে যেতে চাইছিল যেখানে অরণ্য তাদের মায়ের সমান। ফলে আদিবাসীদের অরণ্যের প্রতি নির্ভরতা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে আসে আবার আমরা দেখতে পাই অরণ্যের প্রতি এদের আন্তরিক টান। আসলে আদিবাসীদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের পরিসর থেকে শুরু করে তাদের খাদ্য বাসস্থান সবটাই নির্ভর করে অরণ্য মায়ের উপর। এই নির্ভরতার কথা উপন্যাসে ধরা পড়েছে—

> হা তুমি মোর মা বট, সকল মুণ্ডার মা বট তুমি, তোমা হতে ঘরের চাল, ঘরের দেওয়াল, ক্ষুধায় কন্দ-ফল-মূল-খরাবরা-শজারু-হরিণ পাখির মাংস মাগো।[৫২]

এই যে অরণ্যের থেকে এই সমস্ত মানুষরা নিজেদের জীবনযাপনের মৌলিক চাহিদাগুলি বংশ পরম্পরায় নিয়ে চলেছে; এই নেওয়ার মধ্যে কোথাও এদের লুণ্ঠনকারী মানসিকতা কাজ করে না। যখন বাইরের মুনাফাকামী মানুষ এসে এই অরণ্য তথা প্রকৃতিক লুঠ করতে চায় তখন এদের সঙ্গে

শুরু হয় আন্দোলন। বিরসা মুণ্ডাদের এই আন্দোলন তাই অরণ্যের পরিবেশকে বিপন্নকারী, লুণ্ঠনকারী মানুষদের সঙ্গে। আর এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে ফিরে যেতে চায় যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের আত্মিক সম্পর্ক।

চিপকো আন্দোলন শুরু হয় ১৯৭৩ সালে এবং এর ১৯৮০ সালে শেষ হয়ে গিয়ে একটি মিথে পরিণত হয়। চিপকো আন্দোলন পরিবেশ রক্ষার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ে সূচনা করে। নারীর সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্পর্ক এই আন্দোলন আবার নতুন করে সেই ঐতিহ্যকে আমাদের সামনে এসে হাজির করে। এই আন্দোলনে বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে নারীর যে প্রতিবাদ তার মধ্য দিয়ে আসলে বলতে চায় যে, বৃক্ষকে কাটা মানে নারীর জীবন্ত অস্তিত্বকে লোপাট করার সামিল। গাড়োয়াল পাহাড়ীরা মেয়েরা অরণ্যের সম্পদকে বাইরের মুনাফাকামী ফড়েদার থেকে রক্ষা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই আন্দোলনের মৌলিক প্রশ্ন হল অরণ্য কী দেয়? উত্তরে বলা হয় অরণ্য জল, মাটি আর নির্মল বাতাস দেয়। আর এই সমস্তের সমবায়ে বেঁচে থাকে বন্যপ্রাণ থেকে মানুষের যাবতীয় অস্তিত্ব। চিপকো আন্দোলনে নারীর অবস্থানটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। হিমালয়ের কোলে নারীরা যেমন করে বন-জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে, ঝরণার জল ধরে তাদের সহজ জীবন অতিবাহিত করে, সেটাই হয়ে ওঠে পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে চলা জীবনের ধরণ বা দৃষ্টান্ত। কিন্তু চিপকো আন্দোলন প্রথমপর্বে হিমালয়ে বাইরের ফড়েদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও স্থানীয় মানুষদের জীবনযাপনের মান্নোয়নের জন্য শুরু হলেও এই আন্দোলন যত গড়িয়েছে তার মূল বিষয় থেকে খানিক সরে গিয়ে মূলত হিমালয়ের পরিবেশ রক্ষা করাই মূল বিষয় হিসেবে হাজির হয়েছে। এবং এই আন্দোলন কেবল ওখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এই আন্দোলন আর্ন্তজাতিক পরিচয় লাভ করতে সুবিধা হয়েছে। চিপকো আন্দোলনের রূপরেখা সম্পর্কে ভারত সরকারের জাতীয় অরণ্যনীতিতে ১৯৮৫-তে বলা হয়েছে—

> যদিও ১৯৭৩-এর চিপকো অন্দোলনের প্রধান দাবী ছিল জঙ্গলের সম্পদ আরোহণে ঠিকাদারি প্রথা বাতিল, এবং স্থানীয় অরণ্য- নির্ভর শিল্পে কম দামে কাঁচা মাল বণ্টন-কিন্তু পরে এই অন্দোলনের লক্ষ্যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। সাময়িক স্বার্থভিত্তিক অর্থনীতি(short-term explotative economoy) থেকে এটি উন্নত হয়েছে চিরস্থায়ী অর্থনীতির(permanent economy) পরিবেশ আন্দোলনে। এই আন্দোলনে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে গৃহিত করবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যা বলে যে অরণ্যের মূল অবদান হচ্ছে অক্সিজেন, জল ও মাটি।[৫৩]

এই চিপকো আন্দোলনের যে অভিমুখ বদল, তার ফলে যেটা হয়েছে ওখানকার সাধারণ মানুষ জঙ্গলে সরাসরি প্রবেশের যে ছাড় পেত সেই অধিকার হারাতে হয়। এবং না হারালেও তাদের সরাসরি যোগাযোগ নষ্ট হয়েছে। কেননা এই আন্দোলনের ফলে এই জল-জঙ্গল নিয়ে সরকার বেশি করে সচেতন হয়। ফলে বনের সংরক্ষণ থেকে শুরু করে বনের যে সম্পদ ওখানকার মানুষ পেত তাদের সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এখানকার পরিবেশে মানুষের যে অবদান বা তার রক্ষার বিষয়ে মানুষ যে সচেতন ছিল তা সরকারি নানা নিয়মে বিপন্ন হতে থাকে—

> রেনি গ্রামের মহিলারা বলেছেন চিপকো করে আমরা ফেঁসে গেছি, আমাদের অঞ্চল নন্দাদেবী জীববৈচিত্র্য অঞ্চল ঘোষণা করে আমাদের জঙ্গলের কিছু নেবার আর সুযোগ নেই।[৫৪]

চিপকো আন্দোলন পরিবেশবাদীদের কাছে নতুন দিশা হয়ে উঠেছিল। এর মধ্য দিয়ে নানা অরণ্যনীতি থেকে শুরু করে পরিবেশ বিপন্নতার থেকে কীভাবে বাঁচা যায় তার বিভিন্ন প্রস্তাব আসতে দেখা যায়। কিন্তু আমরা আবার দেখতে পাই, এখানেও পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়ন এই দুই ধারার বিরোধ । উত্তরাখণ্ড পৃথক রাজ্য হয়ে যাওয়ার পর ২০১৩ সালে যে বিরাট বন্যা হয় এবং এই বন্যা কার্যত এখানকার ভৌগোলিক মানচিত্র বদলে দেয়। এই বন্যার জন্য কিন্তু পরিবেশবাদীরা দায়ী করেছে উন্নয়নকে—

> অনেক রাস্তা ঘাট নির্মাণ, পর্যটন ব্যাবসার জন্য অনিয়ন্ত্রিত বাড়িঘর নির্মাণ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির কর্মকাণ্ডকে দায়ী করেছেন।[৫৫]

চিপকো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখতে পাই। আমরা জানি মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনযাপন থেকে শুরু করে মতাদর্শ ও সংস্কৃতির বদল ঘটে। আজকের সময়ে মানুষের সমস্ত কিছু নির্ভর করে মুনাফার ভিত্তিতে। প্রকৃতি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুই মানুষ মুনাফার নিরিখে পাঠ করে। প্রাচীন ভারতে যেখানে নারীকে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে এক করে দেখত, অর্থনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে ও শ্রমের বিভাজনের প্রশ্নে মানুষ সেই প্রকৃতি ও নারীকে অধিকার করতে লাগল। নারীকে মানুষ সম্পদের সঙ্গে তুলনা করে অত্যাচার করতে শুরু করে। প্রকৃতির উপর মানুষ নির্বিচারে অত্যাচার করে চলেছে। আজকের শিল্পভিত্তিক উন্নয়ণের মডেলের মধ্যেই ধরা আছে নারী ও প্রকৃতিকে অত্যাচারের নিহিত কারণ।

প্রকৃতি সম্পর্কে পুরুষের এই মানসিকতার পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতি থেকে নারীকে তারা প্রান্তিক, অবমূল্যায়ণ করে কার্যত প্রকৃতির মৃত্যু ঘনিয়ে আনল। প্রকৃতির উপর মানুষের এই সহিংস আচরণ কেবলমাত্র মানসিক স্তরেই আবদ্ধ থাকেনি। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত এই মানসিকতার বাস্তব প্রতিফলন দেখছি। চিপকো আন্দোলন নারী ও প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের সেই মানসিকতার নিষ্টুর প্রতিফলন। অরণ্যের কোলে বসতি করা মেয়েরা নিজেদের পরিবার, সমাজের বাঁচার রসদ জোগাড় করত প্রকৃতির থেকে। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের মেয়েরা অনেক দিক থেকে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরশীলতার জন্য তারা প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হয়। কিন্তু, আধুনিক সময় বা বর্তমানে উন্নয়নের যে ধারণা সেখানে মেয়েদের এই জ্ঞানকে কোনো মূল্য দেয় না। চিপকো আন্দোলনের মধ্যে ধরা আছে সেই উন্নয়নকে প্রতিরোধ করার মানসিকতা যেখান থেকে নারীকে তার স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করার মনোভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে কাজ করেছে। বন্দনা শিভা চিপকো আন্দোলনে নারীর সংযুক্তি ও বনকে রক্ষার জন্য আন্দোলনকে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পাঠ করেছেন। ঔপনিবেশিক ও রাষ্ট্রীয় শাসনে প্রকৃতিকে ধ্বংস করার প্রতিবাদে নারীর এই আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় শক্তিকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে নারী তার আজন্ম লালিত প্রকৃতি সংযুক্তির ইতিহাস আবার সামনে আসে। চিপকো আন্দোলনের ফলে জঙ্গলে বেসরকারী লুণ্ঠন বন্ধ হয়, জঙ্গল সংরক্ষিত হয় ও বন্য প্রাণকে মারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এর সঙ্গে মনে রাখা দরকার গাড়োয়ালদের জঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। জঙ্গলের সঙ্গে এই সমস্ত লোকায়ত মানুষদের যে সহজ সম্পর্ক ছিল সরকারী নজরদারীতে ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত সেই সম্পর্ক লোপাট হয়।

চিপকো যেমন আমাদের সামনে তুলে ধরে অরণ্যের প্রতি মানুষের নির্ভরতা যেখানে মানুষ তাদের আজন্মের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপনের ধারাকে বজায় রাখতে আন্দোলন করেছিল। নিয়মগিরির পরিবেশ রক্ষার জন্য এ আন্দোলন আবার একটি নতুন দিককে উন্মোচিত করে। ওড়িষ্যার কালাহাণ্ডি ও রায়গড় জেলায় যে বিস্তৃত শৈলমালা আছে, তাকে কেন্দ্র করে এখানকার আদি জনজাতি কোন্ধদের ধর্মের বিশ্বাস গভীরভাবে জুড়ে আছে। এরা বিশ্বাস করে এই শৈলমালায় 'নিয়ম' নামে দেবতার বাস। এই নিয়ম রাজার তাদের যাবতীয় দেখাশুনো করে। এই ধর্মের বিশ্বাস কেবলমাত্র ওই শৈলশ্রেণীতেই

আবদ্ধ নেই। এই দেবতার প্রভাব বেশ কিছু এলাকা জুড়েই আছে। এই কোন্ধ জনজাতির কথাতেই ধরা পড়ে তাদের জীবনযাপনে এই দেবতার অবদানের কথা—

> আমরা শতবর্ষব্যাপী শত শত জলধারায়, ঘন অরণ্যে ধন্য। আমরা এখানে অনেক ঔষধি পাই যা আমাদের রোগ দূর করে। আমরা এখানে কাঁঠাল, আম, কমলা, আনারস, কলা ও পেঁপে পাই, এবং বাঁধাকপি, ফুলকপি, ঢ্যাঁড়স, লাউ, হলুদ, আলু, তৈলবীজ চাষ করি। আমরা যেভাবে আছি তাতে আমরা খুশি।... নিয়ম রাজা আমাদের সব দিয়েছেন, এই পাহাড় আমাদের না থাকলে আমরা বাঁচব না।[৫৬]

এই পাহাড়ী অঞ্চলে বক্সাইটের খনি আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এই জনজাতির আন্দোলন। কেননা এই খনির খননে তাদের দীর্ঘদিনের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আঘাত যেমন হানা হবে তেমন করেই এখানকার পরিবেশ, তার বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রবলভাবে আঘাত হানা হবে। এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। এবং এখানে মুখ্যত উঠে আসে এই খনি খননের ফলে আদিবাসীদের ধর্মে প্রবল ভাবেই আঘাত হানা হবে। আমরা এই নিয়মগিরি পরিবেশ আন্দোলনে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই তাহল— এই মানুষের ধর্ম কীভাবে তার চারপাশের পরিবেশকে রক্ষার সহায়ক হয়ে ওঠে। আর ধর্ম বিশেষত লোকায়ত ধর্ম। আমরা তাই দেখতে পাই এই পরিবেশ আন্দোলন ধর্মকে সামনে রেখে তার চারপাশের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখে।

চিপকো থেকে শুরু করে নিয়মগিরি পর্যন্ত পরিবেশ রক্ষার জন্য যে লড়াই তাতে পরিবেশ রক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে। চিপকো আন্দোলন যদি পরিবেশের রক্ষার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনার জায়গা তৈরি করে আর নিয়মগিরি আন্দোলনে আমরা পাই ধর্মের মোড়কে মানুষ কীভাবে পরিবেশকে রক্ষা করছে। আসলে আমরা বুঝতে চাইছি পরিবেশের বা প্রকৃতির নানা শক্তির উপর মানুষ যে প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের বা দেবতার আসন দিয়েছে। আর এই দেবতার পুজোর মধ্য দিয়ে সে প্রকৃতিকেই পুজো করে কার্যত প্রকৃতির কাছেই ফিরে যায়।

বর্তমান সময়ে পরিবেশের রূপরেখায় এই পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলনগুলির গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে। প্রাচীন ভারতে মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলির তেমন সমস্যা ছিল না। তাছাড়া এই পর্বের মানুষ তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে ধর্মভাবনা যুক্ত করে পারস্পরিক সহাবস্থান তৈরি করেছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষের এই মানসিকতার বদল হয়েছে। মানুষ এখন প্রকৃতিকে

সম্পদের নিরিখে দেখে। এই পরিবর্তিত মানসিকতা ও উৎপাদন ব্যবস্থার বদল, জীবিকার ধরণ বদলে যাওয়া ও সর্বোপরি উন্নয়ণের প্রশ্নে পরিবেশ আজকে চরমভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। ফলে বর্তমান সময়ের পরিবেশ চিন্তা বলতে বোঝায় পরিবেশের ভারসাম্যকে রক্ষা করা ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে সংরক্ষণ করা। আজকের সময়ে তাই পরিবেশ নিয়ে আলোচনায় অবধারিতভাবে আসে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলনের প্রসঙ্গ। আসলে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছে পরিবেশের উপাদানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার মানসিকতা থেকে। আজকের সময়ে অরণ্য ধ্বংস হয়ে চলেছে অনবরত। অরণ্যের ধ্বংস আজকের ভারতের সব থেকে বড় সমস্যা। মুনাফাকামী মানুষ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য অরণ্যকে বে-আইনিভাবে লুঠ করছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অরণ্য সংরক্ষণ ও অরণ্য রক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ভারতে ‘অরণ্য সংরক্ষন আইন’ চালু হয়েছে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে। যেখানে ভারতের জমিতে কত শতাংশ অরণ্য থাকবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, সরকারি আইন আর তার বাস্তব প্রয়োগের ফারাক দেখা যায়। সরকারী আইন বাস্তবায়িত হতে পারে স্থানীয় মানুষের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ফলেই। সরকারে এই উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশবাদী আন্দোলনের ফলেই আজকে অরণ্যের সংরক্ষণ বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবেশবাদী আন্দোলনে অরণ্য ধ্বংসের কারণকে আরও সুক্ষ্মভাবে দেখা হয়। সরকারী আইনে অরণ্য রক্ষার জন্য বলা হলেও সেখানে অনেক ভণ্ডামি ও ফাঁক থাকে। কিন্তু পরিবেশবাদী চিন্তাভাবনায় গভীরে গিয়ে অরণ্য ধংস ও তার রক্ষার বিষয়টি আলোচনা করা হয়। ভারতের মতো দেশে অরণ্য ধ্বংসের কারণ হিসেবে আগেই বলা হয়েছে স্থানীয় মানুষের অরণ্যের প্রতি নির্ভরশীলতাকে। যদিও এই নির্ভরশীলতার জন্য পরিবেশ তেমন ক্ষতি হয় না। কেননা এরা যুগ যুগ ধরে এমন করেই অরণ্য থেকে নিচ্ছে ও অরণ্যের সম্পদকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পরিবেশবাদী আন্দোলনে অরণ্য ধ্বংসের কারণ হিসেবে বলা হয়—

> সাধারণভাবে অনিয়ন্ত্রিত অরণ্যক্ষয় হচ্ছে সমাজের অন্যান্য মৌলিক সমস্যার যেমন কৃষির স্থবিরতা, জমির বণ্টন ব্যবস্থার অসমতা, ক্রমবর্ধমান বেকারি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনস্বার্থে ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি সমস্যাগুলিকে আয়ত্তে আনার অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।[৫৭]

আসলে মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নতি যতক্ষণ না হবে মানুষ ততদিন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে না। মানুষের পরিবেশ রক্ষার থেকে আগে তার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব প্রাধান্য পায়। তাই তারা পরিবেশ থেকে নিজে ও পরিবারের সুরক্ষার জন্য নির্বিচারে সম্পদ নেয়; এরফলে সেখানকার অরণ্যের ক্ষতি হয়। আজকের সময়ে তাই অরণ্য সংরক্ষণের জন্য নানা কমিটি গড়ে উঠেছে। যেখানে সরকারের উন্নয়ণের জন্য অরণ্য ধ্বংস করার সিদ্ধান্তকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করে অরণ্যকে স্থানীয় মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়। এবং এর সঙ্গে একইভাবে উচ্চারিত হয় নানা শ্লোগান যার মূল সুর থাকে অরণ্যকে ফিরে পাওয়া বা অরণ্য কেন আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন তার জন্য প্রচার। অরণ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাচীনকালে যেমন করে আমাদের ভোগবাদকে দায়ী করা হত এবং এই ভোগের সংযমের অভ্যাসকে গুরুত্ব দেওয়া হত আজকের সময়েও সেই একই কথা শোনা যায় নানা পরিবেশবাদী আন্দোলনে। যেখানে বলা হচ্ছে আধুনিক সময়ে মানুষের ক্রমবর্ধিত ভোগবাদী জীবনযাপনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি হচ্ছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমী দুনিয়ার ভোগ সর্বস্বতাকেন্দ্রিক মানসিকতাকে বেশি করে দায়ী করা হয়, বিপরীতে আমাদের ভারতবর্ষের মতো দেশে মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক ভাবনা জুড়ে থাকার জন্য এই ভোগবাদ চরম আকার ধারণ করেনি। তবুও এই ভোগবাদ থেকে দূরে থেকে প্রকৃতির উপাদানকে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। অরণ্যকে বাঁচিয়ে রাখা বা অরণ্য সচেতনতার জন্য সামাজিক বনসৃজনেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে অরণ্যকে রক্ষার জন্য নানা পদ্ধতির কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আমরা জানি যে, ভারতে অরণ্যকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি সুন্দরবনকে স্থানীয় মানুষ পবিত্র বলে মনে করে। আর এই মনে করে বলেই তারা বন থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নিলেও যথেচ্ছ ভাবে বনকে ব্যবহার করে না। বনকে পবিত্র বলে মনে করে বলেই বনে কোনো মানুষ শৌচকাজ করে না। আসলে ভারতবর্ষের মানুষের অরণ্যের সঙ্গে ধর্মীয় ভাবাবেগ যুক্ত আছে আর সেই জন্য তারা বনকে পবিত্র বলে মনে করে ও তাকে রক্ষা করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করে। এই যে ধর্মীয় আচারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বনকে পবিত্র বলে মনে করার মধ্যে আসলে বনকে সংরক্ষণের প্রাচীন পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। এছাড়া এখনও অনেক কৌম সমাজ আছে যারা বনে যেতে বেশ কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলে। এই বিধিনিষেধ মেনে চলার মধ্য দিয়ে তারা বনকে রক্ষা করার মানসিকতা

দেখায়। এখানে অবধারিতভাবে আলোচনায় আসে আজকের যে পরিবেশ বিপন্নতার যুগ তা কি কেবলমাত্র উন্নয়নের জন্য। অর্থাৎ, উন্নয়নের যে বিষবাষ্প কী পরিবেশের সমূহ ক্ষতি করছে? কৃষিকাজ থেকে শুরু করে কলকারখানায় যে পরিমাণ আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে কেবলমাত্র তার জন্যই পরিবেশ দূষিত হচ্ছে? একভাবে সেটা যেমন ঠিক, ঠিক তেমন করেই আমাদের ভাবতে হবে অনুন্নতির কারণেও পরিবেশ বিপন্ন হতে পারে। ১৮৯৮-তে এবেনাইজার হাওয়ার্ড-এর Tomorrow: A peaceful path to real reform বলা হয়—

> ধোঁয়াহীন বস্তিবিহীন এমনকি যানবাহনের চলাচলের পথ থেকে দূরে সবুজে ঘেরা নূতন নগর বিন্যাসের কল্পচিত্র আগামী দিনের সবুজ শহর।[৫৮]

অর্থাৎ, তিনি আগামী দিনের সবুজ শহরের একটি কাল্পনিক চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, উন্নয়ন আমাদের দরকার আর মানুষের জীবনযাত্রার সার্বিক উন্নতির জন্য নাগরিক পরিসেবা খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাই বলে পরিবশের ক্ষতি করে নয়। আমরা জানি যে, স্টকহোমে ইন্দিরা গান্ধীর সেই বিখ্যাত উক্তি, যেখানে তিনি বলছেন যে, দারিদ্রতাই হল আসল দূষণ (Poverty is the worst pollutant)। আমরা আসলে বলতে চাইছি যে, উন্নয়ন না হলে, মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি না হলে, আমাদের পরিবেশে তার প্রভাব পড়বে। উন্নয়নের যে রূপরেখায় কেবল অর্থের উন্নতির কথা বলবে ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণের কথা বলবে সেই উন্নয়ন আদতে মানুষের কোন কাজে লাগে না; নিদেনপক্ষে দরিদ্র মানুষের কোনো কাজেই তা আসে না। মানুষ পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের সংজ্ঞা বদল করতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে উন্নয়ন বলতে যেমন সম্পদ বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের কোথাও সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নয়ন বলতে সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রার মানন্নোয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একজন মানুষ যে পরিবেশে বাস করবে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁচার পরিবেশের উন্নতি করা খুবই দরকার। আর এই উন্নয়ণের ফলেই মানুষ তার চারদিকের পরিবেশর যোগ্য রক্ষক হয়ে উঠবে। আর তাহলেই পরিবেশের সঙ্গে উন্নতির বা উন্নয়ণের বিরোধ থাকবে না বলে মনে হয়। আমাদের সামনে উন্নয়ন বনাম

পরিবেশের সমস্যা কেনো বেশি প্রকট হচ্ছে তার একটি রূপরেখা হাজির করেছেন প্রসাদ রায়। তিনি এই সমস্যা ও নীতিগুলিকে সম্পর্কে বলেছেন—

> ক) কৃষিনীতি, যার ফলে নিবিড় কর্ষণ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ বাড়ছে, প্রান্তিক জমিকে চাষের আওতায় আনা হচ্ছে এবং ভূমিক্ষয় বাড়ছে। খ) সেচনীতি, যার ফলে বহু বড়ো বড়ো সেচ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে অথচ জলের ব্যবহারের উপর তেমন নজর দেওয়া হচ্ছে না। গ) বননীতি, যার ফলে বনসম্পদ ভোগ্র জন্য অথবা তথাকথিত উন্নয়ন-এর প্রয়োজনে বনচ্ছেদ হচ্ছে, পুনর্বনায়ন তেমন হারে হচ্ছে না বা হলেও মানুষের তেমন কাজে আসছে না। ঘ) শিল্পনীতি, যার ফলে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন হয়েছে, দূষণরোধের ব্যবস্থা করা যায়নি এবং বহু ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ঙ) শক্তি ও কাঁচামাল ব্যবহার–সম্পর্কিত নীতি, যার ফলে চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে অথচ জোগান ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে।[৫৯]

ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উন্নয়নের নামে যে সমস্ত নীতি নির্ধারিত হয়েছে তার ফলেই পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বেশ খানিক সমস্যার মধ্যে পড়ছে। ১৯৮৬ সালে ভারতের প্রাক্তন পরিবেশ-সচিব ড. টি. এন. খোশু ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের কাছে কতগুলি সমাধান সূত্র বলেন—

> জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করা। সুসংহতভাবে প্রকৃত ভূমি-সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা করা। কৃষিজমি ও ঘাস জমির স্বাস্থ্যরক্ষা। বনভূমির স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রান্তিক জমির পুনর্বনায়ন (reforestation)। জৈব সম্পদের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ। জল ও বায়ুদূষণ সমস্যার প্রতিকার। শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুনর্নবীকরণযোগ্য (Renewable) ও দূষণমুক্ত করে তোলা। সমস্ত বর্জ্যপদার্থের রিসাইক্লিং ব্যবস্থা। ঘন জনবসতি অঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়ন। পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষাব্যবস্থা ও গনচেতনা গড়ে তলা। পরিবেশ-সংক্রান্ত আইন সংশোধন এবং জাতীয় সুরক্ষা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা।[৬০]

আমাদের আসলে ভাবতে হবে, আজকের সময়ে যে পরিবেশ বিপন্নতার যুগ তার ইতিহাস সূত্রকে আর তার সঙ্গে এই বিপন্নতার বহু বিচিত্র ধরণকে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি উন্নয়নকে খানিক দায়ী করা হয় আজকের পরিবশ বিপন্নতার জন্য। কিন্তু, আমরা এটাও বুঝতে চেয়েছি এই উন্নয়ণের অভিমুখ কী কী হওয়া উচিত। আমরা বলতে চেয়েছি এই উন্নয়ন আসলে মানুষের চারপাশের পরিবেশের সার্বিক উন্নয়ন। আমাদের পরিবেশের বিভিন্ন পরিসর বা উপাদানগুলি কীভাবে বিপন্ন হয়ে

পড়ছে তার ইতিহাস জানলে আজকের সময়ে পরিবেশ বিপন্নতার মূলসূত্রগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রথমেই বনভূমি কীভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে তার ইতিহাস দেখা দরকার। আজকের সময়ে মানুষ বনভূমিকে লুণ্ঠিতব্য পরিসর বলেই ভাবতে পছন্দ করে। আর তার ফলে বনের যে বিস্তার তা কমে যাচ্ছে। এই বনভূমি কমে যাওয়ার পিছনে বেশ কতগুলি কারণ আমরা পাই—

১। চাষের জমির জন্য বন কেটে ফেলা।

২। আদিবাসীদের সাংসারিক কিছু প্রয়োজনে গাছ কাটা হচ্ছে। যদিও এদের এই প্রয়োজন বনের কমে যাওয়ার পিছিনে গুরুত্বপূর্ণ কোন কারণ না। কিন্তু, ঝুম চাষের ফলে বনভূমির বেশ খানিক নষ্ট হচ্ছে।

৩। এছাড়া জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে শুরু করে সেচ প্রকল্পে যে পরিমান বনের কাঠ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃৎ হচ্ছে ও নতুন করে গাছ লাগান হচ্ছে না। আর এর ফলে বনভূমির সমূহ বিপদ হতে পারে।

৪। এছাড়া শিল্পের প্রয়োজনে আমরা প্রায় দেখতে পাই বনকে নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। এর সঙ্গে আছে রেল লাইন থেকে শুরু করে রাস্তা তৈরির বিষয়।

উপরের তালিকা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, বনসম্পদকে কীভাবে সাঁড়াশির মতো করে আক্রমণ করা হচ্ছে। আর তার ফলে আজকে সবুজের জায়গায় তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের জঙ্গল। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যে সামাজিক বনসৃজন করা হচ্ছে বা সরকারের অরণ্যনীতি এই সমস্যার সুদুরপ্রসারী কোনো সমাধানে পৌঁছনো যাবে বলে মনে হয় না। কেননা, আমরা দেখতে পাই বনসৃজনে মানুষ যে সমস্ত গাছ লাগান তার মধ্যে ইউক্যালিপটাস বেশি পরিমানে থাকে। কিন্তু, আমরা জানি এই গাছটি অন্য গাছের বিস্তারে বাধা দেয়। বনসৃজন প্রকল্প আধুনিক সময়ে ভারতবর্ষের পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এখানে বলা হয় নগ্ন, অনুর্বর ও অনুৎপাদনশীল জমিতে বেশি করে সামাজিক বনসৃজন করতে হবে। এছাড়া এখানে বলা হয় দেশের সমস্ত ভূমি এলাকার এক-তৃতীয়াংশ বনভূমির আওতায় আনতে হবে। বনভূমির সঙ্গে যেহেতু উপজাতির নিকট আত্মীয় সম্পর্ক আছে তাই বন-সংলগ্ন উপজাতিদের জীবিকা সংস্থানের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনযাপনের সার্বিক উন্নতি সাধন করা আর এর ফলে এদের বন-সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ রক্ষা পাবে।

বর্তমান সময়ে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রধান কারণই হল পরিবেশ বিপন্নতার জন্য। আধুনিক সময়ে যেভাবে উন্নয়নের জন্য শিল্প, কলকারখানা গড়ে উঠছে তার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। শিল্প ও সবুজ রক্ষার দ্বন্দ্ব আজকের সময়ে সব থেকে বড় আলোচনার বিষয়। ভারতে শিল্পের জন্য নির্বিচারে বন, বসতি থেকে নদী কোনো জায়গা বাদ দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। শিল্পের জন্য বিঘার পর বিঘা কৃষিজমিতে কংক্রিটের জঙ্গল গড়ে উঠছে। ভারতে শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দূষনের মাত্রাও বেড়ে চলেছে। ১৯৮৪ সালের ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা আমাদের সামনে শিল্পকেন্দ্রিক উন্নয়ণ ও তার সঙ্গে পরিবেশ দূষণকে সামনে আনে। এছাড়া নগরায়ণের ফলে গ্রাম পতন হচ্ছে অনবরত। শহর বা নগরের ক্রমিক অগ্রগতি প্রতি মুহূর্তে গ্রামকে দখল করছে এবং গ্রামকে কেন্দ্র করে যে প্রকৃতির বিস্তার তা আজকের সময়ে বিপন্নতার মুখোমুখি হয়েছে। নগরায়ণের বিস্তার ও নাগরিক জীবনযাপনের ধারা আজকের গ্রামকে ঘিরে থাকা যে সবুজের আচ্ছাদন তা ছিন্ন হতে শুরু করেছে। কিন্তু এই উন্নয়ন, শিল্প একান্ত ভাবেই দরকার। কেননা ভারতবর্ষে পরিবেশ বিপন্নতার বড় কারণ হল দারিদ্র্যতা। দারিদ্রতার জন্য আজকের ভারতবর্ষের পরিবেশের ভারসাম্য প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন হচ্ছে—

> দরিদ্র মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যা সম্ভব তাই করবেন-প্রান্তিক জমিতে চাষ, বনচ্ছেদন, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পাড়ি-এ সবই এর উদাহরণ।[৬১]

সুতরাং, ভারতের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য উন্নয়ন যেমন চাই তেমন করে দারিদ্র্যতার হার কমাতে হবে। পরিবেশ রক্ষার জন্য আয় বৃদ্ধি ও তার সম বণ্টনই পারে মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে দূরে রাখতে। পরিবেশের সম্পদকে আজকের সময়ে নির্বিচারে ভোগ করা হচ্ছে। পরিবেশকে যদি সুষ্ঠ রাখতে হয় তাহলে পরিবেশের সম্পদকে সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যবহার করার মানসিকতা গড়া খুবই প্রয়োজনীয়। তাই বর্তমানে ভারতে পরিবেশ রক্ষার জন্য সরক্ষণের নীতিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। আসলে সরক্ষণের মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে, মানুষের কোনো নৈতিক অধিকার নেই যে অন্য কোনো প্রজাতিকে ধ্বংস করবার। এছাড়া সংরক্ষণের ফলে কোনো এলাকার প্রাকৃতির যে সৌন্দর্য তা অটুট থাকে। এই বিষয়ের সব থেকে বড় কথা হল, আমাদের চারপাশের পরিবেশের প্রতিটি জীব একটি অদৃশ্য জৈব শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এবং এই শৃঙ্খলের একটি জীবের ধ্বংস হলে অপর

জীবের উপর তার প্রভাব পড়বে। ফলে এই জৈব শৃঙ্খল টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবেশের প্রতিটি জীবের সংরক্ষণ ও সহাবস্থান খুবই জরুরি।

১.৭ উপসংহার

ভারতবর্ষের পরিবেশ চর্চার বিস্তৃত ইতিহাস আছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজকের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক পরিসর থেকে শুরু করে মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষীয় মানুষ প্রকৃতির এই অবদানকে মাথায় রেখে তাকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করেছে। প্রাচীন ভারতের পরিবেশ নিয়ে যে চিন্তাভাবনা তা বর্তমান সময়ের থেকে আলাদা। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতি হয় প্রকৃতির কোলে। প্রাচীন ভারতের পরিবেশের শৃঙ্খল যে সবসময় অটুট ছিল এমন নয়। এই পরিবেশের ভারসাম্য অনেক সময় টাল খেয়েছে। কিন্তু তা আজকের সময়ের মতো বিপন্ন হয়ে পড়েনি। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক পরিবেশে প্রকৃতির উপাদানকে মানুষ ভোগের নিরিখে দেখেনি। তাই প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানকে অবাধে লুঠ করেনি। ভারতবর্ষের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক রক্ষার জন্য তার ধর্মচিন্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাইবেলে যেমন মানুষকে সব কিছুর উপর প্রভুত্ব আরোপ করে প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তারের কথা বলছে। সেখানে ভারতীয় ধর্মের কিন্তু পরিবেশের সমস্ত প্রাণ ও মানুষের সঙ্গে তার সহাবস্থানের কথাই বারবার উচ্চারিত হয়েছে। বেদের বিভিন্ন সূক্তে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে ধর্মীয় ভাবনার মাধ্যমে আরাধনা করছে। প্রাচীন ভারতে প্রকৃতিকে পুজো করার মাধ্যমে বেঁচে থাকার উপাদানকে নিতে চেয়েছে। এইজন্য বেদের সূক্তগুলিতে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতিকে নিকট আত্মীয় বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন বেদে আমরা পৃথিবীকে মাতা বলে আমরা সম্বোধন করতে দেখি। বেদ, পুরাণের সময়ে জল, আকাশ থেকে শুরু করে বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এছাড়া মানুষ প্রকৃতির এই শক্তিগুলির উপর দেবত্ব আরোপ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। এরফলে প্রাচীন ভারতে পরিবেশের ভারসাম্য আজকের সময়ে মতো করে বিপন্ন হয়ে পড়েনি।

বৈদিক সমাজ ছাড়া লোকায়ত সমাজে প্রকৃতির নিয়ে চিন্তাভাবনা তাদের নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরা পড়েছে। লোকায়ত সমাজ প্রকৃতির কাছে আবেদনের মাধ্যমেই বেঁচে থাকার সামগ্রী পেতে চেয়েছে। লোকায়ত সমাজ প্রকৃতির ধ্বংসলীলা দেখে যেমন ভয় পেয়েছে তেমন করে তার দান পেয়ে শ্রদ্ধায় নত হয়ে পুজো করেছে। লোকায়ত সমাজের পরিবেশ ভাবনায় পারস্পরিক আদান-প্রদানের কথাই উচ্চারিত হয়েছে। লোকায়ত সমাজের যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পাই তাতে প্রকৃতির প্রতি অপার শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এই সমস্ত মানুষদের প্রতিদিনের কাজকর্মে কোথাও প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা দেখা যায় না। প্রকৃতির থেকে যদি কোন প্রয়োজন হয় সেখানে তারা আবেদন ও নিবেদনের মধ্য দিয়ে তা পেতে চেয়েছে। আমরা যদি লোকায়ত সমাজের পালিত ব্রতগুলিকে দেখি তাহলে প্রকৃতির প্রতি এই মানুষদের মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাই; যেখানে বৃষ্টি দরকার হলে মানুষ বৃষ্টির অনুকরণে তা পেতে চাইছে। এই ব্রতের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই লোকায়ত সমাজ প্রকৃতিকে সম্পদ হিসেবে দেখছে না। জীবনের বেঁচে থাকার উপাদানকে পেতে এই সমস্ত মানুষ নানা স্পর্শমূলক, অনুকরণমূলক আচার-আচরণ পালন করেছে। লোকায়ত সমাজের এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে প্রকৃতি পূজার প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে; যেখানে পরিবেশের সমস্ত উপাদানের সমান গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। ফলে লোকায়ত সমাজের পরিবশ ভাবনায় পরিবেশের সমস্ত উপাদানের সংরক্ষণ ও পরিবেশের সমস্ত উপাদানের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

বৈদিক যুগ পরবর্তী সময়ে মানুষের প্রকৃতি ভাবনার বদল হতে দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে প্রকৃতি ভাবনার যে ধরণ দেখতে পাই তা বৈদিক সাহিত্যের মতো নয়। আবার বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে পরিবেশের জীবজ ও অজীব উপাদানের সমান গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। আবার আমরা পরিবেশ রক্ষা করার জন্য অশোকের রাস্তার পাশে সামাজিক বৃক্ষরোপণ করতে দেখি। ফলে আমরা বুঝতে পারি ভারতে পরিবেশ সচেতনতা প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশের যে বিপন্নতা বা প্রকৃতিকে যেভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে প্রাচীন ভারতবর্ষে তেমন ছিল না। আসলে প্রাচীন ভারত থেকে বর্তমান সময়ে প্রকৃতিকে ধ্বংসের কারণ হল মানুষের প্রকৃতিকে নিয়ে মানসিকতা বদলের কারণে। সময়ের অগ্রগতির কারণে মানুষ যখন প্রকৃতিকে বুঝতে শিখেছে, মানুষের উৎপাদনের ধরন-ধারণ

বদলেছে, মানুষ প্রকৃতিকে সম্পদ হিসেবে দেখত শুরু করে। মানুষের মনে যখন মুনাফা ও বাজার অর্থনীতির ধারণা প্রবেশ করেছে তখন থেকেই আমাদের ঐতিহ্য লালিত প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণার ফারাক ঘটে যায়।

বর্তমান সময়ে পরিবেশ নিয়ে আমাদের চর্চার বেশিরভাগ জুড়েই আছে পরিবেশের রক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা। আজকের সময়ে নগরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীন পরিবেশ চরমভাবে বিপন্ন হচ্ছে। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের নামে অরণ্যকে নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। উন্নয়ন, শিল্পায়ন প্রভৃতি চিন্তাভাবনার মধ্যে নিশ্চিতভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান্নোয়নের বিষয়টি আছে কিন্তু এরফলে খেসারত দিতে হচ্ছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতি যে অফুরান কোনো সম্পদ নয় মানুষ তা ভুলেই গিয়েছে আর ভুলে গিয়েছে বলেই আজ পরিবশ বিপন্ন। প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে বর্তমান ভারতবর্ষের পরিবেশ চর্চার ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় একটা জিনিস স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতিকে নিয়ে আমাদের যে আধ্যাত্মিক চিন্তা ছিল তার থেকে বর্তমান ভারত বেশ খানিক সরে এসেছে। ভারতবর্ষের মতো ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া দেশে প্রকৃতিকে পুজো করার মধ্য দিয়ে তাকে রক্ষা করার মানসিকতাই প্রকাশিত হত। আমরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ্ থেকে নানা ধর্মের দর্শনে সেই মানসিকতা দেখতে পেয়েছি কিন্ত বর্তমান যন্ত্র সভ্যতায় সেই চিন্তাভাবনা লোপাট পেয়েছে। ফলে বর্তমানে বিশ্ব পরিবেশ বিপন্নতার যুগে ভারতবর্ষের পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনার ইতিহাস চর্চার প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়।

তথ্যসূত্র:

১। চক্রবর্তী, পার্থ। *প্রকৃতি পরিবেশ নিসর্গনীতি: রাজনৈতিক ও দার্শনিক অনুসন্ধান।* কলকাতা: সেতু। ২০১২। পৃ ১৯।

২। গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১২। পৃ ৩২।

৩। হাবিব, ইরফান। *মানুষ ও পরিবেশ: ভারতবর্ষের বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০১৫। পৃ ৭৪।

৪। গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতের পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১২। পৃ ৩৮।

৫। চক্রবর্তী, নিশীথ। *বৈদিক লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১০। পৃ ৪২।

৬। চক্রবর্তী, নিশীথ। *বৈদিক লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১০। পৃ ৪৮।

৭। দাশগুপ্ত, শশীভূষণ। *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ১৩৬৭। পৃ। ১৬।

৮। দাশগুপ্ত, শশীভূষণ। *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ১৩৬৭। পৃ। ১৭।

৯। গোস্বামী, বিজনবিহারী (অনুবাদ ও সম্পাদনা)। *ঋগ্বেদসংহিতা* (১/১১৫/১)।কলকাতা: হরফ প্রকাশনী। ১৯৭৫।

১০। গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১২। পৃ ৪০।

১১। গোস্বামী, বিজনবিহারী (অনুবাদ ও সম্পাদনা)। *বেদ, অথর্ববেদ-সংহিতা।* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী। ১৯৭৫। পৃ ১১৩।

১২। গোস্বামী, বিজনবিহারী (অনুবাদ ও সম্পাদনা)। *বেদ, অথর্ববেদ-সংহিতা।* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী। ১৯৭৫। পৃ ৪।

১৩। ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ। *হিন্দুদেরদেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।* কলকাতা: ফার্মা কেএল এম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮০। পৃ ১৫৮।

১৪। ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ। *হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।* কলকাতা: ফার্মা কেএল এম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮০। পৃ ১৯২।

১৫। ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ। *হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।* ফার্মা কেএল এম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮০। পৃ ১৭৭।

১৬। গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্যসংসদ। ২০১২। পৃ ৪৫।

১৭। গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্যসংসদ। ২০১২। পৃ ৮১।

১৮। গোস্বামী, বিজনবিহারী (অনুবাদ ও সম্পাদনা)। *অথর্ব* (১২/১/১১)।কলকাতা: হরফ প্রকাশনী। ১৯৭৫।

১৯। গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্যসংসদ। ২০১২। পৃ ৮৩।

২০। গোস্বামী, বিজনবিহারী (অনুবাদ ও সম্পাদনা)। *অথর্ব* (১২/১/৩৫) । কলকাতা: হরফ প্রকাশনী। ১৯৭৫।

২১। Kulkarni, Nirmala. *Man and Natural Relationship Reflected in the SuklaYajurved,* Proceedings of the national seminar. *On Environmental Awarness Reflected in Sanskrit Literature,* V. N. Jha (Edited) Centre Of Advanced Study in Sanskrit, University of Poona, 1991.

২২। সেন, অতুলচন্দ্র, তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ ও ঘোষ, মহেশচন্দ্র (অনুদিত ও সম্পাদিত)। *উপনিষদ।* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী। ২০১০। পৃ ৪৪৮।

২৩। গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্যসংসদ। ২০১২। পৃ ১০৫।

২৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্দশখণ্ড)।* কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৪৯। পৃ ৪৫৯।

২৫। বসু, রাজশেখর(অনুদিত)। *বাল্মিকী রামায়ণ।* কলকাতা: এমসি সরকার অ্যান্ড কোং। তারিখবিহীন। পৃ ৪৬৯।

২৬। নন্দীচক্রবর্তী, কবিতা। *বাংলাসাহিত্যে পরিবেশচেতনা।* কলকাতা: আশাদীপ। ২০১৭। পৃ ১৫।

২৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *তপোবন।* রবীন্দ্ররচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৪৯। পৃ ৪৭৮।

২৮। Mukherjee, Bandana. *Ecological Concept of early Buddhism and its relevance in modern days.* এবং আমরাঃ গৌতমবুদ্ধ সংখ্যা। ২০১৩। পৃ ৩৪৫।

২৯। Padmasiri De Silva. *Environmental Philosophy and Ethics in Buddhism. New York State*: *martin press.* 1998. pg.31.

৩০। মজুমদার, দীপা। *বোধিবৃক্ষপূজা* । এবং আমরাঃ গৌতমবুদ্ধসংখ্যা। ২০১৩। পৃ ২৭৫।

৩১। থাপার, রোমিলা। *পিলারএডিক্ট-VII। অশোক অ্যান্ড দি ডিকলাইন অব মৌরিয়জ।* অক্সফোর্ড। ১৯৬১। পৃ ২৬৫।

৩২। মুখার্জী, জিনিয়া (অনুবাদক) । *মানুষ ও পরিবেশঃ ভারতবর্ষের বাস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০১৫। পৃ। ৭১।

৩৩। মুখার্জী, জিনিয়া (অনুবাদক) *। মানুষ ও পরিবেশঃ ভারতবর্ষের বাস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০১৫। পৃ। ৭২।

৩৪। ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ। *মেয়েদের ব্রতকথা।* কলকাতা: মহেশ পাবলিকেশন। তারিখবিহীন। পৃ ২২।

৩৫। রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীরইতিহাস(আদিপর্ব)।* কলকাতা: দে'জপাবলিশিং। ১৩৫৬। পৃ ৪৭৯।

৩৬। গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১২। পৃ ২০৩।

৩৭। ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস।* কলকাতা: জেনারেল। ২০১৪ (তৃতীয় মুদ্রণ)। পৃ১১

৩৮। রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদিপর্ব)।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৩৫৬। পৃ ৪৭৯।

৩৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ছিন্নপত্র।* কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৮৯২।

৪০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ* (রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৭২। পৃ ৩২৬।

৪১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ* (রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৭২। পৃ ৩৩৩।

৪২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ* (রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৭২। পৃ ৩৩৫।

৪৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। তপোবন । রবীন্দ্ররচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৪৯। পৃ ৪৭৮।

৪৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *পল্লীর উন্নতি, পল্লীপ্রকৃতি।* (রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৭২। পৃ ৫১৮।

৪৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *অরণ্যদেবতা* (রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৭২। পৃ ৫৪৬।

৪৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ছিন্নপত্রাবলী* (পত্রসংখ্যা ১৩)। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১৯৬০। পৃ ৩৩।

৪৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *অরণ্যদেবতা* (রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড)। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৭২। পৃ ৫৪৭।

৪৮। গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১২। পৃ ২২৩।

৪৯। দেবী, মহাশ্বেতা। *বিরসামুণ্ডা।* কলকাতা: প্যাপিরাস। ২০০২। পৃ ১১।

৫০। দেবী, মহাশ্বেতা। *অরণ্যের অধিকার।* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। ১৩৮৪। পৃ.৭০ ।

৫১। দেবী, মহাশ্বেতা। *অরণ্যের অধিকার।* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। ১৩৮৪। পৃ.৭৩।

৫২। দেবী, মহাশ্বেতা। *অরণ্যের অধিকার।* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। ১৩৮৪। পৃ ৭৩।

৫৩। রায়, মোহিত(সম্পা)। *পরিবেশচর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন।* কলকাতা: অনুষ্টুপ। ২০১৫। পৃ ১৭।

৫৪। রায়, মোহিত(সম্পা)। *পরিবেশচর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন।* কলকাতা: অনুষ্টুপ। ২০১৫। পৃ ১৯।

৫৫। রায়, মোহিত(সম্পা)। *পরিবেশচর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন।* কলকাতা: অনুষ্টুপ। ২০১৫। পৃ ২০।

৫৬। রায়, মোহিত(সম্পা)। *পরিবেশচর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন।* কলকাতা: অনুষ্টুপ। ২০১৫। পৃ ২৩।

৫৭। রায়, মোহিত (সম্পা)। *পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন।* কলকাতা: অনুষ্টুপ। ২০১৫। পৃ ১৭০।

৫৮। রায়, মোহিত (সম্পা)। *পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন।* কলকাতা: অনুষ্টুপ। ২০১৫। পৃ ৭৩।

৫৯। রায়, মোহিত (সম্পা)। *পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন।* কলকাতা: অনুষ্টুপ। ২০১৫। পৃ ১১৭।

৬০। রায়, মোহিত (সম্পা)। *পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন।* কলকাতা: অনুষ্টুপ। ২০১৫। পৃ ১১৮।

৬১। রায়, মোহিত (সম্পা)। *পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন।* কলকাতা: অনুষ্টুপ। ২০১৫। পৃ ১৪১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী'র থান: স্বরূপ ও বিবর্তন

২.০ ভূমিকা

বাংলার লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নানা উপাদানের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার লোকসংস্কৃতির নাম উচ্চারণ করলে আমাদের কাছে পরিচিত কিছু উপাদান ও মানুষের পালিত কিছু আচার-অনুষ্ঠানের দৃশ্য ভেসে ওঠে। কিন্তু বাংলার লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে যা লোকসংস্কৃতি চর্চায় খুব বেশি আলোচিত হয় না। বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্দরমহল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে গেলে থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিসর। লোকায়ত মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনের যে নকশা তাতে লৌকিক দেবদেবী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। গ্রামীন সমাজের ধর্মভীরু মানুষ তাদের ভালো-মন্দের সব কিছু এই লৌকিক দেবদেবীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে দিন অতিবাহিত করে। আর এইজন্য লৌকিক দেবদেবীর থান বাড়ির পাশে, রাস্তার ধার থেকে শুরু করে অঞ্চলের সর্বত্র দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরিতে বড় কোনো শিল্প ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত দেবদেবীর থান বিরাট কোনো তত্ত্ব বা শিল্প ভাবনায় তৈরি হয় না। এই সমস্ত থান তৈরিই হয়েছে লোকায়ত মানুষের নানা চাহিদা থেকে। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লৌকিক দেবদেবীর অসংখ্য থান নিতান্ত প্রাকৃতিকভাবে থাকতে দেখা যায়। আমরা জানি যে, মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষকে ক্রমাগত নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে। মানুষ এই সর্বাত্মক অসহায় অবস্থায় নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে নানা অলৌকিক শক্তির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মানুষ নিজের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি মেটাবার জন্য নানা আচার-আচরণ থেকে শুরু করে জাদুবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়েছে। ফলে সেই কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে মানুষ নানা আচার-সংস্কৃতি তৈরি করেছে তেমন করে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন নানা দেবদেবীর কল্পনা করেছে। যদিও প্রথম দিকে এই দেবদেবীর কোনো মূর্তিভাবনা মানুষ কল্পনা করেনি। এই দেবদেবীর আশ্রয় ও বিকাশ প্রথম থেকেই সংহত সমাজের দ্বারাই হয়ে আসছে। এই দেবদেবীদের আশ্রয় করেই আমরা

পরবর্তী সময়ে লোকধর্মের ধারণা পাই যা কিনা বৈদিক বা পৌরাণিক দেবদেবীর ধর্ম ও দর্শনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই লোকধর্ম সম্পর্কে ফাল্গুনী ভূএ্যা জানান—

> ১। সংহত সমাজ জীবনে জীবিকার প্রয়োজনে, জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এবং প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে বেশ কিছু প্রয়োজনের দেবদেবী, গাছপাথর, চিহ্ন, দেউল প্রভৃতির উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে এবং যুগ ও সামাজিক পরিবর্তন রূপান্তরের ধারায় এগুলির কিছু অস্তিত্ব ও বিলুপ্ত হয়। বিবর্তনের ধারায় লোকদেবতা-লোক বিশ্বাস সংস্কার লোকধর্মে বিবর্তিত হয়; তবে এই বিবর্তনের গতি খুবই ধীর-মন্থর।
>
> ২। লোকধর্ম-বিশ্বাস সংস্কার-উৎসব লোকসমাজের মূলত ঐহিক কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে আচরিত ও ক্রিয়াশীল। এই ঐহিক কল্যাণের মধ্যে কৃষিক্ষত্রে কৃষিজাতশস্য-উৎপাদন ও পরিবারের মধ্যে সন্তান-সৃজনের ইচ্ছা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।
>
> ৩। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুলভ স্বাভাবিক সাধারণ উপকরণ উপাদান নৈবেদ্যরূপে লোকদেবদেবীর কাছে নিবেদিত হয়। এই নৈবেদ্যগুলির প্রতীকতা বিশ্লেষণ করলে আচরণকারীর উদ্দেশ্য বিশ্বাস-সংস্কার-প্রথাটির উৎপত্তি ও ভিত্তি স্পষ্ট হবে।
>
> ৪। লোকধর্ম উৎসবের আঙিনায় যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে। জীবন-জীবিকাগত সমষ্টি স্বার্থ এই বৈশিষ্ট্যটি সৃষ্টি করেছে।
>
> ৬। লোকধর্মের সমগ্ররূপের মধ্যে ব্যক্তি চেতনার পরিবর্তে, সমষ্টিচেতনা (Common felingness) সর্বোতভাবে ক্রিয়াশীল। এই সমষ্টিগত মনোভাবের জন্য লোকসাধারণের মধ্যে 'আমরা' শব্দটি উচ্চারিত হয়।
>
> ৯। লোকধর্মের প্রায় আবশ্যিক অঙ্গ লোকসঙ্গীত,...। অধিকাংশ লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে একটি আকর্ষণীয় কাহিনিও যুক্ত থাকে।
>
> ১০। অধিকাংশ লোকধর্মের আলোচনা সাধনা ও চর্চার জন্য নির্দিষ্ট আখড়া-আসন-মন্দিরতলা-দেউল-দরগা-গাছতলা ইত্যাদি বর্তমান।[১]

লোকজীবনে লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব সবথেকে বেশি। লোকায়ত সমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতি উৎপত্তি ও বিকাশে এই সমস্ত দেবতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। মানব সভ্যতার একেবারে শুরু থেকেই মানুষের কল্পিত এই সমস্ত দেবতারা তাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে হাজির হয়েছিল। এই লৌকিক দেবতাদের আশ্রয় করে পরবর্তী সময়ে আমরা লোকধর্মের বিস্তার লাভ করতে দেখি। এই লোকধর্মের মধ্য দিয়ে বাংলার লোকায়ত সমাজের অন্তর্জীবন ও তার বর্হিজীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। আসলে লোকায়ত মানুষ নিজের জীবনের নানা সুখ-দুঃখের আশ্রয়স্থল এই দেবদেবীর থান। এদের ঘিরেই মানুষ তাদের ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নানা কৃচ্ছ্রসাধনার মাধ্যমে। সমাজ-সভ্যতার অগ্রসরের ফলে

মানুষকে যেমন নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তেমন করে তার পালিত আচার-সংস্কৃতির অনেক বদল এসেছে। লৌকিক দেবদেবীকে আশ্রয় করে তৈরি হওয়া লোকধর্ম পরবর্তী সময়ে মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের ইতিহাস বহন করে চলেছে। এখানে একটি বিষয়ে আমাদের জানা দরকার যে, আমাদের চারপাশে যে সমস্ত দেবদেবী আছে তাদের সবাই লৌকিক দেবদেবী নয়। আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারে যে সমস্ত দেবতার উপস্থিতি দেখা যায় তার মধ্যে সাধারণত বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক এইভাবে বর্গীকরণ করা হয়। এদের মধ্যে লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব সবার আগে। মানব সভ্যতার প্রথম থেকেই এরা মানুষের সঙ্গেই আছেন। আদিম অরণ্যচারী মানুষের প্রথম পর্যায়ের বাসস্থানের কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। লৌকিক দেবদেবীর থান একইভাবে গ্রামের প্রান্তে, নদীর ধারে, পুকুরের পাড়ে, খেতের আলে বা কোনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এদের মূর্তির ধারণা অনেক পরে এসেছে। প্রাথমিক সময়ে এদের মূর্তিভাবনা ছিল না। মানুষ নানা প্রতীকে এদের পূজো করে এসেছে। এদের পুজোর নির্দিষ্ট কোনো দিন নেই। মানুষ নিজের মতো করে একান্ত আপনভেবে এই সমস্ত দেবদেবীকে পুজো করে আসছে। এই সমস্ত কিছু নিয়েই লৌকিক দেবদেবী আজও সমানভাবে বাংলার লোকায়ত সমাজে পূজিত হয়ে আসছে।

২.১ দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী: সাধারণ পরিচিতি

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, লৌকিক দেবদেবী গ্রামীন মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সাক্ষী। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে মানব সভ্যতার একেবারে প্রথম থেকেই এইসব দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর অবস্থান ও লোকায়ত মানুষের কাছে জনপ্রিয়তার নিরিখে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—

(ক) আঞ্চলিক দেবতা

যে সমস্ত দেবদেবী একটি নামে অর্থাৎ গ্রাম ভেদে যে দেবদেবীর কোনো নামের পরিবর্তন হয় না। অথচ এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবী নানা গ্রামে ও বিরাট এলাকা জুড়ে জাগ্রত অবস্থায় পূজিত হয়ে চলেছেন। এই সমস্ত দেবদেবীকে আঞ্চলিক দেবতা বলা হয়। এই দেবদেবী বছরের বিভিন্ন সময়ে পুরোহিত বা একাধিক উপাসকদের হাতে পূজা পান। এই দেবদেবীরা বিশাল এলাকা জুড়ে বিরাজ

করেন বলেই এদের পুজোর পদ্ধতি নানা রকমের হয়ে থাকে। আসলে লৌকিক দেবদেবীর যে ঐতিহ্য তাতে অঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা তার ছাপ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক দেবদেবীর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- মনসা, শীতলা, পঞ্চানন্দ।

(খ) গ্রাম দেবতা

গ্রাম দেবতা আঞ্চলিক দেবতার মতো বিশাল এলাকা জুড়ে পূজিত হন না। এই সমস্ত দেবদেবী কেবলমাত্র একটি নামে ও একটি গ্রামে বংশপরম্পরায় পূজিত হন এবং এই সমস্ত দেবদেবীর পুজোয় কোনো পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের উপস্থিতি দেখা যায় না, মূলত লোকায়ত মানুষের দ্বারা এই দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে। ফলে গ্রামদেবতার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, এই সমস্ত দেবতা বেশি করে প্রাচীন। এই সমস্ত দেবতার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় দেবদেবীর প্রভাব কম দেখা যায়। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দক্ষিণরায়, ওলাবিবি প্রভৃতি হল গ্রামদেবতা। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেবদেবীর এই শ্রেণি-বিন্যাস সব সময় খুব স্পষ্ট নয়। আমরা গ্রাম্য দেবদেবীর ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক দেবদেবীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে পারি। কিন্তু আঞ্চলিক দেবদেবী যেহেতু অনেকটা এলাকা জুড়ে বিরাজ করেন তাই এই দেবদেবীর ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ও পুরোহিতদের হস্তক্ষেপ সুবিধা হয়। এছাড়াও আমরা দক্ষিণবঙ্গের অনেক দেবদেবী পাব যারা এই দুই ভাগের মধ্যে পড়ে না। এদেরকে আমরা ব্রতের দেবদেবী বলি। বাংলার ব্রত যেমন একেবারে খাঁটি ও তা মেয়েদের নিজস্ব এলাকা, তেমন করে এই সমস্ত দেবদেবী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের দ্বারাই পূজিত হন। দক্ষিণবঙ্গের ব্রতের লক্ষ্মী দেবী এইরকম এক দেবী। এই দেবীর পুজো থেকে শুরু করে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান নারীর দ্বারাই সংগঠিত হয়। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সমস্ত দেবদেবী প্রজন্মের পর প্রজন্ম পূজিত হয়ে আসছেন। এই সমস্ত দেবদেবীকে ঘিরেই মানুষের নানা আচার-আচরণ, উৎসব থেকে শুরু করে অজস্র মৌখিক আখ্যান তৈরি হয়েছে আর এর মধ্য দিয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে আসছে।

২.২ লৌকিক দেবদেবীর থান

আমরা থান বলতে কী বুঝি তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সবার আগে করে নেওয়া প্রয়োজন। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় গ্রাম্য, অঞ্চলিক দেবদেবীর থান দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত লৌকিক

দেবদেবীর আবাস স্থলকে থান বলা হয়। *বাংলার লৌকিক দেবতা* গ্রন্থে গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু থান বলতে বুঝিয়েছেন—

> লৌকিক দেবতার মন্দির, কিন্তু পল্লীর কেহ লৌকিক দেবতার মন্দির বলে না- সকলেই থানই বলে। সাধারণত থানগুলি মাটির তৈরি ও পর্ণ আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। থানের তিন দিক দেওয়াল থাকে, দেবমূর্তির সম্মুখ খোলা রাখা লোকায়ত বিধান। কতকটা উন্নত পল্লীতে শাস্ত্রীয় দেবতার বেলায় অনেকে পাকা বা ইঁটের মন্দির তৈরি করেন কিন্তু তাঁরা ঐতিহ্য অনুসারে লৌকিক দেবতার স্থান পাকা করে না। থানগুলি পল্লীর সাধারণের জমির উপর, কোন বড় গাছের তলায়, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থে নির্মিত হয়- ইহা পল্লী সমাজের নিয়ম।[২]

গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু বলেছেন যে, 'থানা' থেকে থান আসতে পারে। কেননা থানা মানে ঘাঁটি বা আস্তানা। আমরা এই মত সমর্থন করে তাঁর ভাবনাকে একটু বিস্তারিতভাবে পড়তে পারি। আমরা দেখব গ্রামে যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবী পূজিত হন, তারা ওই গ্রাম বা অঞ্চলের ভালো-মন্দের দিক দেখেন। আমরা এর সঙ্গে জানি যে, কোনো কোনো লৌকিক দেবদেবী গ্রাম পাহারা দেন। ফলে থানার কার্যকারিতা ও থানের দেবদেবীর কাজগুলো কোথাও যেন এক রেখায় মিলে যাচ্ছে। আবার লোকসংস্কৃতিবিদ কৃষ্ণকালী মণ্ডল আমাদের জানিয়েছেন—

> মাটির ঢিবি থেকেই স্তূপ কথাটা এসেছে। স্বভাবতই প্রাথমিক অবস্থায় পূজার স্থলগুলি কাঁচামাটির স্তূপ আকৃতির ছিল এবং সেভাবেই পূজা হত। সেই ধারাই বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলায় চলে এসেছে। এই স্তূপ বা ঢিবিগুলোকেই দেবস্থান হিসেবে পবিত্র বলে গণ্য করা হত, আজও হয়। এই থেকেই দক্ষিণবঙ্গে থান কথাটি এসেছে। থান বা দেবস্থান হল দেবতা বা ঠাকুরের অধিষ্ঠান হয়েছে এমন উঁচু বেদী বা ঢিবি। লোকায়ত মানুষ এইগুলিকেই থান বলে।[৩]

তিনি আমাদের এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, এই ঢিবি বা মাটির স্তূপ ধারণাটি বৌদ্ধধর্মের প্রভাবজাত। এই প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কেননা সমাধিকে স্তূপের আকারে পুজো দেওয়া বৌদ্ধধর্মে দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে সাঁচির বৌদ্ধ স্তূপের উল্লেখ করা যায়। এছাড়া বাংলার যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবী আছে তাদের মধ্যে যে বৌদ্ধ প্রভাব কাজ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা জানি যে, পাল রাজাদের সময়ে বাংলায় সব থেকে বেশি বৌদ্ধ প্রভাব পড়েছিল; আর বুদ্ধকে দশাবতার হিসেবে প্রতিপন্ন করার ফলে এই প্রভাব আরও বেশি কার্যকরী হয়। বাংলার দেবদেবী আবাসস্থল দুই রকমের ছিল বলে সুকুমার সেন মনে করেন— 'দেউল' ও 'দেহারা'। এই 'দেহারা' সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন—

> দেহারা দেবগৃহ, অর্থাৎ একটি ঘর, এখন যেমন পুরনো শিবমন্দির দেখা যায়। দেহারা যে পাকাবাড়ি হইতই এমন নহে, খড়ের চালা এখনও অনেক গ্রামে আছে।[৪]

আমরা থান সম্পর্কে উপরের আলোচনায় দেখেছি যে এই দেহারার সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর থানের অনেক মিল আছে। যদিও তিনি দেহারা ও দেউল এই উভয় দেবস্থানের উল্লেখ করেছেন গ্রাম দেবতার প্রসঙ্গে। এই গ্রামদেবতা ও তাদের থান সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—

> অনেকে নিশ্চয়ই জানেন, বাঙলার পাড়াগাঁয়ে সর্বত্রই গ্রামের বাহিরে জনপদসীমার বাহিরে 'থান' বা 'স্থান' বলিয়া একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকে; কোথাও কোথাও এই 'থান' উন্মুক্ত আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায়; কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা তাহার উপর একটা আচ্ছাদনও দেয়। এই 'থান' বা স্থানে- সংস্কৃতরূপে দেবস্থানে বা দেওথানে- মূর্তিরূপী কোনও দেবতা অধিষ্ঠিত কোথাও থাকেন, কোথাও থাকেন না, কিন্তু থাকুন বা না-ই থাকুন, সর্বত্রই তিনি পশু ও পক্ষী বলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা তাহার নামে 'মানৎ' করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ভয়ভক্তি করেন, এবং যথারীতি তাঁহাকে তুষ্ট রাখার চেষ্টাও করেন সকলেই।[৫]

এইখানে একটি বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই লৌকিক দেবদেবীর থান কোথাও গ্রামের ভিতরে হয় না। তিনি এখানে অনার্য দেবদেবীর আবাসস্থলকে গ্রামের বাইরে রাখার রাজনীতিকে বুঝতে চেয়েছেন। তিনি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন কেন এই সমস্ত দেবদেবীর থান জনপদের বাইরে হয়। কিন্তু লৌকিক দেবদেবীর বহু থান গ্রামের মধ্যে দেখা যায়।

থানের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ* গ্রন্থে বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেছেন—

> লৌকিক দেবতাদের পূজার নির্দিষ্ট স্থান। সব সময়েই বাসগৃহ থেকে কিছু দূরে রাস্তার পার্শ্বে, মাঠের কোণে, ঝোপের আড়ালে, বৃক্ষের গোড়ায় ইত্যাদি স্থানে এই থানের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শিলাখণ্ড, পোড়ামাটির পাত্র, সরা, প্রদীপ, ছলন প্রভৃতি থানে পড়ে থাকতে দেখা যায়।[৬]

আবার জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*-এ থান সম্পর্কে বলেছেন—

> থান সংস্কৃতি স্থান ও হিন্দি আস্থান থেকে এসেছে।[৭]

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংকলিত *বাঙ্গালা শব্দকোষ*-এ থান সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> গ্রাম্য অশিক্ষিত নরনারীর ভাষায় দেবতার থাকার জায়গাকে থান বলা হয়।[৮]

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান-এ থান সম্পর্কে বলা হয়েছে—

পীঠস্থান, তীর্থস্থান, নিকট, ঠাঁই।[৯]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ থান সম্পর্কে বলেছেন—

দেবতার অধিষ্ঠিত স্থান।[১০]

উপরের আলোচনার মাধ্যমে থান সম্পর্কে বলা যায় যে, খোলা আকাশের নীচে, গ্রামের প্রান্তে বা রাস্তার ধারে কাঁচা বা পাকা কোনো লৌকিক দেবদেবীর আস্তানাকে থান বলা হয়। দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর যে সমস্ত থান আছে তার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখে নেব—

(ক) সাধারণত থানগুলি খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করে।

(খ) কিছু কিছু থান কোনো গাছের তলায় বা গাছের উপরেও থাকে। তাছাড়া ঘন বনজঙ্গল বা ঝোপঝাড়ের মধ্যেও কোন লৌকিক দেবদেবীর থান থাকতে পারে।

(গ) থানগুলি সাধারণত রাস্তার ধারে বা গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত হয়।

(ঘ) থানের পাশে একটি গাছ বা পুকুর থাকা প্রায় অনিবার্য শর্ত।

(ঙ) কোনো কোনো জায়গায় একটি মাটির স্তূপ বা ঢিবিকে থান হিসেবে পুজো করা হয়।

(চ) থানগুলি প্রাকৃতিকভাবেই বিরাজ করে অর্থাৎ থানগুলিকে প্রতিদিন পরিষ্কার বা পুজো দেওয়া হয় না। সপ্তাহের বা বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে থানকে পরিষ্কার করা হয়। আপাতভাবে থানগুলোকে দেখে মনে হতে পারে যে এই লৌকিক দেবদেবীদের কেউ ভালোবাসে না।

(ছ) থানে দেবতার মূর্তি থাকতেও পারে আবার নাও পারে। কোনো কোনো থানে দেবতার মূর্তি হিসেবে এক খণ্ড পাথর বা মাটির ঢেলা পূজা করা হয়।

(জ) থানগুলি এককভাবে বা একত্রিতভাবে অবস্থান করে।

দক্ষিণবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থা এই অঞ্চলের দেবদেবীর পূজার একটি বিশেষ কারণ হিসেবে ধরা হয়। জল-জঙ্গল-সমভূমি প্রধান লবণাক্ত ও উর্বর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বহু জনজাতির একত্র

সহাবস্থান এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করছে। এছাড়া এই এলাকার সঙ্গে যুক্ত গঙ্গারিডি সভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। নগর কলকাতা কাছাকাছি অবস্থানের জন্য এই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রতিনিয়ত নগরের নানা প্রভাব পড়ে। ফলে এই অঞ্চলে আমরা যেমন ঐতিহ্য পতনের শব্দ শুনতে পাই তেমনি জায়মান সংস্কৃতির নানা চিহ্ন এই এলাকার সাংস্কৃতিক পরিসরে বহন করতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের মানুষের দৈবচেতনা, দেবদেবীর স্বরূপ, তার আবাসস্থল ও প্রতিদিনের পালিত আচার-অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই অঞ্চলের আঞ্চলিক বিশেষত্ব। এই অঞ্চলের দেবদেবীর উৎসমূলে রয়েছে এখানকার লোকায়ত মানুষের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার প্রবল বাসনার চাপ। সুস্থ-স্বাভাবিক-সুন্দর-উন্নত জীবনবোধের জন্য এখানকার মানুষ দেবদেবীর পুজোয় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে। এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ আরহণ। আর স্বাভাবিকভাবেই এলাকার মানুষ এই জীবিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের দেবদেবীকে। আমরা এই আঞ্চলিক, গ্রাম দেবতার থানগুলোকে মানুষের প্রতিদিনের রুটিরুজির স্থানে দেখতে পাই। যেমন জেলে ও মৌলেরা জঙ্গলে মধু ও মাছ আনার জন্য যেমন গ্রামের মধ্যে বা রাস্তার ধারে বনবিবির থান তৈরি করে আবার জঙ্গলেও বনবিবির থান তৈরি করে। আবার ক্ষেত্রপালের থান খেতের পাশে কোনো উঁচু জমিতে দেখতে পাওয়া যায়। এই একই কারণে মাকাল ঠাকুরের থান পুকুর থেকে মাছ তোলার সময় পুকুরের পাড়ে অস্থায়ীভাবে তৈরি হতে দেখা যায়। যদিও আমরা জানি এই দৈব-ভাবনার গভীরে আছে ঐন্দ্রজালিক বাতাবরণ, ভয়-ভীতি, মঙ্গলকামনা, স্বার্থসিদ্ধি ও মনের নানা গোপন বাসনা। দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী মূলত কৃষিদেবতা, বনদেবতা ও সংস্কৃতি সহায়ক দেবতা। যদিও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত দেবদেবী সম্পর্কে এই কথা বলা যায়। আমাদের এই আলোচনায় আর্য-নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত, পুরাণ নির্ভর দেবদেবী ও তাদের থানকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রীয় দেবদেবীকে আলোচনায় বাদ দেওয়ার কারণ হল, আমরা অনেক লৌকিক দেবদেবীর থানকে মন্দিরে উন্নীত হতে দেখব। সেক্ষেত্রে আমরা গুলিয়ে ফেলি শাস্ত্রীয় ও লৌকিক দেবদেবীর থানকে। কিন্তু আমরা যদি একটু ভালো করে লক্ষ করে দেখি তাহলে দেখব যে, লৌকিক দেবদেবীর থান মন্দিরের আকার নিলেও লোকায়ত মানুষ সেই মন্দিরকে থানই বলে থাকে। আবার ওই মন্দিরের রূপ নেওয়া থানের পাশেই আদি থানকে সযত্নে রাখা হয়। যেখানে বাৎসরিক পুজোর প্রথমেই পুরানো

থানে পুজো দেওয়া হয়; আর নাহলে সেই পুরানো থানের উপর নতুন মন্দিরটি তৈরি করা হয়। ফলে আমাদের আলোচনা সেই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর ও তাদের থানকে নিয়ে, যারা মাটির পৃথিবীর মধ্যে বাস্তব জগতে বংশপরম্পরায় বা লোকপরম্পরায় প্রচলিত বা প্রচারিত জনশ্রুতি, লোকশ্রুতি আর অনুমিত ধারণা-বিশ্বাস-শ্রদ্ধায় বিরাজমান। এই যে সমস্ত দেবতা আমরা পাব তাঁরা দৈবগুণে নয়, মানবিক গুনে বেশী গ্রহণযোগ্য। এই অঞ্চলের মানুষের অনুরোধ, প্রার্থনা, আবদার, অভিযোগ-সবই এই সমস্ত দেবতার চরিত্র নির্মাণে প্রতিফলিত হয়।

২.৩ নির্বাচিত থানের উদ্ভব ও বিবর্তন

দক্ষিণবঙ্গের থানগুলির উৎপত্তি ও তার বিবর্তনের ইতিহাস মোটামুটি একই রকম। এখানকার বেশিরভাগ থান জঙ্গলকাটির সময় তৈরি হয়েছে। বাংলার এই অঞ্চলে মানুষ প্রথম যখন বন কেটে বসতি তৈরি করে সেই সময়ে তারা নানা ধরনের পাথর ও কিছু মূর্তি পায়। মানুষ জল-জঙ্গল ও নানা বিপদের থেকে বাঁচার জন্য এই পাথর ও মূর্তিকে দেবদেবী হিসেবে পুজো করতে শুরু করে। আর সেই পুজোর স্থানে তৈরি হয় নিতান্ত প্রাকৃতিকভাবে দেবদেবীর থান। মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি তৈরি করার সময় এই থান তৈরি হয়েছে বলে একে জঙ্গলকাটির থান বলা হয়। সুন্দরবন সংলগ্ন এই বিস্তীর্ণ এলাকায় আগমন হয়েছে বিভিন্ন জনজাতির মানুষ। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসার সময় এই সমস্ত জনজাতি বয়ে আনে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আমরা জানি কোল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি আদিবাসীরা নিজেদের ঐতিহ্য আজও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে লালনপালন করে চলেছে। এই নানা জনজাতি নিম্নবঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করে ও তাদের পূজিত দেবদেবীকেও তারা সঙ্গে নিয়ে আসে। এই সমস্ত মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অসুবিধা থাকলেও তাদের পূজিত দেবদেবীর থান তৈরি করতে ভুলে যায়নি। এই থান নির্মাণে কোনো শৈল্পিক মানসিকতার ছাপ দেখা যায় না। খোলা আকাশের নীচেই একটুকরো জায়গা পরিষ্কার করে বা কোনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে এই দেবদেবীর থান দেখা যায়। আসলে এই সময়ে মানুষ লড়েছে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। সেই লড়াই ছিল মানুষের প্রতিদিনের বাঁচার লড়াই। শিল্প চেতনা সেখানে স্থান পায়নি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বাঁচার অনুকূল পরিবেশ পেল। অনুভুতির জগত ও বাস্তব জগত সময় পেল কাছাকাছি আসার। মানুষের মনে জাগ্রত হল শিল্প চেতনা। এই অনুকূল পরিবেশে মানুষ তাদের পূজিত দেবদেবীর মূর্তিভাবনা নিয়েও যেমন

চিন্তিত হল একই সঙ্গে তার স্থায়ী আস্থানা বা থান নির্মাণের ভাবনা মাথায় এল। থান নির্মাণের এই চলন কেবলমাত্র বাংলার এই অঞ্চল সম্পর্কে বলা চলে না। এই চলনকে আমরা সমস্ত মানব জাতির থান নির্মাণের চলনের সঙ্গে পাঠ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে *সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ও বাংলার লৌকিক সংস্কৃতি* গ্রন্থে সোমা মুখোপাধ্যায় বলছেন—

> একেবারে গোড়ার দিকে লোকমাতৃকাদের মূর্তি বলতে কিছু ছিল না। এই না থাকার একটা সঙ্গত কারণও ছিল এই যে এঁরা কল্পিত হয়েছিলেন ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকে। যাঁরা এঁদের কল্পনা করেছিলেন তাঁদের নিজেদের জীবনই ছিল এমন অস্থির যা সুষ্ঠ মূর্তি রচনা করে তাঁদের আরাধনা করার মতো অবকাশ হয়তো ছিল না। দেবতারা ছিলেন তাঁদের থেকে বহুদূরের বস্তু, যাঁদের অলৌকিক ক্ষমতায় পৃথিবীর অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়। এই কারণেই আদিতে এই লোকমাতৃকারা সবাই বিমূর্ত। এরপর ধীরে ধীরে বদলাতে লাগল সময়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শিখল কৃষিকাজ, করলো স্থায়ী বসতি। পশুচারণ ও যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে প্রবেশ করল সংসার জীবনে। জীবনের প্রতিটি দিক সাজানোর সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরও অবয়ব তৈরির চেষ্টা করল মানুষ।[১১]

সোমা মুখোপাধ্যায়ের এই কথা কেবলমাত্র লোকমাতৃকার মূর্তিভাবনা সম্পর্কে বলা যায় না। এই কথা আমরা থানের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারি। কেননা এই বিমূর্ত শক্তিগুলো শৈল্পিক রূপ পেল মানুষের অবস্থা বদলের সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক তেমনভাবে এই দেবতাদের মূর্তিগুলো জল-জঙ্গল, রাস্তা-ঘাটে উন্মুক্ত পরিবেশ থেকে ছাউনিযুক্ত ঘরে আশ্রয় পেল মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলেই।

আদিগঙ্গা ও সুন্দরবন লাগোয়া অঞ্চলে থানের উৎপত্তি ও বিবর্তনের আরও বেশ কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় কোনো ব্যক্তির স্বপ্নাদেশ পাওয়ার ফলে থানের উৎপত্তি। বারুইপুরের ধপধপির দক্ষিণরায়ের থানের উৎপত্তি ও বিবর্তনের কাহিনি বর্ণনা করলে আমাদের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ধপধপির এই থানের সেবায়েত সুমন্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের থেকে জানতে পারি যে, এক সময় ওই অঞ্চল জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। মানুষ বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করে জমিদার মদনমোহন চৌধুরীর অধীনে। এখন যেখানে মন্দিরটি আছে সেখানেও এক সময় জঙ্গলে পূর্ন ছিল। জমিদার একদিন ভ্রমণ বা খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে গ্রামে যাওয়ার সময় ওই স্থানে প্রাতকর্ম করেন। জমিদারের এই কাজের জন্য তাকে নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। এবং রাত্রে তিনি দক্ষিণরায়ের স্বপ্নাদেশ পান যে, দক্ষিণরায় এই স্থানে বিরাজ করেন। এই জমিদার যেন ওই স্থানে তার প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণরায়ের থান তৈরির ইতিহাস

মোটামুটি এইরকম। আমরা বাংলার থানের উৎপত্তির ইতিহাসে এই কাহিনি অজস্র দেখতে পাব। এই সমস্ত কাহিনিতে মূলত দেখা যায় থানগুলি তৈরি হচ্ছে দৈব আদেশানুসারে। আবার কোথাও আমরা দেখতে পাব দৈবকোপে কেউ কেউ থান তৈরি করে দিচ্ছেন। এছাড়াও আমরা থানের উৎপত্তিতে আরও নানা ধরনের কাহিনি পাব। আমরা সবাই জানি আমাদের আলোচ্য থানের দেবদেবী বেশিরভাগই হচ্ছে অনার্য দেবদেবী। এছাড়া এই সমস্ত দেবদেবী কৃষিসভ্যতার চিহ্ন বহন করছে। লৌকিক দেবদেবীর কাহিনি সেই কৃষিসভ্যতার স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনি আমরা আলোচনা করতে পারি। আদিগঙ্গার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে আমরা বেশ কিছু কাহিনি পাই যেখানে বলা হয় যে, গ্রামের কোনো গৃহস্থের গরুকে পাওয়া যায় না দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়। এছাড়া আর একটি আশ্চর্যের ঘটনা হল গরুর দুধ পাওয়া যায় না। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলতে থাকার পর আবিষ্কার হয় গরুটি ওই নির্দিষ্ট সময় গ্রামের একটি স্থানে নিজের বাঁট থেকে দুধ দান করছে দিনের পর দিন। এই ঘটিনা জানাজানির পর যথারীতি গৃহস্থ স্বপ্নাদেশ পান ঐ স্থানে কোনো দেবদেবী অবস্থান করছেন! গৃহস্থ যেন ওইখানে একটি থান তৈরি করে দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে এইভাবে তৈরি হয়েছে অসংখ্য থান। এই কাহিনির মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া বেশিরভাগ থানই হল শিবের থান। এই শিব কিন্তু কোনো শাস্ত্রীয় দেবতা নয়। এই শিব লৌকিক শিব। লৌকিক শিব বলার কারণ এই শিবের উৎপত্তি হল কৃষিদেবতা হিসেবে। গরুর মাটিতে দুধ দান করা একই সঙ্গে ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-সভ্যতার কথা আমাদের মনে করায়। বাংলার বহু জায়গায় এইভাবে অস্থায়ীভাবে বহু থান তৈরি হয়েছে। এই শিবের থান প্রাথমিক পর্যায়ে কোন ঘেরাটোপের বা ছাউনির মধ্যে থাকেনি, খোলা আকাশের নীচে দিনের পর দিন তিনি পূজিত হয়ে আসছেন। পরে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাঁচা বা পাকা থানে আশ্রয় পান। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস বলেছেন যে—

> এ রকম অস্থায়ী দেবস্থলই হয়তো প্রাচীন মন্দির গড়ার ব্যবস্থা হয়তো পরবর্তীকালের ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে গ্রামবাসীরা যখন দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেবার কথা ভেবেছে, গ্রামবাসীরাও বিভিন্ন সময় দেবতা পূজার আয়োজন করতে চেয়েছে। তখন স্থায়ী দেবস্থল নির্মাণের কাজটি শুরু হয়েছে।[১২]

আমরা থানের ক্রম বিবর্তনের ধারায় দেখতে পাব যে, থানগুলি প্রথমে গাছের তলায়, খোলা আকাশের নীচে নিতান্ত প্রাকৃতিকভাবেই পড়ে থাকত। এরপরে এসেছে খড়ের চাল ও বাঁশের কঞ্চির সঙ্গে কাদা

মাটি দিয়ে দেওয়াল ঘেরা থান। সময়ের ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খড়ের চালের বদলে এসেছে টালি বা টিনের ছাউনি যুক্ত থান। যদিও এই পর্বে থান তৈরিতে বেশ কিছু প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহৃত হত। সব শেষে আমরা দেখতে পাব যে ইঁট, কাঠ ও পাথরের দিয়ে তৈরি পাকা থান। আমাদের মনে রাখতে হবে থান তৈরিতে প্রাকৃতিক উপাদান কমে যাওয়া যতটা না যন্ত্রসভ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে তার থেকে বেশি বাংলার এই অঞ্চলের জলবায়ুর ও তার ভৌগোলিক অবস্থান দায়ি। মানুষ যখন এই জল-জঙ্গলযুক্ত অরণ্যময় অঞ্চলে বসবাস শুরু করে; এই পর্বে তার বাসস্থান নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্থায়ী হতে পারেনি। তাই প্রাথমিক ভাবে দেখা যায় থানগুলি একেবারে বাড়ির পাশে বা গ্রামের রাস্তার ধারে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে দেখতে পাওয়া যেত। এই ছাউনিবিহীন থান একদিক থেকে যেমন মানুষের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা জানান দেয়; আবার তেমনি এইসব জনজাতিদের আদিম কৌম জীবনযাপনের চালচিত্র হিসেবে এটিকে দেখা যেতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথমে খোলা আকাশের নীচে থান থেকে মাটির কুঁড়ে ঘরে দেবতার স্থান হয়েছে। ঠিক যেমন করে অরণ্যচারী মানুষ প্রকৃতির উন্মুক্ত কোল থেকে লতাপাতা কাঠকুটো দিয়ে নিজেদের আশ্রয় করে নিয়েছে প্রকৃতির আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। দক্ষিণবঙ্গে মাটির দেওয়াল ও পাতার ছাউনি দেওয়া থান আমরা প্রথম পর্বে দেখতে পাই। কারণ এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু। জল-জঙ্গলময় এই এলাকায় পাথরের অভাবের জন্য মানুষ নিজের বাসস্থান ও দেবস্থান নির্মানে মাটির উপর বেশি নির্ভর করেছে। প্রকৃতি থেকে এই থান নির্মাণে যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করেছে। আমরা লৌকিক দেবদেবীর থান প্রথম পর্বে দেখব যে এই থান একদম মাটির কাছাকাছি; অর্থাৎ বর্তমানের মতো করে থানকে উঁচুতে ও গগনচুম্বী করে তোলেনি। থানকে মাটির থেকে উঁচুতে রাখা এই দেবদেবীর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পরিচায়ক। এই পাকা থান বা মন্দির নির্মাণে স্থায়ীত্বের প্রশ্ন আমাদের নজর এড়ায় না। নদীমাতৃক এই এলাকায় ঝড়, বৃষ্টি ও বন্যা মানুষের নিত্য সমস্যা। তাই মানুষ তাদের ধর্মের পরিসরকে স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছে। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি যে পাকার থান তৈরি হয় কতগুলি উপাদানের নিরিখে। প্রথমেই বলা যায় একটি চাতালকে মাটি দিয়ে উঁচু করে তাকে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। পরে এই সিমেন্টে লাল রং করা হয় বেশিরভাগ জায়গায়। এই থানে কিন্তু কোনো ছাদ থাকে না, বড়জোর মাটি থেকে হাত দু'য়েক পাকার

দেওয়াল দেওয়া হয়ে থাকে। এরপর আমরা দেখতে পাব তিন দিক একটি ইঁটের গাঁথুনি দেওয়া ও টালি বা টিনের ছাদযুক্ত থান। এই থানের সামনে দিক বাঁশের বা শক্ত কাঠ পরপর বসিয়ে ঘেরা থাকে। তবে এই থানের সামনে কোনো পাকার চাতাল থাকে না ভক্তদের জন্য। মাটির তৈরি উঠোনেই ভক্তরা বসে পুজোর সময়। এই সমস্ত থানে পাথরের ব্যবহার তেমন দেখা যায় না। এরপর আমরা দেখতে পাই ইঁট, বালি, সিমেন্টের দেওয়াল দেওয়া ও মেঝে কোথাও সিমেন্ট বালি দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার কোথাও টাইলস বসিয়ে ঝকঝকে মেঝে করা হয়েছে। এই থানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মূল থানের সঙ্গে একটি বারান্দা থাকে। মূল মন্দিরে দরজা থাকে ও বারান্দায় গ্রীল বসানো থাকে। এই থানে বাংলার মন্দির শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। বাংলার মন্দির শিল্পের প্রভাব থেকে এই সমস্ত থান যে নির্মাণ করা হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেননা এই থানে উপরে ধ্বজা ও নিশান দেখা যায়। কিন্তু আমরা এই থানকে মন্দির বলবো না। কেননা যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবী থান থেকে মন্দিরে উন্নীত হয়েছে আমরা একটু লক্ষ করলে দেখতে পাব যে সেই মন্দিরেও আদিম কৌম, নানা জনজাতির পূজিত দেবদেবীর থানের স্বাক্ষর বহন করে। আমরা জানি কৌমের, গোষ্ঠীর দলগত পরিচয় বহন করে তাদের পূজিত নানা পশুপাখির ধ্বজা। এই ধ্বজাই এক একটি দলের পরিচয়ের চিহ্ন বহন করে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে যখন নান্দনিক ভাবনা বিভিন্ন শিল্পের রূপ নিল, বিমূর্ত ধারণা থেকে দেবদেবীর মূর্তি ধারণা এল, তৈরি হল থান থেকে মন্দির। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের জন্য প্রাচীন, অনার্য গোঠীর পূজাচার ও দেবদেবীর থানের বদল ঘটলেও এই ধ্বজের নমুনা আজও আমরা মন্দিরের উপরে দেখতে পাব। এই বিষয়টিকে আরও বিশদে বলেছেন নীহাররঞ্জন রায়—

> এক এক কোম বা গোষ্ঠীর এক এক পশু বা পক্ষীলাঞ্ছিত ধ্বজা; সেই ধ্বজার পূজাই বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কোমগত পূজা এবং তাহাই তাঁহাদের পরিচয়; সেই কোমের যিনি নায়ক বিশেষ বিশেষ লাঞ্ছন অনুযায়ী তাঁহার নাম তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বা হংসধ্বজ। এই ধরনের পশু বা পক্ষীলাঞ্ছিত পতাকার পূজা আদিম পশুপক্ষী হইতেই উদ্ভূত; বহু পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবীর রূপকল্পনায় তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। প্রমাণ, আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন, দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচক, সরস্বতীর বাহন হংস, ব্রহ্মার বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম, সমস্তই সেই আদিম পশুপক্ষী পূজার অবশেষ। আদিম কোমগত পূজার উপর ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সঙ্গে এই সব পশুপক্ষীরাও আজও আমাদের পূজা লাভ করে সন্দেহ কী? দেবদেবীর মূর্তিপূজার সঙ্গে এই সব ধ্বজাপূজার প্রচলন সুপ্রাচীন। দেবী বা মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভের উপর বা মন্দিরের চূড়ায় উড্ডীয়মান ধ্বজা বা কেতনের

পূজা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে বেশনগরের (মান্দাশোর, মধ্যভারত) সেই গরুড়ধ্বজ, তালধ্বজ, মকরকেতন প্রভৃতির পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার চড়কপূজা, ধর্মপূজা, অশ্বত্থ ও অন্যান্য বৃক্ষপূজা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে কোনও ধর্মকর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজা ছাড়া অনুষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা চলে। সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত জুড়িয়া ধর্মস্থান বা 'থানে'র সঙ্গে ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।[১৩]

আমরা সহজেই বুঝতে পারি বর্তমানে যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর থান মন্দিরের রূপ নিয়েছে তা আসলে আর্যীকরণের ফলেই হয়েছে। যদিও খোলা আকাশের নিচ থেকে আজকের থানের এই যে বিবর্তন তা কেবলমাত্র আর্যীকরনের মধ্য দিয়ে হয়নি। কোনো জায়গায় বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ তাদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বা নিজেদেরকে সচেতনভাবে অন্যের প্রভাব এড়িয়ে চলতে থাকলেও পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদানকে কোনভাবেই আটকে রাখতে পারে না। একে অপরের সংস্কৃতিক প্রক্ষেপ পড়তে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে আমরা আবার নীহাররঞ্জন রায়ের মতকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি-

ধর্মকর্ম ভাবনা ও সংস্কার বর্ণ, শ্রেণি ও কোমভেদে পৃথক; একই কালে একই বিশ্বাস বা একই পূজা ইত্যাদির রূপ সমাজের সকল স্তরে এক নয়, বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশখণ্ডে তো নয়ই। তা ছাড়া, নূতন কোনও বিশ্বাস বা সংস্কার বা পূজানুষ্ঠান ইত্যাদি সমাজে সহসা প্রচার লাভ করে না; তাহার প্রত্যেকটির পশ্চাতে বহুদিনের ধ্যান ও ধারণা, অভ্যাস ও সংস্কার লুকানো থাকে, এবং সমাজের ভিতরে ও বাহিরে নানা গোষ্ঠী, নানা স্তর, নানা কোমের ভক্তি-বিশ্বাস-পূজাচার প্রভৃতির যোগাযোগের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাসও আত্মগোপন করিয়া থাকে; কালে কালে সেই ইতিহাস বিবর্তিত হইয়া সমসাময়িক কালের রূপ গ্রহণ করে মাত্র, এবং তাহাও একান্তই সমসাময়িক সমাজ-ভাবনা ও চেতনানুযায়ী, সমসাময়িক সামাজিক শ্রেণী ও স্তর বিশেষ অনুযায়ী। কোনও শ্রেণীগত বা কোমগত বিশ্বাস বা সংস্কারই আবার একান্তভাবে সেই শ্রেণী বা কোমের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকে না; অন্যান্য শ্রেণী ও কোম, স্তর ও উপস্তরের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগের ফলে এবং সেই যোগাযোগের শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী এক শ্রেণী ও কোমের, স্তর ও অংশের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্য শ্রেণী ও কোমে, স্তর ও অংশে সঞ্চারিত হয়, এবং দ্রুত বা দীর্ঘ মিলন-বিরোধের ভিতর দিয়া অনবরতই নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা, ভক্তি-বিশ্বাস অনুষ্ঠান-উপাচার প্রভৃতি সৃষ্টি লাভ করিতে থাকে। যে শ্রেণী বা কোমের আত্মিক ও ব্যবহারিক শক্তি বেশি সেই শ্রেণী বা কোমের ধর্মকর্মগত জীবন অধিকতর সক্রিয়, এবং তাহারা যেমন অন্য শ্রেণী ও কোমের ধর্মকর্মগত জীবনকে বেশি প্রভাবান্বিত করে, তেমনই নিজেরাও সে জীবন দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, দুইই একই সঙ্গে সমান গতিতেই চলে এবং সমন্বয় চলিতে থাকে স্থূল লোকচক্ষুর আড়ালে একটা জটিল সমন্বয়ের দিকেই সমানেই চলিতে থাকে।[১৪]

বাংলায় বিভিন্ন রাজশক্তির রাজত্বকালে লোকায়ত সমাজ-সংস্কৃতির উপর তারা আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং সেই ইতিহাস আমাদের সবার জানা। পাল, গুপ্ত শাসনকালে বাংলায় এই অঞ্চলে

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিস্তার ঘটেছিল। এই ব্রাহ্মণ্যবাদ লোকায়ত সমাজ-সংস্কৃতিকে নিজের আদলে সাজানোর চেষ্টা করে। বিশেষত লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি থেকে শুরু করে তার থানকে এরা নিজেদের মত করে সাজিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজের আধিপত্যের কথা বিস্তার করে। লৌকিক দেবদেবী মনসা, শীতলা, পঞ্চানন্দ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেবদেবীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি তাদের সঙ্গে কোনো শাস্ত্রীয় দেবদেবীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে সেই আধিপত্যের মানসিকতাই প্রকাশ পায়। আর এইভাবেই লৌকিক দেবদেবীর আর্যীকরণ হয়েছে। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে থানগুলি নিজের স্বরূপ নিয়েই বিরাজ করে দিনের পর দিন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ্যবাদ সেই থানগুলির মৌলিক কিছু পরিবর্তন করে দেয়। গ্রাম্য দেবদেবীকে যেমন তারা নিজেদের মধ্যে নিয়ে আসে ঠিক তেমন করে তাদের আবাস স্থলকেও নিজেদের দেবদেবীর আবাসস্থলের অনুকরণে সাজাতে থাকে। এর মধ্য দিয়ে আসলে তাদের গ্রাম্য, লৌকিক দেবদেবীকে তথাকথিত সভ্য করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই দেবদেবী ও তাদের থান যে কোনো গ্রামের ভিতরে হতে পারে না তা এই সভ্য মানুষরা বারেবারে তার বিধান দিয়েছেন। আমাদের এই মতকেই সমর্থন করে নীহার রঞ্জন রায়—

> গ্রামের ভিতর বা লোকালয়ে তাঁহার কোনও স্থান নাই। 'গ্রাম-দেবতা' সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাঙলায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথাও বা অন্য কোনও স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি-তন্ত্রেরই হউন, সংশয় নাই যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক্-আর্য আদিম জনগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা। আদিবাসীদের এই সব গ্রাম্য দেবতাদের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ; মনু তো বারবার এই সব দেবতার পূজারীদের পতিতই বলিয়াছেন। কিন্তু কোনও বিধান, কোনও বিধিনিষেধই ইঁহাদের পূজা ঠেকাইয়া রাখিতে আজও পারে না, আগেও পারে নাই। ইঁহাদের কেহ কেহ ক্রমশ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মেকর্মে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, এমনও বিচিত্র নয়। শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানাপ্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; দুই চারি ক্ষেত্রে তাহাদের কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।[১৫]

গ্রাম্য লোকায়ত সমাজের একটি নিজস্ব সংস্কৃতির উপাদানকে এইভাবেই আমরা হারিয়ে যেতে দেখি। প্রাচীনকাল থেকে আমরা শাস্ত্রীয় দেবতার স্থানকে দেবগৃহ, দেবায়তন, দেবালয় হিসেবে পাচ্ছি বিভিন্ন মাহাকাব্য ও অর্থশাস্ত্রতে। একইভাবে আমরা এই লৌকিক দেবদেবীর থানও কোথাও কোথাও এই শব্দবন্ধ দিয়ে উচ্চারিত হতে দেখি। উত্তর ভারতে মন্দিরকে প্রাসাদ বলা হত। গুপ্তযুগের বিভিন্ন

শিলালিপিতে আমরা তার প্রমাণ পাই। দক্ষিণ ভারতে মন্দিরকে আমরা বিমান বলতেই বেশি শুনি। ‘বিশ্বকর্মাপ্রকাশে’ মন্দির সম্পর্কে বলা হয়েছে, পাথর দিয়ে তৈরি গৃহ। পরবর্তী সময়ে অর্থের উন্নতি ঘটে ও দেবতার গৃহ অর্থে মন্দির শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি উত্তর ভারতে মন্দির নির্মাণে পাথরের ব্যবহার বেশি ছিল। কারণ সেখানে পাথর বেশি পাওয়া যেত। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এই পাথরের অপ্রতুলতা ছিল বরাবরই তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। বাংলায় নবম শতাব্দী নাগাদ গুপ্ত রাজাদের আমল থেকে শিখররীতির মন্দির নির্মাণের রীতি চালু হতে থাকে। পাল ও সেন যুগে এই রীতি আরও বিস্তার লাভ করে ও বাংলার লৌকিক দেবদেবীর থানকেও তা প্রভাবিত করে। এরপর সুলতানী আমল শুরু হলে এই মন্দির নির্মাণের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে আসে। এই সময়ে মাজার তৈরির প্রবণতা আমরা বেশি করে দেখি। এই সময় বিভিন্ন বিবিমা যেমন করে হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে তেমনি মাজাররীতি লৌকিক দেবদেবীর থানকে প্রভাবিত করে। গাজী, পির-পিরানীদের মূর্তি-ভাবনা লৌকিক দেবদেবীদের মূর্তিতে প্রভাব ফেলে। আবার মাজার ও ঢিবির আকারে লৌকিক দেবদেবীর থান হতে দেখা যায়। আমরা দেখতে পাই আর্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিসরে দেবতা ও মন্দির নানা দর্শনের মধ্য দিয়ে উচ্চস্তরে অবস্থান করে। মাটির কাছাকাছি তারা খুব একটা ধরা দেয় না। শাস্ত্রীয় দেবদেবীকে পেতে গেলে নানা কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে এই দেবতাদের মন্দির সুউচ্চ ও নানা নান্দনিক অলংকরণের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে বিস্ময় সৃষ্টিকারী হিসেবেই থেকে গেছে। বাংলার এই সমস্ত অঞ্চলে মন্দির নির্মাণে দেখি মাটি ছুঁয়ে চলার প্রবণতা। এই সমস্ত দেবদেবীরা পাকার থানে আশ্রয় নিলেও তা কোনো উচ্চমার্গীয় শিল্পকলার মধ্য দিয়ে না। এই প্রসঙ্গে নীহার রঞ্জন রায় জানান—

> বস্তুত প্রাচীন বাঙালীর স্থাপত্য ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠননৈপুণ্যের পরিচয় বেশি নাই; গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে সে সুযোগ ছিল অল্পই, স্থাপত্যেই শুধু নয়, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় নাই, খুব প্রশস্ত ও গঠনকার্যে নিজের প্রতিভাবে নিয়োজিত করে নাই।[১৬]

আসলে এই অঞ্চলের মানুষ নিজেদের দেবতাকে দূরের, কোনো অলৌকিক সত্তা বলে ভাবেনি। নিজের পরম আরাধ্য দেবদেবীকে নিজের প্রতিদিনের যাপনের সঙ্গে এক করে দেবতাকে স্থান দিয়েছে। আর এই জন্য নিজের প্রতিদিনের খাওয়ার কিছু অংশ উপাচার হিসেবে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে

দেখি। মাছ, মাংস থেকে মদ-গাঁজা আমারা এই লোকায়ত দেবদেবীর পূজার উপকরণ হিসেবে দেখতে পাই। জল-জঙ্গলের মানুষ যেমন দুইচালা বা আটচালা ঘরে বাস করেছে। তাদের পূজিত দেবদেবীর থান ঠিক তার আবাসস্থলের মত করেই তৈরি করেছে। এই যে দুই থেকে আটচালা মন্দির বা থান তৈরি করে করেছে তা মূলত বৃষ্টি ও ঝড়ের হাত থেকে তাদের দেবদেবীকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। কেননা এই সমস্ত থানের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্নিস বা শীর্ষ নীচের দিকে বাঁকানো। বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে এই নির্মাণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সমস্ত লোকায়ত মানুষ শ্রদ্ধায় নত হয়ে ও নিজের সুরক্ষার জন্য এই গ্রাম্য দেবদেবীকে পুজো করে এসেছে। তাই আমরা এই সমস্ত দেবদেবীর থান যত্রতত্র নিতান্তই প্রাকৃতিকভাবে দেখা যায়।

দক্ষিণবঙ্গের থানগুলি মন্দিরে উন্নীত হওয়ার পিছনে নানা কারন দেখা যায়। থান থেকে মন্দিরে পরিণত হওয়ার পিছনে মানুষের ব্যক্তিগত যশ, সমাজে প্রতিষ্ঠা ও কায়েমি স্বার্থ কাজ করে গেছে। আমরা কয়েকটি লৌকিক দেবদেবীর থানের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করব। জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষ প্রথম এইসব বাদাবনে বসতি স্থাপন করে কোনো জমিদারের নির্দেশে। জলজঙ্গলের বাঘ, কুমীর ও সাপের ভয়ে মানুষ প্রথমে এই কাজে হাত দেবে না সেটাই স্বাভাবিক। জমিদারের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও মানুষ জঙ্গল হাসিলে সামিল হয়নি সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। এই কঠিন কাজ যে কেবল জমিদার, মহাজনের নির্দেশে হবে না সেটা বুঝতে পেরে এই সমস্ত গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা আমরা দেখতে পাই নানা দেবদেবীর কথা বলে। জঙ্গলের বা বাদাবনের কোনো জায়গায় দেবদেবীর আস্থানা আছে বলে কাহিনির মারফতে তা প্রজাদের মধ্যে প্রচার করেছে এই সমস্ত মহাজন, জমিদাররা। এইভাবেই প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু থানের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই সমস্ত দেবদেবী হল লৌকিক দেবদেবী। আর এইখানেই আমাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়। এই লৌকিক দেবদেবীর থান হওয়ার কারণ একটাই লোকায়ত মানুষের পূজিত দেবদেবীর কথা না বললে ওই সমস্ত মানুষ জঙ্গল হাসিলের কাজে হাত দেবে না। জমিদারের শোষণের একটি রূপ হিসেবে আমরা তাই লৌকিক দেবদেবীর থানকে দেখতে পাই। আমরা এইরকম অজস্র কাহিনি পাব যে জমিদার বা মহাজন কোনো কারণে ভ্রমনের সময় জঙ্গলে মেয়েকে দেখতে পায় গাছের ডালে দুলতে। সেই জমিদার তাকে ধরতে গেলে মেয়েটি উধাও হয়ে যায়। জমিদার রাত্রে স্বপ্ন পায় সেই

মেয়ে কোনো সাধারণ মেয়ে নয়, কোনো দেবী। জমিদার যেন সেইখানে থান নির্মাণ করে সেই জঙ্গল হাসিল করে। ফলে সহজেই আমাদের কাছে রাজনীতিটা পরিষ্কার হয়ে যায়। নিতান্ত ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থের জন্য এই থানের উৎপত্তি। এরপর আমরা দেখতে পাব যে, জমিদার সেই মাটির থানকে পাকা মন্দির করে দিচ্ছেন ও সেই মন্দিরে কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করছে। যেখানে এই সমস্ত দেবদেবীর জন্য কোনো মন্ত্র নেই। এবং পুজো করে আসছে লোকায়ত মানুষজনরা। কিন্তু লোকায়ত মানুষের পূজা-পদ্ধতি ও রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে পুরোহিত নিয়োগ আসলে ব্রাহ্মণ্য উচ্চমন্যতার পরিচয় বহন করে। আসলে এই জমিদাররা জানে লৌকিক, অনার্য দেবদেবীকে যদি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আওয়াত আনা যায় তাহলে ওই সমস্ত গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষজনের কাছে তাদের পূজিত দেবদেবী বেশি করে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। আর এই কারণেই নানা কাহিনির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই রাজনীতির উদাহরণ হিসেবে আমরা ধপধপির দক্ষিণরায়ের মন্দিরে পুরোহিত নিয়োগের জন্য যে কাহিনি তার কথা বলতে পারি। এই কাহিনিতে বলা হয়েছে দক্ষিণরায় নাকি রাত্রে জমিদারকে স্বপ্ন দেয় যেন গ্রামের নির্দিষ্ট এক ব্রাহ্মণকে পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া থানকে মন্দিরে পরিণত করার মধ্য দিয়ে জমিদার লোকায়ত মানুষের মন জয় করার মধ্য দিয়ে আসলে নিজের অধিকারকে কায়েম করতে চেয়েছে। আমরা জমিদারের দ্বারা তৈরি সমস্ত থানেই প্রায় দেখবো লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে একটি করে শাস্ত্রীয় দেবতাকে রাখা আছে। আর সেটা যদি নাও হয় ওই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা এমন কোনো কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে যেখানে মন্দিরের লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে কোনো শাস্ত্রীয় দেবদেবীর অনুষঙ্গ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে এই থান থেকে মন্দিরে পরিণত হওয়া এই গোটা বিষয়ের মধ্য দিয়ে জমিদারতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের ধাপ্পাটা ধরা যায়, যার মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত গ্রাম্য, অশিক্ষিত মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে ধর্মের নামে। আমরা এইবারে আর একটি বিষয়ের দিকে নজর দেব যেখানে মাটির থান কীভাবে মন্দিরে পরিণত হচ্ছে। এখানে আমরা দেখতে পাই কোনো ব্যক্তি নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করতে থানকে পাকার করে দেয়। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে বহু লৌকিক দেবদেবীর মন্দিরে দেখেছি যে মন্দিরগাত্রে যে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সহয়তায় মন্দিরটি তৈরি হয়েছে তার নাম বেশ ফলাও করে লেখা থাকে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যেমন ওই ব্যক্তির দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ধরা পড়ে আবার তেমনি নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করার

বিষয়টা আমাদের নজর এড়ায় না। এইভাবে বাংলার বেশ কিছু থান মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাই যে দেবদেবীর থানে অনেকে মানত করে নিজের নিজের নানা ইচ্ছে পূরণ করার জন্য। এই মানত করার ক্ষেত্রে কেউ কেউ থানের কোনো কোনো অংশকে পাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এইভাবে একটু একটু করে বেশকিছু থান মন্দিরে পরিণত হয়েছে। থান থেকে মন্দিরে পরিণত হওয়ার পিছনে মহাজনদের ওই দেবদেবীর কৃপা লাভ ও তাদের দ্বারা মন্দির নির্মাণের ঘটনা বাংলার বেশ কিছু দেবদেবীর ক্ষেত্রে ঘটেছে। এই ঘটনার দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষ্ণকালী মণ্ডল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আলিগা গ্রামের বিবিমায়ের মন্দির কীভাবে হল তার বর্ণনা দিয়েছেন—

> তখন কাঁচা থানের উপর খড়ের চালা ছিল। এখন স্থানীয় রুপার কারবারী লোকেদের সঙ্গে বড়োবাজারের মহাজনদের লেনদেন হয়। তাঁরাই এই সুউচ্চ ও সুদৃশ্য মন্দির ও মার্বেল পাথরের মেঝে যুক্ত থান তৈরী করে দিয়েছেন। অবশ্য একথা মন্দিরগাত্রে খোদিতও আছে।[১৭]

এই একই বিষয় আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই। কাশীনগরের মাইবিবির হাটের নামকরণ হয়েছে ওলাবিবির নামে। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি, আগে এই ওলাবিবির থান ছিল একটি বিরাট বট গাছের নীচে। পরে এখানে বাজার বসে। এই বাজার ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে ও যারা ব্যবসা করে তাদের প্রভূত উন্নতি হতে থাকে। এই সমস্ত ব্যাবসায়িরা ভাবে যে তাদের ব্যাবসায়িক উন্নতির জন্য বিবিমায়ের কৃপাদৃষ্টি আছে। ফলে তারা সবাই মিলে একটি চারচালা টালির ছাদ ও সিমেন্টের মেঝে যুক্ত থান তৈরি করে। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও নাগরিক সংস্কৃতির নানা প্রক্ষেপ গ্রামীন সমাজ-সংস্কৃতির ভীতকে প্রতি মুহূর্তে নাড়া দেয়। এরফলে গ্রামীন মানুষের সংস্কৃতি ও চিন্তাভাবনা টাল খাওয়ার সম্ভবনা থাকে। আমরা থানের বিবর্তন ধারায় এর বিপরীত চলন দেখতে পাব। অর্থাৎ, আমরা এই পর্যন্ত থানের যে বিবর্তন ক্রমের কথা বললাম যেখানে প্রথমে খোলা আকাশের নীচে প্রাকৃতিক ও অস্থায়ী ভাবেই থানগুলি অবস্থান করত। এরপরে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাটি ও প্রাকৃতিক নানা উপাদানের সহায্যে স্থায়ী থান নির্মাণ দেখতে পাব। সময়ের অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই থান নির্মাণে নগর সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানকে দেখতে পাই ও থানের সঙ্গে মন্দিরভাবনা কাজ করেছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লোকায়ত মানুষ এই বিবর্তন ক্রমকে স্বীকার করে না। গ্রাম সমাজে এমন অনেক দেবদেবীর থান আজও সমানভাবে নিজের ঐতিহ্যের প্রতি সমান আস্থা রেখে বিরাজ করছে। এই সমস্ত মানুষ তার নিজস্ব চিহ্নগুলিকে কোনোভাবেই মুছে দিতে চায় না; বরং তা পরম যত্নে

লালনপালন করতে চায়। কৃষিসভ্যতা ও উর্বরতাকেন্দ্রিক ধারণা থেকে উৎপন্ন এই সমস্ত দেবদেবী ও তাদের থানকে মানুষ নিজেদের খুব কাছের বলে মনে করে। নিজেদের যাপিত জীবনে যেমন তারা কোনো আড়ম্বরের পাশ দিয়ে যায় না, ঠিক তেমন করে তাদের দেবতাদেরকে নিয়ে আসতে চায় না মন্দিরের ঘেরাটোপে। লৌকিক দেবদেবীর থানকে ছাদযুক্ত না করে তারা আসলে প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে লগ্নতার ইতিহাসকে মনে রাখে ও তাকে লালন করে বংশপরম্পরায়। সমাজের ধনীরাও যেমন থান থেকে মন্দিরে পরিণত করার পিছনে কিছু রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে, ঠিক তেমন করে এই গ্রামীন মানুষজন নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য কিছু রাজনীতির আশ্রয় নেয়। যদিও একে রাজনীতি না বলে লোকায়ত মানুষদের বিশ্বাস বলাই সঙ্গত হবে। এই বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব। আমরা আদিগঙ্গার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি যে, অনেক দেবদেবীর থান পাকা ও ছাদযুক্ত করতে গিয়েও শেষপর্যন্ত তা করা হয়নি। আবার কোথাও চারদিকের দেওয়াল পাকা করলেও থানের উপর ছাদবিহীন। প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হয় অর্থের সমস্যার জন্য হয়তো এই থানকে সম্পূর্ণ করা যায়নি। কিন্তু আমরা এলাকার মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি তার যথার্থ কারণ। জয়নগর স্টেশন থেকে একটু দূরেই পাল পাড়া। এই পাল পাড়ায় বিশাল তেঁতুল গাছের নীচে বাবা পঞ্চানন্দের থান রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এই পঞ্চানন্দের পাশেই তার দুই সহচর পেঁচো ও খেঁচো। বিরাট ও ভয়াল আকৃতির পঞ্চানন্দ একটি পাথরের ঢিবির উপর পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন। মাথার উপর আশ্রয় বলতে তেঁতুল গাছ। আমরা জানি একটি থান তৈরিতে মাটির বা পাকার হোক তাতে গ্রামের সবার সহায়তা লাগে। পাল পাড়ার থানটির ক্ষেত্রে মানুষ বহুবার এই থানকে পাকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই মানুষরা যখনই ছাদ দিতে যায় কোনো না কোনো কারণে সেই ছাদ ভেঙে পড়ে। এই ঘটনা বহুবার হয়েছে। পরে একদিন ওই থানের সেবায়তকে বাবা পঞ্চানন্দ রাতে স্বপ্ন দেন যে, তিনি খোলা আকাশের নীচেই থাকতে ভালোবাসেন। তাই কেউ যেন এই থানকে মন্দিরে পর্যবসিত না করে। এরসঙ্গে বলা হয়েছে যে কেউ যদি এই নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে তার সমূহ ক্ষতি হবে। এইভাবেই থানটি নীচের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আমরা এই থান থেকে একটু পশিমে গেলেই আর একটি পঞ্চানন্দের থান পাব। সেখানেও দেখা যায় তিন দিক ইঁটের দেওয়াল দেওয়া একটি থান। কিন্তু ছাদ নেই। থানের সেবায়তদের সঙ্গে

কথা বলে জানা গিয়েছে যে, যতবারই তারা এই ছাদ তৈরি করতে যায় কোনো না কোনো কারণে এই ছাদ ভেঙে পড়েছে। এখানেও একই ঘটনাক্রম। এক রাতে সেবায়ত বাবার স্বপ্নাদেশ পান তার মাথার উপর যেন কোনো ছাদ না তৈরি করা হয়। তিনি প্রকৃতির মধ্যেই বিরাজ করতে ভালোবাসেন। ঠিক এইভাবেই বাংলার বহু দেবদেবী থানের এই বিবর্তনকে অস্বীকার করে গাছের তলায়, কোনো পড়ো জমিতে বা রাস্তার ধারে উন্মুক্ত পরিবেশে পূজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আসলে লোকায়ত মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে বিরাজ করছে। আর যেসব থান পাকার মেঝে ও ছাদযুক্ত হয়ে গিয়েছে তারাও কোনো না কোনোভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যের উপাদানকে নিজের শরীরে ধারণ করছে। আসলে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের ইতিহাস হল গ্রহন-বর্জণের ইতিহাস। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই গ্রহণ খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা যায় আবার কোথাও খুব সামান্যভাবে আদান-প্রদান হয়। আর এইভাবেই তৈরি হয় লোক-ঐতিহ্যের পরম্পরা বা বিবর্তন। প্রাকৃতিক বিপর্যের জন্য বেশ কিছু থানকে পাকা করতে হয়েছে। আমরা জানি যে নিম্নবঙ্গের এই সমস্ত অঞ্চল নদী-নালা দিয়ে ঘেরা। নদীর ধারে যে সমস্ত থানগুলি আছে জোয়ারের জল বাড়লে মাটির থানের ক্ষতি করে। এছাড়া নোনা হাওয়ার কারণে মাটির দেওয়াল বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। সুন্দরবন ও তার আশপাশের এলাকায় নদীবাঁধ ভেঙে বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা। এই বন্যার কবলে পড়ে বহু ঐতিহ্যবাহী থানকে আমরা নদী গর্ভে হারিয়ে যেতে দেখেছি। এই সমস্যার থেকে রক্ষার জন্য বহু থানকে আমরা পাকা হয়ে যেতে দেখেছি। এই থানকে পাকা করা হয় কেবলমাত্র স্থায়ীত্বের জন্য। এই থানকে আমরা পাকা থান বলব। আমরা জানি যে, লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরি ও দেবদেবীর প্রতিষ্ঠানের পিছনে জমিদারের একটি বড় ভূমিকা আছে। আদিগঙ্গা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে থানগুলি তৈরি হয়েছে বা আজও জীবন্ত আছে তাতে এই জমিদারদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বুঝবার চেষ্টা করব। জয়নগর ষ্টেশন থেকে একটু দূরেই আছে জয়চণ্ডীর থান। এই দেবীর প্রতিষ্ঠা ও তার থান নির্মাণের সঙ্গে জমিদারের ভূমিকা জড়িয়ে আছে। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে থানের পূজারীর থেকে যে ইতিহাস পেয়েছি তা আসলে দেবীর প্রতিষ্ঠা ও তার থান নির্মাণের কাহিনি। আমরা জেনেছি যে, মতিলাল মিত্র নামে এক জমিদার এই আদিগঙ্গা দিয়েই গঙ্গাসাগর তীর্থ করে ফেরার সময় জয়নগরের বর্তমান থানের জায়গায় রাত্রে নৌকা নোঙর করে। রাতে এই জমিদার দেখে যে, একটি

মেয়ে নদীর ঘাট থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে। তখন এই সমস্ত এলাকা জঙ্গলে পূর্ণ। জমিদার সেই মেয়ের পিছু নিলে একটি বকুল গাছের কাছে এসে সেই মেয়ে মিলিয়ে যায়। গভীর রাতে জমিদার স্বপ্ন পান যে, বকুল গাছের নীচেই দেবী অবস্থান করছেন; জমিদার যেন তাঁকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করে। জমিদার পরদিন সকালে সেই বকুলগাছের নীচ থেকে দেবীর শিলাখণ্ড পায় ও দেবীর প্রতিষ্ঠা করে ও সেখানে দেবীর থান প্রতিষ্ঠা হয়! আমরা এইরকম অজস্র কাহিনি পাব। যেখান থেকে আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলের থান তৈরীর ইতিহাসকে পাওয়া যায়। যেমন লক্ষ্মীকান্তপুরের করঞ্জলী গ্রামে আমরা মা বিশালাক্ষ্মীর থান উৎপত্তিতে জমিদারের সরাসরি প্রভাব না থাকলেও আমরা জেনেছি যে মায়ের নামে যে জমি আছে তা দেবত্তোর জমি হিসেবেই জমিদার ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে কারা পরে এই জমি পাবে ও মায়ের থান থেকে তার যাবতীয় খরচ কীভাবে চলবে তার হিসেব তিনি করে দিয়েছেন। আমরা পূজারীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি জমিদারের নির্দেশে দেবোত্তর সম্পত্তি এখন পাঁচ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভাগ হয়েছে। আর সেই জমি থেকে যা টাকা আসে তাই দিয়েই চলে মায়ের নিত্য পূজা থেকে যাবতীয় খরচ। এই দেবদেবীর নামে সম্পত্তি দান করার ফলে ও তা নিষ্কর হওয়ার জন্য এই সমস্ত থান জীবন্ত আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের মনে নানা নাগরিক প্রভাব পড়ার জন্য দৈবভক্তি বা বিশ্বাস টাল খেয়ে পড়েছে। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের সম্পত্তির প্রতি লোভের জন্য এই দেবত্তোর সম্পত্তি আজ সেভাবে দেবদেবীর নামে বা তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট থাকছে না। এই সম্পত্তি দখলের জন্য মানুষকে আদালত পর্যন্ত যাওয়ার উদাহরণ কম নেই; আর সর্বোপরি সেই জমিদারের শাসন আজ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই হয়েছে। ফলে এই সমস্ত নানা কারণের জন্য আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই বহু ঐতিহ্যবাহী লৌকিক দেবদেবীর থান ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা আর একটি বিষয় দেখতে পাই যে, লোকায়ত মানুষ তাদের পূজিত দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য নানা বিষয়ের অবতারণা করে থাকে। আর এইভাবেই দেবদেবীর থান ও দেবদেবীকে ঘিরে তৈরি হয় নানা অলৌকিক আখ্যান। লোকায়ত সমাজ এই নিজের গ্রাম বা পাড়ার দেবদেবীকেই প্রধান বলে মনে করে। আমরা এরমধ্য মানুষের আধিপত্য বিস্তারকারী মানসিকতার লক্ষণ দেখতে পাই। কেননা এক্ষেত্রে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের পূজিত

দেবদেবীর থানকে আড়ালে চলে যেতে দেখা যায়। মূলত অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা ও উঁচু জাতের মানুষজন নিজেদের দেবদেবী ও তাদের থানের অধিক মাহাত্ম্য প্রচার করে যেমন একদিকে সেই থানের উন্নতি সাধন করে তেমনি পিছিয়ে পড়া মানুষদের বিশ্বাসকে কোথাও প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আর এর মধ্য দিয়েই আমরা দেখতে পাই অজস্র দেবদেবীর থান নিচিহ্ন হয়ে যেতে। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি যে, কোনো কোনো দেবদেবীর থানে এমন কাহিনি প্রচলিত আছে যে ওই নির্দিষ্ট মায়ের পুজোর সময় যতদূর পর্যন্ত শাঁখ বা ঢোলের আওয়াজ যাবে সেই সীমানার মধ্যে অন্য কোনো দেবদেবীর পুজো হতে পারবে না। বলাবাহুল্য এই দেবদেবী সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের দ্বারা পূজিত হন। আমরা জানি যে সুন্দরবন অঞ্চলে নানা জাতি, উপজাতির মানুষের বাস এবং এই প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য ও পরিচয় আছে। এক ভৌগোলিক পরিসরে বসবাস করার ফলে প্রত্যেকের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান হওয়ার মধ্য দিয়ে মিশ্র-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কিন্তু এই সমস্ত উচ্চ মানসিকতার জন্য অনেক জাতির তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে প্রচলিত ধারণার কাছে গিয়ে মিশতে হচ্ছে বা নিজের পালিত সংস্কৃতিকে গোপন করতে হচ্ছে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই বাংলার বহু জনজাতির পালিত দেবদেবী ও তাদের থান অতীতের গর্ভে স্থান করে নিয়েছে।

২.৪ থান ও লৌকিক দেবদেবীর মূর্তিভাবনা

মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ এইসব দেবদেবীর কোনো মূর্তি নির্মাণ করেনি। মানুষ এইসব দেবদেবীর নামে নানা প্রতীকে পুজো করেছে। সভ্যতার প্রথমিক স্তরে মানুষ ধর্ম নিয়ে যেমন কোনো চিন্তাভাবনার অবকাশ পাননি তেমন এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর কোনো মূর্তিভাবনা মানুষের মাথায় আসেনি। মানুষ এই সময়ে নানা প্রতীকেই পুজো দিয়ে এসেছে-

> আদিম মানুষ যখন দেবতার মানুষরূপ দিতে শেখেনি-মাটির ঢেলা, পাথরের চাঁই কেটে ছেঁটে দেবতা বানিয়ে নিত।[১৮]

লৌকিক দেবদেবী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমান সময় পর্যন্ত সেই আদিম পদ্ধতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আমরা লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি পুজোর ক্ষেত্রে মিশ্র পদ্ধতি দেখতে পাই। কোনো কোনো দেবদেবীর কেবলমাত্র প্রতীকে পূজিত হচ্ছে আবার কোনো কোনো দেবদেবীর প্রতীক ও মূর্তি সমানভাবে পূজিত হয়ে আসছে। মানুষ লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া এদের যে সমস্ত প্রতীকে পুজো দিয়ে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ১। কোনো শিলাখণ্ড ২। কোনো ঘট প্রতীকে ৩। কোনো বৃক্ষকে ৪। মুণ্ডমূর্তি ৫। পশু প্রতীক, এছাড়াও মাটির ঢিবিকে লোকায়ত মানুষ দেবদেবী মনে করে পুজো দিয়ে থাকে। লৌকিক দেবদেবীর মূর্তিভাবনার মধ্যে আমরা যেসমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই—

(ক) যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর প্রতীকে পূজিত হয় তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, কোনো মাটির ঢেলা বা কোনো মাটির স্তূপকে দেবদেবী মনে করে পুজো করা হয়। এছাড়া বৃক্ষ, ফুল থেকে শুরু করে পাথর পর্যন্ত লৌকিক দেবদেবী জ্ঞানে মানুষ পুজো করে আসছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি লুপ্তপ্রায় লৌকিক দেবীর উল্লেখ করতে পারি। শস্য কেটে ঘরে তোলার সময় বেনাকির যে পুজো হয় সেখানে বেশিরভাগ সময়ে কোন মূর্তি থাকে না—

> পাঁচ গোছ ধান একটি লাঠির সাহায্যে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। যে দিন ধান কাটা হয় সেই দিন গৃহকর্তা একটি ধোয়া ধামায় কাস্তে ও নতুন গামছা নিয়ে ক্ষেতে যায়। তারপর সেই ধান গাছে সিঁদুর মাখিয়ে, নতুন গামছা জড়িয়ে, ফুলের মালা দিয়ে পুজো করে।[১৯]

যদিও এই লৌকিক দেবীর মূর্তিও আছে।

(খ) লৌকিক দেবদেবীর যে সমস্ত মূর্তি আমরা পাই তাতে এই সমস্ত দেবদেবী যে আদিম কাল থেকেই মানুষের দ্বারা পূজিত হয়ে আসছে তার সাক্ষ্য বহন করে। এই সমস্ত দেবদেবীর মূর্তিতে আদিম বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে পারি। এই দেবদেবীর চোখ সাধারণত বিস্ফারিত ও উগ্র করেই তৈরি করা হয় এবং এই দেবদেবী যে প্রচণ্ড রাগী তাদের এই চোখ থেকেই স্পষ্ট হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা বাংলার শিশুরক্ষক দেবতা পাঁচু ঠাকুরের উল্লেখ করতে পারি। আমরা দেবতার যে আখ্যান পাই বা এর স্বরূপ সম্পর্কে জানি তাতে এই দেবতার স্বভাব আদিম ভাবাপন্ন এবং এর মূর্তি নির্মানে সেই বৈশিষ্ট্য ধরা আছে—

> পাঁচু ঠাকুরের আকৃতি অতি ভয়াবহ ও বীভৎস, পুরোপুরি আদিম ভাবাপন্ন। আদিম যুগের দেবকল্পনা ও সেই অনুযায়ী মূর্তি গঠনের নিদর্শন এঁর বর্তমান মূর্তির মধ্যে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দেখা যায়।[২০]

বাংলার লৌকিক দেবদেবীর উগ্রতা বোঝাতে বিস্ফারিত চোখ ছাড়াও এই দেবদেবীর চোখের রং নির্বাচনেও তা ধরা পড়ে। কেননা বহু লৌকিক দেবদেবীর চোখের রং রক্তের মতো লাল হয়ে থাকে। আমরা দক্ষিণবঙ্গের জাগ্রত ও অধিক পূজিত পঞ্চানন্দের মূর্তিভাবনায় এই বিষয় দেখতে পাই। এই দেবতার চোখ সামান্য লাল করা হয়। ফলে পঞ্চানন্দের মূর্তি ভাবনায় বিস্ফারিত চোখের সঙ্গে লাল রঙের হওয়ার এই দেবতা যে রাগী ও উগ্র মনোভাবের তা প্রমাণিত হয়। অনেক লৌকিক দেবদেবীর কুটিল বা ক্রুর স্বভাবকে মাথার চুলের মধ্যে প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে লৌকিক দেবীর মাথার চুলে যেমন সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়ে থাকে তেমন করে চরিত্রের ক্রূরতাকে প্রকাশ করে। আমরা জানি যে, মনসার বক্র বা ক্রূর স্বভাবের কথা। মনসার মাথার সামনে যে চুল তা কুঞ্চিত সাপের মতো করে ঝুলে থাকে। এই সাপের মতো করে ঝুলে থাকা কুঞ্চিত কেশ মনসার চরিত্রের কুটিলতাকে প্রকাশ করে। কোনো কোনো দেবতার উগ্রতা বোঝাতে সামনের দু'টি দাঁত বের করা থাকে এবং এই দেবদেবীকে দেখে রাক্ষস বলে মনে হয়। দেবদেবীর মূর্তিতে উগ্রতা বোঝাতে মানুষ এই সমস্ত দেবদেবীর কল্পনা করেছে এবং আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, এই সমস্ত দেবদেবী আসলে অনার্যদের দ্বারাই পূজিত। অনার্যদের দেবদেবী বলেই এদের মূর্তিকে ভয়ঙ্কর করে আঁকা হয়েছে।

(গ) এই সমস্ত দেবদেবীর গায়ের রং নানা বর্ণের হয়ে থাকে। মানুষের আকৃতির মতো করে এই দেবদেবীর মূর্তি করা হলেও এই দেবদেবীর গায়ের রং বিভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলার লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে যাদের স্বভাব আদিম ও উগ্র প্রকৃতির তাদের রং সাধারণত কালো হয়ে থাকে। যেমন পাঁচু ঠাকুরের রং একেবারেই কালো। এই লৌকিক দেবতার রং কালো করার মধ্যে লোকায়ত সমাজ থেমে থাকেনি। এই দেবতার উগ্রতা বোঝাতে চোখ দুটি বড় করার সঙ্গে সঙ্গে তা লাল বর্ণের হয় ও ঠোঁট পুরু হয়ে থাকে। এই সমস্ত কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়েই এই দেবতা বাংলার লোকায়ত সমাজে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। আমরা কোনো কোনো দেবদেবীর রং একেবারেই লাল দেখতে পাই। দক্ষিণবঙ্গের জাগ্রত দেবতা হিসেবে পঞ্চানন্দের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়। এই দেবতার গায়ের রং থেকে শুরু করে চোখের লাল রং আমাদের ভয়ের উদ্রেক করে। এই লৌকিক দেবতার সঙ্গে অনেকে শিব ও ধর্ম ঠাকুরের সাদৃশ্যের তুলনা আনেন। আমরা এই দেবতার মূর্তিভাবনার সঙ্গে

শিবের অনেক জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অনেকে এই দেবতাকে শিবের পুত্র বলে মনে করেন। কিন্তু এখানে একটি বিষয় নিয়েই এই দেবতা আলাদা হয়ে যান তাহল— এর গায়ের রং। এই দেবতার লাল বর্ণ সম্পর্কে অনেকে বলেন যে, এই দেবতা এক সময় রক্ত পিপাসু ছিলেন। আসলে লৌকিক দেবদেবীরা আদিম স্তরে, লোকায়ত মানুষের কাছে কখনই শান্ত, সৌম্য এই ধারণার দ্বারা পূজিত হত না। তারা এই সমস্ত দেবতাকে কুটিল, উগ্র স্বভাব ও প্রতিহিংসা পরায়ণ শক্তি বলেই মনে করে এসেছে। আর এই চিন্তার ছাপ এই দেবদেবীর মূর্তি ধারণার প্রতিফলিত হয়েছে। পরে মানুষের মনে যখন সৌন্দর্যবোধ জাগে মানুষ এই দেবতাদের কিছু কিছু সৌম্য মূর্তি দান করে। কিন্তু এদের মূল স্বভাব এখনও একই থেকে গিয়েছে। যেমন এই লৌকিক দেবতার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। আমরা যতই এই দেবতাকে শিব বা ধর্ম ঠাকুরের সঙ্গে এক সারিতে রাখি না কেন এর মূর্তিভাবনা ও গায়ের রঙে এর আদি ভাব প্রকাশ পায়—

> দেবতাটি আর্যপূর্ব যুগের ব্রত্যদের, উন্নত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অনুন্নত রক্ষণশীল সমাজের মধ্যেই উপাস্য ছিলেন, বর্তমানে এঁর পূজার আধিক্য লক্ষ্য করে ও মহাদেবের সঙ্গে আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায় ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজও এঁকে স্বীকার করেছেন, এঁর সংস্কৃত ভাষায় ধ্যানমন্ত্রাদি রচিত হয়েছে, মহাদেবের আকৃতি ভেদ বলে প্রচারিতও হন, ...তবুও ইনি গৃহদেবতা হননি, বর্ণ ও রক্তপ্রীতি ত্যাগ করেননি- লৌকিক দেবতা হয়েই আছেন।[২১]

আমরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এই গ্রহণের ইতিহাস জানি। বাংলার অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী থেকে শুরু করে ব্রতের দেবদেবী এর আওতায় পড়ে নিজস্ব চরিত্রগুলি হারিয়েছে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের এই দ্বীপময় অঞ্চলে যেখানে ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় কার্যকর নয়, সেখানে এইসমস্ত দেবী নিজের আদি ঐতিহ্যকে এখনও ধরে রেখেছে। লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দকে আমরা যতই শাস্ত্রীয় স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা দেখি না কেন এর গায়ের রঙের কোনো বদল আমরা দেখতে পাই না। আবার বেশ কিছু দেবদেবীর রং সবুজ হয়ে থাকে। লৌকিক দেবদেবীর গায়ের রং তার চরিত্রকে যেমন প্রকাশ করে তেমন করে এই রঙের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষ এই দেবতার মধ্যে তার কার্যকারিতার ইতিহাসকে প্রচ্ছন্নে বলে চলে। যেমন যে সমস্ত দেবতার সঙ্গে শস্যের চাহিদা জড়িয়ে আছে তার গায়ের রং সাধারণত সবুজ করা হয়। যদিও আমাদের এই সিদ্ধান্ত একরৈখিক নয়। এই রঙের নির্বাচণের নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এছাড়া যেসমস্ত দেবদেবীর উপর শাস্ত্রীয় প্রভাব সব থেকে বেশি করে পড়েছে তাদের রঙের মধ্যে আমরা গৌরবর্ণ বা স্বর্ণ বর্ণের প্রাধান্য দেখতে পাই। এছাড়া কোনো কোনো

দেবদেবীর, বিশেষত দেবীর ক্ষেত্রে তার ঐশ্বর্য ও মহিমাকে বোঝাতে গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো করা হয়। বাংলার বনদেবী বিশালাক্ষীর মূর্তিতেও আমরা আদিম স্বভাবকে দেখতে পাই। আমরা বিশালাক্ষীর চোখকে বিস্ফারিত দেখি। করালদন্ত ছাড়াও এই দেবীর গায়ের রং সামান্য লাল হয়ে থাকে। ফলে বাংলার লৌকিক দেবদেবীর মূর্তির নানা রঙের মধ্য দিয়ে আসলে এই সমস্ত দেবদেবীর উৎস ও তাদের মূল বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে।

(ঘ) লৌকিক দেবদেবীর সাজসজ্জা এই দেবদেবীর মূল বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। এছাড়া দেবদেবীর পোশাক-পরিচ্ছদ অঞ্চল ও ধর্ম ভেদে আলাদা হতে দেখা যায়। পুরুষ দেবতার ক্ষেত্রে তাদের বৈশিষ্ট্য বা কাজের নিরিখে পোশাক-পরিচ্ছেদ নির্ধারিত হয়। যেমন দক্ষিণরায় যেখানে যোদ্ধা হিসেবে পূজিত হন সেখানে তার পোশাক অনেকটা সেনাপতির মতো ঝকমকে ও হাতে তরবারি থাকে। যেমন বারুইপুরে দক্ষিণরায়কে বীর ও যোদ্ধার পোশাক পরানো হয়েছে ও এই দেবতার হাতে বন্দুক আছে। আবার আমরা কোনো কোনো স্থানে দক্ষিণরায়কে বাঘের দেবতা হিসেবে পূজা করার রীতি দেখতে পাই। এই সমস্ত জায়গায় দক্ষিণরায়কে বাঘের উপর উপবিষ্ট ও সাধারণ পোশাক পরে পূজিত হতে দেখা যায়। দক্ষিণরায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু জানিয়েছেন—

> বর্ণ হরিদ্রা, মাথায় বাবরীচুল, তার উপর উষ্ণীষ বা মুকুট, কানে কুণ্ডল, কপালে রক্ততিলক, চোখ দুটি বিশাল,, একটু রক্তাভ,... নাক টিকালো, গোঁফ জোড়া আকর্ণ বিস্তৃত, পরিধানে হিন্দুযুগীয় যোদ্ধার বেশ হাতে তীর-ধনুক বা অসি- পরশু, পিঠে ঢাল ও তূণীয়।[২২]

ফলে দক্ষিণরায়ের এই পোশাক দেখে আমরা বুঝতে পারি এই দেবতা আদিতে কোনো যোদ্ধা ছিল। দক্ষিণরায় সম্পর্কে অনেক গবেষক বলেছেন যে, ইনি মুকুট রাজার সেনাপতি ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। মানুষ এই ধারণা নিয়েই এই দেবতার পোশাক নির্বাচন করেছেন। কিন্তু আমরা একটু ভালো করে দেখে বুঝতে পারি এই দেবতার আদি উৎস আসলে লোকায়ত সমাজের থেকে। দক্ষিণরায়ের যে পূজাপদ্ধতি ও পূজার উপকরণ তাতে এই দেবতাকে আদিম মানুষের পালিত দেবতাই বলে মনে হয়। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বাধিক পূজিত এই দেবতার অনেক স্তর পরম্পরা আছে। আদিতে এই দেবতা মানুষের ব্যাঘ্র উপাসনা থেকে উৎপত্তি হলেও মানুষের বাঘের ভয় কমার ফলে এই দেবতা এখন নানাবিধ রোগের দেবতা হিসেবেই পূজিত হন।

লৌকিক দেবদেবীর পোশাক পরিচ্ছদে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সমস্ত দেবদেবীর পোশাক অনেক সময় শাস্ত্রীয় দেবতার মতো আড়ম্বরপূর্ণ হয় না। লোকায়ত মানুষ যেমন নিজের পোশাক পরে ঠিক তেমন করেই এই দেবদেবীর পোশাক নির্বাচন করা হয়। আমরা দক্ষিণবঙ্গের অনেক দেবতা পাই যাদের হাঁটুর উপরে মলিন একখণ্ড ধুতি সম্বল এবং গায়ে কোনো বস্ত্র নেই। আবার কোনো কোনো দেবতার ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ধুতিকে কোমরের সঙ্গে আঁট করে রাখার জন্য গামছা দিয়ে জড়ানো থাকে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে পাঁচু ঠাকুরের এমন পোশাক দেখা যায়। এছাড়া পঞ্চানন্দের দুই সহচর পেঁচো ও খেঁচোর পোশাক এমন হয়ে থাকে। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এই সমস্ত দেবদেবীর মানুষের নিত্য সহচর ও মানুষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। আমরা কোনো কোনো দেবতার ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, তারা কেবলমাত্র ধুতি পরে আছেন। তাদের গায়ে অন্য কোনো বস্ত্র নেই। এখানে লোকায়ত মানুষ এই সমস্ত দেবতার আদি উৎসকে মনে রেখেই তাদের গায়ে কোনো বস্ত্র দান করেনি। আদিম মানুষ যখন বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত ও পোশাক পরার মতো সভ্য অবস্থায় আসতে পারেনি সেই সময় থেকেই তারা এই সমস্ত দেবদেবীকে পুজো করে আসছে। আদিম অবস্থায় মানুষ যেমন অরণ্যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রাকৃতিক ভাবেই থাকত তেমন করেই তাদের পূজিত দেবতাদেরকেও তারা সেইভাবে কল্পনা করে নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মানুষ তথাকথিত সভ্য হলে ও সৌন্দর্যবোধের জাগরণ হলে পোশাক পরতে শুরু করে। কিন্তু অলৌকিক দেবদেবী আজকের সময়েও তাদের মূল স্বরূপকে ভুলতে পারেনি বা মানুষ তাদের আদিকে ভুলতে চায়নি। ফলে প্রকৃতি লগ্ন এই সমস্ত দেবতা আজকের সময়েও কোনো পোশাক না পরে প্রাকৃতিক ভাবে খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করে।

আমরা লৌকিক দেবীর ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, ধর্মের নিরিখে এদের পোশাকের বদল হয়। উদাহরণ হিসেবে বনবিবির উল্লেখ করতে পারি। যেখানে বনবিবি হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হয় সেখানে এই দেবীর পোশাক বাঙালি হিন্দু ঘরের মতো করেই। এখানে দেবীর সুন্দর শাড়ি পরা থাকে, গলায় হার ও মাথায় মুকুটের সঙ্গে সঙ্গে সারা অঙ্গে অলঙ্কার দিয়ে সাজানো থাকে। আবার মুসলমান দ্বারা পূজিত বনবিবির পোশাক একেবারে খানদানী মুসলমান ঘরের কিশোরীর মতো। এই দেবীর পরিধানে পিরান বা ঘাঘরা পাজামা থাকে। এছাড়া পায়ে জুতো মোজা থেকে শুরু করে চুল বিনুনি করা থাকে

সঙ্গে ওড়নাও দেখতে পাওয়া যায়। ফলে বাংলার লৌকিক দেবতার ধর্মের সঙ্গে তার পোশাক ও সাজসজ্জা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

লৌকিক দেবদেবীকে আমরা লোকায়ত মানুষের সমস্ত কিছুর রক্ষাকর্তা হিসেবেই দেখতে পাই। এই সমস্ত দেবদেবীর উপরে মানুষ তাদের ভালোমন্দের ভার বা দায়িত্ব দিয়ে দিন অতিবাহিত করে। মানুষের এই ভাবনার ফলন তাদের পূজিত দেবদেবীর মূর্তিভাবনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। লৌকিক দেবীর মূর্তির মধ্যেও মানুষকে অভয় দানের বিষয়টি ধরা থাকে। বাংলার লৌকিক দেবীর মুখমণ্ডলের মধ্যে স্মিত হাসি ও হাতে বরাভয় মূদ্রা মানুষের এই চাহিদার থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়।

২.৫ থানকেন্দ্রিক দেবদেবী'র পূজা-পদ্ধতি ও উপকরণ

লৌকিক দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি ও উপকরণের মধ্যে নানা স্তর দেখা যায়। বেদ পুরাণের আগে আদিম জনজাতিদের দ্বারা এই সমস্ত দেবদেবী পূজিত হত তা এদের পূজাপদ্ধতি ও পূজার উপকরণ দেখলে বোঝা যায়। আমরা বাংলায় যে সমস্ত দেবদেবী পাই তাদের পুজোর সময় তিনভাবে দেখা যায়। কিছু কিছু দেবদেবীর নিত্য পূজা হয়ে থাকে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, গ্রামের কোনো বিধবা মহিলা বা কোনো কিশোরী প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এদের ধুপধুনো ও প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো দিয়ে থাকে। এই সময়ে দেবতার থানে কোনো ভক্ত বা মানুষের সমাগম হয় না। এছাড়া কোনো কোনো থানে সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পুজো হয়ে থাকে। শনি ও মঙ্গলবার এই সাপ্তাহিক পুজো হয়ে থাকে। লৌকিক দেবদেবীর সবথেকে আড়ম্বরপূর্ণ ও জাঁকজমক করে পুজো হয় বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট মাসে। এই বাৎসরিক পুজোকে জাঁতাল পুজো বলা হয়। এই জাঁতাল পুজো উপলক্ষে মেলা বসে, নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয় ও প্রচুর মানুষের সমাগম হয়ে থাকে।

লৌকিক দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি ও পূজার উপকরণের প্রাথমিক স্তরে আমরা দেখতে পাই যে, এই সমস্ত দেবদেবীর পূজায় কোনো ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত প্রবেশ নেই। এই সমস্ত দেবদেবীর পুজোতে কোনো শাস্ত্রীয় বা নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারিত হয় না। সাধারণত অব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজের মতো করে এদের পুজো করে থাকে। এছাড়াও থানের সেবক এদের পুজো করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে

এদের পুজোতে আমরা ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের প্রবেশ দেখি। এছাড়াও এই সমস্ত দেবদেবীর পুজোতে নানা মন্ত্র উচ্চারণ করতেও দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবীর মূর্তির বিবর্তন ধারায় যেমন নানা পরিবর্তন এসেছে তেমন এদের পূজা-পদ্ধতির নানা বদল হয়েছে। যে দেবতার আরাধনা ছিল একান্ত লোকায়ত মানুষের, অব্রাহ্মণ সম্পদায়ের নিজস্ব এলাকা; ব্রাহ্মণ্য সম্পদায়ের প্রবেশের ফলে এর অনেক বদল ঘটে যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই সমস্ত দেবদেবীর পুজোতে যতই ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ করুক না কেন এর অন্তরঙ্গগত বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। আসলে যে কোনও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই হল নিজের বিপুল কলেবরকে ক্রমাগত গ্রহণ-বর্জন করে নিজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে অটুট রাখে। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানান—

> যে সমাজ বাহির হইতে নিত্য নূতন উপাদান গ্রহণ করিয়া তাহা নিজের সমাজের উপযোগী করিয়া লইতে পারে; সেই সমাজ আপাতদৃষ্টিতে বাহিরের দিক দিয়া পরিবর্তিত বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃত অন্তরের দিক দিয়া অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। ...এই নিজের সমাজের উপযোগী করিয়া লওয়ার মধ্যেই ইহার স্বকীয়তা রক্ষা পায়।[২৩]

লৌকিক দেবদেবীর ক্ষেত্রেও আমরা একই কথা বলতে পারি। এই সমস্ত দেবদেবী দিনের পর দিন নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের মূল বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছে। বাংলাকে নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আর এই সমস্ত দেবদেবী মানুষের জীবনযাপনের জীবন্ত সাক্ষী। ফলে মানুষের মন-মানসিকতার পরিবর্তনের ঢেউ এই দেবদেবীর মধ্যেও পড়েছে। এই প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে লৌকিক দেবদেবী তার ঐতিহ্যকে যেমন ধরে রেখেছে তেমনভাবে ঐতিহ্যের উত্তরণ ঘটিয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর স্বকীয়তা খুঁজতে গেলে এদের পূজা-পদ্ধতি ও পূজার উপকরণ নির্ভরযোগ্য উপাদান ।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, লৌকিক দেবদেবীর পুজোতে কোনো মন্ত্র উচ্চারিত হয় না বা কোনো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশের অধিকার ছিল না। যদিও এখন বেশ কিছু লৌকিক দেবদেবীর পুজোতে পুরোহিত আসে ও মন্ত্র উচ্চারণ করে পুজো করে। কিন্তু লৌকিক দেবদেবীর পূজার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ে কোনো মন্ত্র উচ্চারণ হয় না। লোকায়ত মানুষ নিজের মতো করে ভক্তি সহযোগে পুজো দিয়ে থাকে। অনেক দেবদেবীর ক্ষেত্রে এই সমস্ত দেবদেবীর নামে মাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ আছে তাই পাঠ করা হয়। যেমন বনবিবির বাৎসরিক পুজোর দিনে বনবিবির জহুরনামা পড়া হয়।

কিন্তু বর্তমান সময়ে দেবদেবীর ধ্যানমন্ত্র পাঠ হয় ও বিভিন্ন পুরাণ থেকে মন্ত্র পাঠ করা হয়। আমরা যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর পূজায় ব্রাহ্মণের উপস্থিতি ও মন্ত্র উচ্চারিত হতে দেখি সেই সমস্ত লোকদেবতার সঙ্গে শাস্ত্রীয় দেবতার সম্পর্ক দেখতে পাই। যেমন আটেশ্বর হল লোকায়ত দেবতা কিন্তু এর সঙ্গে মানুষ শিবের সম্পর্ক স্থাপন করে। এরফলে যে দেবতার পুজোয় মন্ত্র ও পুরোহিতের দরকার পড়ত না; এই শাস্ত্রীয় দেবতার সঙ্গে সংযুক্তির জন্য ব্রাহ্মণ ও পুজোর মন্ত্র অনিবার্য হয়ে পড়ল।

লৌকিক দেবদেবীর পূজার উপকরণের মধ্যে এই সমস্ত দেবদেবীর আদি উৎস রহস্য লুকিয়ে আছে। লৌকিক দেবদেবীর পুজোর উপকরণ হিসেবে আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকার উপাদান দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবী পূজিত হয় গ্রামের নিম্নবিত্ত শ্রেণির দ্বারা। লৌকিক দেবদেবীর পুজোতে এই সমস্ত মানুষ অতি সামান্য ফল, ফুল ও ধান-দূর্বা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চায়। লৌকিক দেবদেবীর নিত্য পুজোর দিনে সাধারণত আমরা এই রকম উপাচার দেখতে পাই। কিন্তু বাৎসরিক পুজোর দিনে যে সমস্ত জিনিস দিয়ে এই সমস্ত দেবদেবী পুজো করা হয় তার মধ্য দিয়ে এই দেবদেবী লোকায়ত মানুষের কত কাছের যেমন করে বোঝা যায় ঠিক একইভাবে এই দেবদেবী যে মানুষের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন থেকে উঠে এসেছে তা বুঝতে পারা যায়। লোকায়ত মানুষ তার বিভিন্ন চাহিদা বা সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নানা উপাচারের সঙ্গে এইসব দেবতাদের পুজো করে থাকে। ড. দেবব্রত নস্কর এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> বড় কাছারির থানে হাঁস, মুরগি, পায়রা, পাঁঠা প্রভৃতি প্রাণী ছেড়ে দিয়ে মানত চুকনো পদ্ধতি প্রচলন আছে। এছাড়া ১) বোবার বোল ফেরাতে ওল দিয়ে পূজা, ২) কানে পুঁজ হলে ঝুনো নারকেল দিয়ে পূজা, ৩) সন্তানহীনা সন্তান পেলে গোপাল মূর্তি দিয়ে পূজা, ৪) ভাল ফলনের জন্য লাউ, কুমড়ো, কাঁঠাল দিয়ে পূজা।[২৪]

লৌকিক দেবদেবীর পুজোর মধ্যে মানুষের এই সমস্ত জিনিস দান আসলে তার পরিবার ও পরিজনকে সুস্থ রাখার মানসিকতার ফল।

আমরা জানি যে, এই সমস্ত দেবদেবী আদিম ও উগ্র স্বভাবের। অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপন থেকে এরা উঠে এসেছে বলে এদের পূজার উপকরণ সেই আদিমতাকে বহন করে চলেছে। আমরা এও জানি যে, লৌকিক দেবদেবীর থানে এক সময়ে নরবলি হত। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নরবলী বন্ধ হয়ে গিয়ে পশু বলি হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে খুব কম দেবদেবীর থানে এই বলিদান প্রথা

টিকে আছে। এই বলিদানের পরিবর্তে মানুষ এখন কুমড়ো, লাউ বা শশা বলি দিয়ে থাকে। কিন্তু এই দেবদেবীর পুজোতে রক্ত অনিবার্য। সেই প্রথা অনেক থানেই এখনও চালু আছে। দক্ষিণবঙ্গের বহু থানে আমরা দেখতে পাই এই দেবদেবীর পুজোর সময়ে মানুষ নিজের বুক চিরে এক-দুই ফোটা রক্ত প্রসাদের উপরে ছড়িয়ে দেয়। আধুনিক সময়ে লোকায়ত মানুষের মন যতই সভ্য ও শাস্ত্রীয় সৌন্দর্যবোধের মোড়কে আসুক না কেন এদের দেবদেবী যে অনার্য ও রক্তপিপাসু আদিম জনজাতির দ্বারা পূজিত হত এই পুজোতে রক্তদান সেই সাক্ষ্য বহন করে চলে। এছাড়া এই দেবদেবী যে আদিবাসী গোষ্ঠীর দেবতা তা এদের পুজোতে দেওয়া উপকরণ দেখেই স্পষ্ট হয়। প্রতিটি লৌকিক দেবতার পুজোতে হাড়িয়া, বা কোনো প্রকার মদ-গাঁজা, শূকর বা মেষের মাংস উপাচার হিসেবে দেওয়া হয়। লৌকিক দেবদেবী যে আদিম ও অরণ্যকেন্দ্রিক মানুষের দ্বারাই পূজিত হত এবং শাস্ত্রীয় দেবদেবীর সঙ্গে পূজার উপাদানের নিরিখে পার্থক্য করা যায় তা বারুইপুরের ধপধপীতে পূজিত দক্ষিণরায়ের পূজার উপকরণের সঙ্গে একই মন্দিরে, একই দিনে মহাদেব ও নারায়ণের পূজার উপকরণকে পাশাপাশি রাখলে স্পষ্ট হয়। এই বিষয়ে দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় ঘোষ আমাদের জানান—

> পয়লা মাঘ বাৎসরিক জাঁতাল পূজার দিন রাত আড়াইটায় দক্ষিনেশ্বর-এর উদ্দেশে যে অন্নভোগ দেওয়া হয় তাতে থাকে আলু, পটল, বড়ি ভাজা, শুক্তো, ডাল, এঁচোড়, বাঁধাকপি, ফুলকপি, প্রভৃতি তরকারি; সমুদ্র কাঁকড়া পোড়া, শোলমাছ পোড়া, চাটনি, পায়েস, মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, বলির পাঁঠার রান্না করা মাংস। দক্ষিনেশ্বর বা দক্ষিণরায়ের মনুষ্য মূর্তির সামনে রাখা আছে শালগ্রাম শিলা বা নারায়ণ, শিবলিঙ্গ।... বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পয়লা বাঘ গভীর রাতে যে অন্নভোগ দেওয়া হয় তা নায়য়ণ ও মহাদেবকে নিরামিষ দেওয়া হয় কিন্তু দক্ষিণেশ্বর, আদ্যা ও মনসাকে আমিষ(বলির) দেওয়া হয়।[২৫]

লৌকিক দেবদেবীর পুজোতে এই হাঁস, মোরগ, পাঁঠা বলি দেওয়া, পোড়া মাছ-কাঁকড়া দেওয়া, তরল পানীয় অর্থাৎ মদ দান করা ও সর্বোপরি এই সমস্ত দেবদেবীর হাতে তীর, ধনুক, মুগুর, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র ও পূজায় ধ্যান মন্ত্র উচ্চারিত না হওয়ার মধ্যে বলে দিচ্ছে এই দেবদেবী কোনো শাস্ত্রীয় নয়। আদিম অরণ্যচারী সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি জনজাতির দ্বারাই এইসব দেবদেবী পূজিত হত। কেননা এদের পূজা-পদ্ধতি ও উপাচার সবই আদিবাসী, বনবাসী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতির যে বদল হয়েছে তা পরবর্তীকালের সংযোজনের কারণেই।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এই সমস্ত দেবদেবীকে মানুষ একদিকে ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা করে আবার এই দেবদেবীকে মানুষ একেবারে কাছের বলে মনে করে। তাই লোকায়ত মানুষ নিজের হাতে রান্না করা আমিষ ভাত তরকারী এই দেবদেবীর উদেশ্যে নিবেদন করে থাকে। এই দেবদেবীর পুজোতে যে সমস্ত উপাদান দেওয়া হয় তার থেকে আমাদের মনে হয় এই দেবতারা বাড়ির অন্য কোনো সম্মাননীয় সদস্য। উদাহরণ হিসেবে লক্ষ্মীকান্তপুরের বিশালাক্ষ্মী দেবীর প্রত্যহ ভোগ দেওয়ার যে রীতি আছে তা উল্লেখযোগ্য—

> প্রত্যহ দুপুরে দেবীর অন্নভোগ হয় আড়াই সের চালের। আমিষ পদ সহ পঞ্চব্যঞ্জন চাই মায়ের ভোগে। বাগানের টাটকা নটে শাক, পালং, পুঁই, আর পুকুরের টাটকা মাছ-চিংড়ি মায়ের বিশেষ পছন্দ। ভক্ত চাষী পরিবার তা আদর করে দিয়ে যান। শয়ন আরতি হলে খিলি পান খেয়ে মা নিদ্রায় যান।[২৬]

এখানে দেবীর ভোগের মধ্যে কোথাও শাস্ত্রীয় দেবতার ভোগের অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় না। মায়ের নিত্য ভোগে পান-সুপুরি দেওয়ার মধ্যে লৌকিক দেবদেবী মানুষের কাছের ও একান্ত ঘরের মানুষের মতো তা বোঝা যায়। আর এই কারণেই লৌকিক দেবদেবীকে লোকায়ত মানুষ ‘বাবা ঠাকুর’, ‘বুড়ি মা’ ‘বুড়োবুড়ি’ প্রভৃতি আত্মীয়তাসূচক শব্দে সম্বোধন করে। বাংলার এক লৌকিক দেবতার নামই হল বাবা ঠাকুর। লৌকিক দেবদেবীর পুজোর ভোগে এই নানা রকম শাক, মাছ ও বাড়ির নতুন কিছু প্রথমেই দেবদেবীকে ভোগ হিসেবে দেওয়ার মধ্যে লোকায়ত মানুষের সঙ্গে দেবদেবীর নির্ভরতার মনোভাব প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই দেবদেবীর পূজার ভোগে খিচুড়ি, হরিলুঠ থেকে শুরু করে বাতাসা, নকুলদানা প্রভৃতি মিষ্টি দেওয়া আসলে পরবর্তীকালের সংযোজন ও এই দেবদেবীকে শাস্ত্রীয়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আওতায় আনার কৌশল বলে মনে হয়।

২.৬ লোকায়ত সমাজের মেলা-পার্বণ ও দক্ষিণবঙ্গের দেবদেবী

বাংলার লৌকিক দেবতার বাৎসরিক পুজো উপলক্ষ্যে সব জায়গায় উৎসব বা মেলার প্রচলন আছে। লৌকিক দেবদেবীর বাৎসরিক উৎসবকে জাঁতাল পুজো বলা হয়। জাঁতাল পুজো সম্পর্কে বলা হয়—

> জাত শব্দের অর্থ হল উৎসব বা মেলা। যেকোন পূজা যখন বিরাট রূপ পায়, তখন সে পূজা উৎসবে রূপান্তরিত হয় আর উৎসব যখন বিরাট আকার পায় তখন সেখানে জমে বহু লোকের ভিড়। সেই উৎসব পরিণত হয় মেলায়। জাঁতাল পূজা একটি বিশেষ দিনের বিশেষ পূজা।...জাঁতাল পূজার দিন

দেবমূর্তিরও রূপান্তর ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে মৃন্ময়ী প্রতিমার ক্ষেত্রে বিগ্রহ সম্পূর্ণ নতুন রূপে প্রকাশ লাভ করে।[২৭]

লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে আচার-অনুষ্ঠানের রীতি তার সবটাই এই বাৎসরিক পুজোর দিনে পাওয়া যায়। এই পূজার মধ্যে আমরা যেমন ধর্ম-সমন্বয়ের বিষয় লক্ষ করতে পারি একইসঙ্গে সব বর্ণ, শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। এই বাৎসরিক উৎসবের দিনে লোকায়ত মানুষ বিভিন্ন আচার পালন করে; যার মধ্য দিয়ে তাদের পূজিত দেবতাকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা ধরা থাকে। যেমন চড়কের দিনে মানুষ পিঠ ফুঁড়িয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ঝাঁপ কাটে। এছাড়াও অসংখ্য নারীকে দণ্ডি কাটতে দেখা যায়। ফলে লৌকিক দেবদেবীর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র বিনোদনের পরিসর তৈরি করে না; এইসব দেবদেবীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বোঝার জীবন্ত পরিসর হয়ে ওঠে।

লৌকিক দেবদেবীর বাৎসরিক পূজার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এই সমস্ত দেবদেবীকে ঘিরে কয়েক রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠিত হওয়া পালাগান। লৌকিক দেবদেবীর বাৎসরিক পূজার অনিবার্য শর্তই হল কোনো পালাগানের দল সেই দেবদেবীর থানের সামনে ঐ দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক পালাগান গাইবে। যেমন শীতলার থানে শীতলার পালা বা মনসার থানে মনসার ভাসান পালা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এই সমস্ত পালাগান আধুনিক নাটকের মতো কোন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় না বা যে সমস্ত শিল্পীরা এই পালাগান করে থাকে তাদের সাজপোশাকে কোনো চাকচিক্য থাকে না। আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের তেমন উপস্থিতি দেখা যায় না। থানের পাশে একটি জায়গায় চাঁদোয়া করে নীচে ত্রিপল পেতে কোনো পালাগানের দল সারা রাত ধরে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করে চলে এই গানের মধ্য দিয়ে। আর ভক্তগন এই অস্থায়ী মঞ্চের চারপাশে বসে দেবদেবীর পালাগান শ্রবণ করে। ফলে লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে যে উৎসব বাংলায় প্রচলিত আছে সেখানে লোকায়ত মানুষের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এর নান্দনিক দিককে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

লৌকিক দেবদেবী বলতে আমরা সেই সমস্ত দেবদেবীকেই বুঝতে পারি, যাদের কোনো শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে নাম উল্লেখ নেই। এদের লৌকিক দেবতা বলার একটি বড় কারণই হল এই সমস্ত দেবদেবী মানবরূপী বলে লোকায়ত মানুষ বিশ্বাস করে। এছাড়া আমরা জানি যে আদিম সমাজের সূর্য, পৃথিবী, গাছ, পাথর-পাহাড়, নদী, পশু বা শস্য পূজার বিমূর্ত ধারা পরবর্তী সময়ে লোকসমাজে মূর্তির

আকার নিয়ে লৌকিক দেবদেবী বলে পূজিত হয়। ফলে বাংলার লৌকিক দেবদেবীর ইতিহাস ও স্বরূপ বাঙালির জাতীয় সম্পদ ও ইতিহাস নির্মাণের জীবন্ত দলিল।

২.৭ দক্ষিণবঙ্গের নির্বাচিত লৌকিক দেবদেবীর থানের বিবরণ

দক্ষিণবঙ্গের যে সমস্ত দেবদেবী অধিক পূজিত এবং কোন অঞ্চলে কোন দেবদেবীর প্রভাব বেশি তার একটি তালিকা বা সেই সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি। গবেষণার নির্বাচিত অঞ্চলে যে সমস্ত দেবদেবীর থান আছে তার তালিকা নীচে দেওয়া হল—

(ক) সোনারপুর— লৌকিক শিব, মনসা, শীতলা, দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, বিবিমা, বনবিবি, হাড়িঝি চন্ডী, দক্ষিণরায়, বারা ঠাকুর, ওলাবিবি।

(খ) বারুইপুর— লৌকিক শিব, মনসা, শীতলা, দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, বিবিমা, বনবিবি, দক্ষিণরায়, বারা ঠাকুর, বেনাকি, মাকাল, কালু রায়, ঘেঁটু, আটেশ্বর, বনবিবি, বিশালাক্ষী, সতীমার থান, বারা।

(গ) মগরাহাট— লৌকিক শিব, মনসা, শীতলা, দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, বিবিমা, বাবাঠকুর, দক্ষিনেশ্বর।

(ঘ) মন্দিরবাজার— লৌকিক শিব, মনসা, শীতলা, দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, বিবিমা, বাবাঠকুর, দক্ষিণেশ্বর, সাতবিবি, ওলাবিবি।

(ঙ) জয়নগর থানা— জয়চণ্ডী, দ্বাদশ শিব, ধন্বন্তরী কালী, রক্তাখাঁ, বনবিবি, লৌকিক শিব, মনসা, শীতলা, দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, বিবিমা, ঠাকুর, বেনাকি, মাকাল, কালু রায়, ঘেঁটু, আটেশ্বর, বিশালাক্ষী, বসন্ত রায়।

(চ) দক্ষিণ বারাসত— লৌকিক শিব, মনসা, শীতলা, দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, বিবিমা, শতর্ষা গাজী, পাঁচু ঠাকুর, আটেশ্বর, বসন্ত রায়।

(ছ) মথুরাপুর— ত্রিপুরা দেবী, লৌকিক শিব, মনসা, শীতলা, দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, বিবিমা, নারায়ণী, বুড়ো শিব, মঙ্গলা দেবী।

(জ) সাগর— বনবিবি, লৌকিক শিব, মনসা, শীতলা, দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, বিশালাক্ষী, বনদুর্গা।

দক্ষিণবঙ্গের মানুষের দ্বারা এই সমস্ত দেবদেবী বহুল পূজিত। এছাড়াও স্থান-ভেদে আরও অনেক দেবদেবী লোকায়ত সমাজে পূজিত হয়ে আসছে। সমস্ত দেবদেবীর থান আজকের সময়ে আমরা আর খুঁজে পাই না। কেননা জল-জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষ যখন বসতি করেছে এবং এই বসতি যখন ঘন হয়েছে তখন এই দেবদেবীর প্রয়োজন কমে এসেছে মানুষের কাছে। আর এই জন্য যে দেবদেবী লোকায়ত মানুষের কাছে জাগ্রত হয়ে পুজো পাচ্ছিল তা আজকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে উল্লেখিত সমস্ত দেবদেবীর থান আজকের সময়ে পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। আমরা দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি লৌকিক দেবদেবীর থানের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

(ক) বিশালাক্ষীর থান

বিশালাক্ষীর থান আদিগঙ্গা, হুগলী ও সরস্বতী নদীর তীরেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই এই বনদেবীর প্রাধান্য সবথেকে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। বিশালাক্ষী যেহেতু বাস্তুদেবী হিসেবে পূজিত হন না, তাই এই দেবীর থান আমরা কোনো বাড়ির বাস্তুভিটেতে দেখতে পাই না। এই দেবীর অবস্থান বা থান গ্রাম বা পাড়াকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, আমরা সেই সমস্ত থানকেই আলোচনার মধ্যে রেখেছি যে থানটি গ্রাম বা পাড়ার সকলের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে । ব্যক্তিগতভাবে তৈরি থানকে আলোচনার মধ্যে রাখা হয়নি। এই আলোচনার মধ্যে না রাখার কারণ হলো এই থানগুলোকে পাঠ করে লোকায়ত সমাজের সমাজ-সংস্কৃতিকে বুঝতে পারা যায় না। কেননা কোনো সমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতি বুঝতে গেলে একক মানসিকতা দিয়ে বোঝা সম্ভব হয় না। সমবায়ের বা গোষ্ঠীর মানসিকতা দিয়েই কোনো সমাজের মন বুঝতে পারা যায়। এই দেবী জঙ্গলজীবী, কৃষিজীবী বা জলজীবী মানুষের দ্বারা পূজিত হয়ে আসছে। যারা প্রচুর পরিশ্রমের মাধ্যমেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। জঙ্গল কেটে যখন এরা বসতি করে তখন বাঘ, কুমীর ও সাপের উপদ্রব ছিল এদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের অঙ্গ। নিম্নবঙ্গের যে সমস্ত জায়গায় বিশালাক্ষীর থান পাওয়া যায় তার বেশিরভাগ জঙ্গলকাটীর সময়ে তৈরি।

(খ) বনবিবির থান

বনবিবির থান বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখা যায়। তবে বনবিবির থান সুন্দরবন লাগোয়া অঞ্চলে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবির এই আধিক্যের একটি বড় কারণ এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে। জেলে ও মৌলেদের জীবীকার কারণে গভীর জল ও জঙ্গলে যেতে হয়। বনবিবি হল এই জেলে ও মৌলেদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী। আউলে, বাউলে, মৌলে ও মৎস্যজীবীরা নদী, খাঁড়ি ও গভীর জঙ্গলে মাছ-কাঁকড়া বা মধু আনতে যাওয়ার আগে মা বনবিবির থানে পুজো দিয়ে যায়। তাছাড়া অঞ্চল বিশেষে বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে বনবিবির থানে বাৎসরিক পুজো দেওয়া হয়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই এই সমস্ত অঞ্চলে বনবিবির থান বেশি দেখা যায়। এছাড়াও আদিগঙ্গার নানা গ্রামীন এলাকায় বনবিবি বহুদিন থেকে পরম্পরায় পূজিত হয়ে আসছেন। বনবিবির থান সাধারণত নদী-খাল-বিল ও গ্রামের প্রান্তীয় এলাকায় দেখা যায়। বনবিবির থানগুলিকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে দেখতে পাব। এই পর্যায়ক্রম হল—বেশ কিছু থান কোনো গাছের তলায় মূর্তিবিহীন ভাবে আছে। সেখানে কোনো মাটির ঢিবিকে বনবিবি মনে করে পূজা দেওয়া হয়। আবার বেশ কিছু থান আমরা দেখব যে বাড়ি থেকে খানিক দূরে কোনো বাগান বা গ্রামের শেষ সীমানায় খড়ের বা টালির ছাউনি ও কঞ্চির বেড়া দেওয়া কাঁচা থান। এছাড়াও আমরা বেশ কিছু থান পাব যার ভীত থেকে শুরু করে তিন দিকের দেওয়াল পাকার ও উপরে ছাদ যুক্ত। কিন্তু এই ধরনের থান খুব কম সংখ্যায় পাওয়া যায়। সুন্দরবনের কাছাকাছি অঞ্চলে ওলাবিবির থানের মত (মাটির তৈরি গোলাকার ঢিবি) মাটির থান দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে, নদীর তীরে আবার কোথাও জঙ্গলের মধ্যে মাটির একটি ঢিবিকেই বনবিবির থান বলে পুজো দিয়ে আসছে জেলে ও মৌলেরা। বনবিবির থান সম্পর্কে বলা যায়—

> এখনো সুন্দরবনের বহু বন-বাদা অঞ্চলে দেখা যায় যেখানে কোনো মূর্তি নেই, এমনকি সামান্য একটা বেদীও নেই। অর্থাৎ নিরবয়ব একটি জঙ্গলে ও হিংস্র প্রাণী পরিপূর্ণ দ্বীপ-ই মা বনবিবির থান বা জঙ্গল নামে পরিচিত।[২৮]

আমরা আর একটা বিষয় দেখেছি যে, বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলে বনবিবির প্রাধান্য আবার কোথাও নারায়ণীর প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। আঠারো ভাটির দখল নিয়ে নারায়ণী ও বনবিবির যে যুদ্ধ হয়েছিল তার কাহিনি আমাদের জানা। এই বিবাদ বড়খাঁ গাজীর মধ্যস্থতায় ও ধর্মীয় সহবস্থানের মধ্য দিয়ে অবসান হয়। কিন্তু আমরা গ্রাম বাংলায় এই সম্প্রীতির অন্য চিত্র দেখতে পাই। উদাহরণ হিসেবে

রায়দিঘির পশ্চিম জটার একটি থানের উল্লেখ করা যায়। সেখানে দেখা যায় যে, মস্ত বড় একটি মাটির স্তূপ আছে যাকে এখানকার মানুষ বনবিবি বলে পুজো করে। আর তার উপরে একটি অজানা গাছকে নারায়ণী হিসেবে পূজা করছে এলাকার মানুষ। গ্রামের সবাই এই গাছটি জঙ্গলকাটির গাছ বলে জানে। অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষ বন কেটে বসত শুরুর সময়কার এই গাছটিকে আবিষ্কার করে। আর আমরা জানি যে নারায়ণীকে বনদেবী বলা হয়। এখানে উল্লেখ করার মত বিষয় হল যে, এই গাছের নীচেই নিতান্ত প্রাকৃতিকভাবে আমরা আর একটি মাটির ঢিবিকে দেখতে পাব, যাকে এলাকাবাসী বনবিবির থান বলে পূজা দিয়ে আসছে। এই অঞ্চলে নারায়ণীর থান আমরা বেশী দেখতে পাই, যেখানে মানুষের যত্নের ছাপ পাওয়া যায়। এবং বনবিবির থান সে তুলনায় কম গুরুত্ব পায়। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের সংঘাত ও সমন্বয়ের ইতিহাস এই দুই লৌকিক দেবীর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি দিয়ে বুঝতে পারি।

বনবিবির বেশ কিছু থানের সঙ্গে মাজারের মিল আছে। বনবিবির এই থান খানিকটা সমাধির মত তৈরি করে। ঠিক যেমন করে আমরা বিভিন্ন গাজীর থান বা মাজারকে দেখতে পাই। বনবিবির এই থান মাটির তৈরি ঢিবি বা খানিকটা সমাধির মতো, আর এর উপরের অংশটা খানিকটা শঙ্কুর মতো দেখতে হয়। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা আগেই রায়দিঘির বনবিবির থানের উল্লেখ করেছি। বনবিবির প্রথম পর্যায়ের থানগুলি এইরকম বলেই মনে করা হয়। এরপর যখন তিনি দক্ষিণরায়কে পরাজিত করেন; এবং কেবল পরাজিত করেই থেমে না থেকে দক্ষিণরায়কে নরখাদক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন বনবিবির মধ্যে মানবিক গুণের সমাবেশ ঘটেছে। এই পর্বে বনবিবি বনের একমাত্র কর্ত্রী হয়ে উঠেন। জল-জঙ্গলের মানুষের কাছে তিনি বেশি করে মানবী রূপ নিয়ে ও তাদের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেন। বনবিবির থানের সঙ্গে বেশ কিছু বিবিমায়ের থানের মিল দেখতে পাওয়া যায়। বিবিমায়ের থানে যেমন মাটির বা সিমেন্টের স্তূপ আছে ও তা সমাধির মত উঁচু জায়গায় অবস্থান করে। আমরা ঠিক একই রকম ভাবে বনবিবির থানকে দেখতে পাই। এই সমস্ত থানে বনবিবির কোনো মূর্তি থাকে না। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিবিমায়েরও কোনো মূর্তি দেখা যায় না। আমরা জানি যে মুসলমান সংস্কৃতিতে মূর্তি পুজো নেই। ফলে বনবিবি যখন প্রথম পর্যায়ে হিন্দুদের দেবী হয়ে উঠতে পারেনি সেই পর্বে তার থানগুলো মাজারের মত ছিল ও সেই থানে কোনো মূর্তি

ছিল না। বনবিবির মাহাত্ম্য ও বনদেবী হওয়ার পিছনে নানা কাব্য-কাহিনি যেমন কাজ করেছে ঠিক তেমনি আবার মুসলমান শাসনকাল থাকার কারণে তার এই প্রচার আরও জোর পেয়েছে। এই সমস্ত কারণের জন্যে আমরা দেখতে পাই দক্ষিণরায় ও নারায়ণীর জায়গায় স্থান করে নিয়েছে বনবিবি। এই পর্বেই আমরা দেখতে পাই বনবিবির মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনিযুক্ত থানে আশ্রয় হচ্ছে ও থানে বনবিবির মূর্তি পুজো হচ্ছে। বর্তমানে আমরা বনবিবির বেশিরভাগ থান দেখতে পাই সুন্দরবন অঞ্চলসহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে। বাদাবন অঞ্চলে বনবিবির প্রাধান্যের কারণ আমাদের সবার জানা। জল-জঙ্গলে মাছ, মধু কাটতে যাওয়ার সময় তাদের একমাত্র রক্ষা করে বনবিবি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত অঞ্চলে তার থান সংখ্যায় বেশি নজরে পড়ে। কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে মানুষের জল-জঙ্গলের উপর নির্ভরতা কমেছে সেখানে বনবিবির প্রভাব কমেছে। সেখানে বনবিবির জায়গায় স্থান করে নিয়েছে নারায়ণী ও পুত্র দক্ষিণরায়। দক্ষিণবঙ্গের যে সমস্ত অঞ্চলে বনবিবির থান দেখা যায় সেগুলি বেশিরভাগ সুউচ্চ নয়। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র বনবিবির থান মাটির হয়ে থাকে। আর পাকার হলেও তা টালির ছাউনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি বনবিবিকে পুজো করে জেলে, মৌলে সম্প্রদায়। ফলে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের দ্বারা পূজিত হওয়ার জন্য এই দেবীর থান কোনো উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি। অপরদিকে শহর লাগোয়া মানুষের জীবিকার ধরণ বদলের জন্য বনবিবির যে থানগুলো আছে তাকেও সংস্কারের বিশেষ তাগিদ দেখতে পাওয়া যায় না।

(গ) আটেশ্বরের থান

আটেশ্বরের থানগুলি সাধারণত এর কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। কেননা আটেশ্বর কোথাও পশুরক্ষক দেবতা, কোথাও ইনি অপবেদতা আবার কোথাও ইনি ক্ষেত্রপাল। *বাংলার লৌকিক দেবতা* গ্রন্থে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেছেন—

> আট(বা দমদমা) মানে উঁচু জমি, দেবতা উঁচু জমিতে বসে সব দিক দেখেন বা রক্ষা করেন, তাই একে আট বলে।[২৯]

আটেশ্বরের থান কোনো খেতের পাশে বা কোনো নদীর পাড়ে, সমতল থেকে বেশ খানিক উঁচু জমিতে দেখতে পাওয়া যায়। আটেশ্বরের থানগুলি প্রায় সর্বত্র পাকা দেখতে পাওয়া যায়। খুব কম জায়গায় ইনি

টালির ছাউনিযুক্ত থানে থাকেন। কোনো কোনো জায়গায় যেখানে আটেশ্বরকে অপদেবতা বলা হয়, সেখানে ইনি গাছে থাকেন। ফলে ওই গাছকেই আটেশ্বরের থান হিসেবে পুজো করা হয়। ক্ষেত্রপালের থান নিয়ে বলা হয়—

> বেশ কয়েকটি বড় বড় গাছের তলায় জমি থেকে বেশ কিছুটা উচ্চস্থানে বাবা ক্ষেত্রপালের থান।...ক্ষেত্রপালের মাথার উপর আচ্ছাদন বলতে একটা সিমেন্টের ছাতা আছে। পূর্বে কাপড়ের ছাতা ছিল। মন্দির তৈরি নিষেধ থাকায় খোলা আকাশের নীচে একমাত্র ছাতার নীচে ক্ষেত্রপাল ঠাকুর সকলের পূজা নিয়ে চলেছেন।[৩০]

আদিগঙ্গার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষত মজে যাওয়া গঙ্গার পাড়ে ও গ্রামের ভিতর দিয়ে যে সমস্ত রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে, এই সমস্ত নদীর পাড় ও রাস্তার ধারেই আটেশ্বরের থান দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তিন দিক ইঁট বা সিমেন্টের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এবং ছাদ টালি বা এসবেস্টস দিয়ে তৈরি। এইসমস্ত থানে গদা হাতে আটেশ্বরের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোথাও কোথাও ইনি অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে মিলিত ভাবে একই থানে থাকেন।

(ঘ) নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের থান

সুন্দরবন অঞ্চলে আরও একটি জাগ্রত লৌকিক দেবী হলেন নারায়ণী। নারায়ণীর প্রতাপ যে প্রবল ছিল বিভিন্ন সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে জানতে পারা যায়। বনবিবির সঙ্গে নারায়ণীর যে যুদ্ধ তার সঙ্গে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস যুক্ত আছে। আমরা জানি যে বনবিবি প্রথমে বনের দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাননি। বাংলায় মুসলিম রাজত্ব শুরু হলেও এই আদিগঙ্গার বেশ কিছু অঞ্চলে মুসলমানরা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ হিসেবে জানতে পারা যায় যে, এই নারায়ণী ও তাঁর পুত্র দক্ষিণরায়ের বিশাল সৈন্য এদের রুখে দেয়। অন্যান্য পীর-পিরাণীর মতো ধর্ম প্রচারের জন্য বনবিবি বাংলায় হাজির হয়। দক্ষিণবঙ্গে নারায়ণীর মূর্তি দুইভাবে পাওয়া যায়, তাই এর যে থান তাকেও আমরা দুইভাবে পাই। কোথাও কোথাও এই দেবীর থান কোনো গাছের নীচে বা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় যে দুটি বারা মূর্তি একত্রে আছে খোলামেলা জায়গায় বা ছোট একটি খড় ও মাটির দেওয়াল যুক্ত থানে—

বারা মূর্তি-গৃহস্থ গৃহের বাইরে মাঠ-ঘাট, গাছতলা বা জলাশয়ের ধারে বারামুণ্ড মূর্তির পূজা হয়। এই মূর্তির বিসর্জন হয় না, খোলা আকাশের নীচে থেকে সারা বছরের রোদ-ঝড়-জল ভোগ করতে হয় একে।[৩১]

এই যে দুটি বারা মূর্তি তার একটি হল দক্ষিণরায় ও অপরটি হল দক্ষিণরায়ের মা নারায়ণী। আবার কোথাও কোথাও, বিশেষত আদিগঙ্গার দক্ষিণ অংশে নারায়ণীর পাকা থান দেখতে পাওয়া যায়। খাঁড়ি অঞ্চলে নারায়নীর পাকা থান দেখা যায়। দক্ষিণরায়কে নারায়ণীর পুত্র বলা হয়। বন জঙ্গলে পূর্ণ দক্ষিণবঙ্গে এনার প্রভাব প্রবল। দক্ষিণরায়ের থান সম্পর্কে বিনয় ঘোষ *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* গ্রন্থে বলেছেন—

...সভ্য গ্রামের মধ্যেও দক্ষিণরায় দেবতার কোথাও কোথাও মন্দির আছে, কিন্তু সাধারণতঃ বৃহৎ প্রাচীন বট অশ্বত্থ, বিল্ব নিম্বাদি বৃক্ষতলেই তাঁহার আশ্রম। কোথাও মাটির ঢিবি, কোথাও সিন্দুর মণ্ডিত প্রস্তর খণ্ড, কোথাও বা দেবতার কল্পিত মুণ্ডমাত্র প্রতিমারূপে স্থাপিত। সুন্দরবনের প্রত্যেক নদী ও খালের তীরবর্তী প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন বৃক্ষতলেই এই দেবতার পূজা হয়। অনেক স্থলে বৃক্ষের শাখার উপরও দেবতার মুণ্ডমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।[৩২]

আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে বহু জায়গায় দেখেছি যে, কোনো প্রাচীন বৃক্ষতলায় দক্ষিণরায়ের বারামূর্তি সমেত থান আছে । এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে থাকার কারণ হিসেবে বলা যায় যেহেতু তিনি এক সময় বনদেবতা হিসেবেই পূজিত হতেন তাই সেই ঐতিহ্যকে মনে রেখে লোকায়ত মানুষ তাকে ঝোপঝাড় বা উন্মুক্ত স্থানেই রাখতে ভালোবাসেন—

দক্ষিণরায় সাধারণত উন্মুখ প্রাঙ্গণে বা বৃক্ষতলে অথবা পর্ণকুঠিরে পূজা পেয়ে থাকেন।[৩৩]

দক্ষিণরায়ের বারামূর্তির পুজো আমাদের কাছে লৌকিক দেবদেবীর থানকে পাঠের নতুন দিক খুলে দেয়। দক্ষিণরায়ের বারামূর্তি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে ‘বারা’ কী তা জানা প্রয়োজন। ‘বারা’ বলতে সাধারণত ঘট বা পাত্রকে বোঝায়। মনসা, শীতলা ও চণ্ডীর ঘটকেও বারা বলা হয়। তবে দক্ষিণবঙ্গে ‘বারা’ বলতে সাধারণত দক্ষিণরায়ের মূর্তিকে বুঝিয়ে থাকে। ঘটের মতো দেখতে এই পাত্রটি উল্টানো অবস্থায় একটি সরার মধ্যে থাকে। এই পাত্রের উপরে একটি মুকুটের চুড়োর মতো উঠে যায় এখানে মানুষের আকৃতি আঁকা থাকে। লোকায়ত সমাজ একেই বারা বলে থাকে যা দক্ষিণরায় হিসেবে পূজিত হয়। অনেকে এই বারা মূর্তিকে আদিম মুণ্ড-পূজা ও আদিম উর্বরতা সহায়ক

নৃ-মুণ্ড পূজার কৃষিদেবতা বলে মনে করেছে। এই মুণ্ড পূজার সঙ্গে আমরা লোকায়ত মানুষের পূর্বপুরুষ প্রসঙ্গ খুঁজে পাই। এই প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদ সঞ্জয় ঘোষ বলেছেন—

> আদিম মানুষের সমাজে পূর্বপুরুষ পূজার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ...হাজারো প্রতিকূলতার সামনে শিশুর মত অজ্ঞান ও অসহায় সেই মানব সমাজের একমাত্র ভরসাস্থল ছিল প্রবীণ প্রবীণাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। ...প্রবীণ প্রবীণাদের মৃত্যুকে তাই তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারত না। ভাবত ঘুমের মতই সাময়িক এক প্রক্রিয়া- যার পরে তাঁরা জেগে উঠে আবার আগের মতই সমস্ত প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার পথ দেখতে থাকবেন।[৩৪]

আদিম সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ মরে গেলে তার জীবনের সমাপ্তি বলে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষরা ভাবত না। আদিম মানুষ ভাবত যে মৃত্যুর পরেও তাদের পূর্বপুরুষ গোষ্ঠীর ভালো-মন্দের দিকে লক্ষ রাখে। এই ধারণার থেকে পূর্বপুরুষ পূজা বা মুণ্ডপূজার উৎপত্তি। এই বারামূর্তির পুজো সেই ধারণাকে সামনে আনে। কেননা বারামূর্তি মানুষের মাথার খুলির মতো হয়ে থাকে। এই বারামূর্তি ও তার সঙ্গে মাথার খুলির সাদৃশ্য দেখে লোকায়ত মানুষের পূর্বপুরুষ পূজার প্রসঙ্গ জুড়ে আছে বলে মনে হয়। বারামূর্তি বা বারা ঠাকুরের থান বাংলার গ্রামীন পরিবেশে কোথায় কোথায় দেখতে পাওয়া যায় তার একটি তালিকা সঞ্জয় ঘোষ আমাদের জনিয়েছেন—

> (১) ঘরের ভিতরে; (২) গৃহের আঙিনায়; (৩) গ্রামের নিকটে প্রান্তরে গ্রাম সর্বজনের থানে ...(৪) গ্রামের বাইরে এই পূজা আগে জঙ্গলে হত- এখন নিকটেই কোনো প্রান্তরে বা বাগানে ঝোপঝাড়ে হয়।[৩৫]

আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, এই বারা ঠাকুরের থান গৃহের আঙিনা থেকে লোকায়ত সমাজের সর্বত্র দেখা যায়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বনবিবির সঙ্গে পরাজয়ের আগে দক্ষিণরায়ের প্রভাব এই সমস্ত অঞ্চলে প্রবলভাবে ছিল ও তা বনদেবতা হিসেবেই ছিল। ঠিক যেমন করে বিশালাক্ষী পূজিত হত বা আজও বনদেবী হিসেবে পূজিত হয়। কিন্তু বনবিবির কাছে পরাজয় ও মুসলিম শাসনপর্বে বনবিবির প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। আর এই ধর্মের রাজনীতির শিকার হয়ে দক্ষিণরায় পরিণত হয় নরখাদকে; আর বনবিবির উপর মানবিক গুণ আরোপিত হয়ে জল-জঙ্গলের মানুষের কাছে রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে পূজিত হয়। এরপর থেকে দক্ষিণরায় বনদেবতা বা বাঘের দেবতা হিসেবে মানুষের গুরুত্ব হারাতে থাকে। দক্ষিণরায় এই পর্বে বাস্তদেবতা, নানা রোগ-নিরাময়ের দেবতা আবার কোথাও কোথাও তিনি ক্ষেত্রপাল হিসেবে পূজিত হয়। আর এই ভূমিকা বদলের মধ্য দিয়ে আজও

দক্ষিণরায় সমানভাবে পূজিত এক লোকদেবতা। আমরা দক্ষিণরায়ের ক্ষমতার বদল হয়ে যাওয়ার সঙ্গেই তার থানের স্বরূপ ও অবস্থান বদলের দিকটিও দেখতে পাব। আমরা বেশ কিছু থানে দেখতে পাই দক্ষিণরায় বন্দুকধারী যোদ্ধার বেশে পূজিত হয়। বারুইপুরে ধপধপি ও জয়নগরের খনিয়া শাহাজাদপুরে দক্ষিণরায়ের এমন মূর্তি দেখা যায়। আমরা দেখেছি যেখানে দক্ষিণরায় বন্দুকধারী মূর্তি সমেত পূজিত হচ্ছে এবং এই থান পাকা ও বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। এখানে প্রতিদিন পুজো দেওয়া হয়। এছাড়া বাকি দক্ষিণরায়ের থানগুলি প্রায় সবই মাটির ও খড়ের ছাউনিযুক্ত। এখানে প্রতিদিন পুজো দেওয়া হয় না; সপ্তাহের শনি বা মঙ্গলবার পুজো দেওয়া হয়। আমরা দক্ষিণরায়ের আর একপ্রকার থান পাব যা এই সমস্ত অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। দক্ষিণবঙ্গের আদিগঙ্গা বরাবর অসংখ্য বারামূর্তি সমেত থান খোলা আকাশের নিচ থেকে ঝোপঝাড়, রাস্তার ধারে ও পুকুরের পাড় পর্যন্ত অবস্থিত হতে দেখা যায়। আমাদের ধারণা দক্ষিণরায় বাদাবনে নিজের ক্ষমতা হারিয়ে এইভাবে বারামূর্তির মাধ্যমে নিজের অধিকার জানান দিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে কোথাও তিনি বাস্তদেবতা, ক্ষেত্রপাল আবার কোথাও সন্তান উৎপাদন শক্তির দেবতা হিসেবে পূজিত হচ্ছেন। দক্ষিণরায়ের বাস্তদেবতার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, বাড়ির উঠোনে বা উঠোনের প্রান্তে একটি ছোট জায়গা পরিষ্কার করে দুইটি বারামূর্তিকে রাখা হয়। আবার কোথাও দেখা যায় মাটি দিয়ে একটি ছোট খুপরির মতো ঘর করে সেখানে বারামূর্তি রাখা হয়েছে; এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এই থানেই পুজো দেওয়া হয়। এইরকম থান আমরা দক্ষিণ বাংলার বিশেষত আদিগঙ্গার তীর বরাবর যে গ্রামগুলি আছে তার প্রতিটি বাড়িতেই দেখতে পাওয়া যায়। এইক্ষেত্রে আমরা দক্ষিণরায়ের যে থান পাব তা সাধারণত মাটির হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়—

> দক্ষিণরায়ের পাকা বা ইঁটের তৈরী মন্দির বিরল, ইনি খড়ে ছাওয়া মাটির থানেই বেশী ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন।[৩৬]

আবার যেখানে তিনি ক্ষেত্রপাল হিসেবে পূজিত হচ্ছেন সেখানে তার থান কোনো মাঠের পাশে বা শস্যক্ষেতে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা যেমন করে আটেশ্বরের থান দেখি ঠিক এক ভাবেই কোনো উঁচু ঢিবি উপর বারামূর্তিকে রেখে থান তৈরি হয়। বারামূর্তির সঙ্গে ফার্টিলিটি কাল্টের ধারণা যুক্ত আছে। আমরা বারামূর্তির মধ্যে দেখতে পাই নারী ও পুরুষের যৌন মিলনের প্রসঙ্গ। এছাড়া বারামূর্তিকে অনেক সময় রাখা হয় বিয়ে দেওয়া বট ও অশ্বত্থের গাছের নীচে। এইখানে আমরা

ফার্টিলিটি কাল্টের ধারণা পাই ও সঙ্গে সঙ্গে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধারণার পাওয়া যায়। এছাড়া বারামূর্তির সঙ্গে মনসা সীজের সম্পর্ক আছে। মনসা সিজের নীচে বারামূর্তির স্থাপন আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। দক্ষিণরায়ের বারামূর্তির মধ্যেই আমরা এর প্রজননকেন্দ্রিক মানসিকতার ছাপ দেখতে পাই। আমরা দক্ষিণরায়ের বারামূর্তিতে দেখতে পাই যে, এই মূর্তির মাঝখানে ছিদ্র করা এবং মূর্তিটিকে একটি ছিদ্রযুক্ত সরার উপর স্থাপন করা হয়। সেই ছিদ্র বরাবর একটি বাঁশের কঞ্চি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্রবেশ করা হয়। বারামূর্তির এই অবস্থানের মধ্যেই এর প্রজননকেন্দ্রিক মানসিকত ধরা আছে—

> এই লাঠি লিঙ্গের ও ঐ ছিদ্রযুক্ত সরা যোনির প্রতীক তাৎপর্য বহন করে। দুয়ে মিলে, লিঙ্গ ও যোনিপট্টযুক্ত পাথরের শিবলিঙ্গ যে তাৎপর্য বহন করে, সেই একই তাৎপর্য বহন করে লাঠি ও সরা।[৩৭]

দক্ষিণরায়ের থান বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। কোথাও তিনি মূর্তি সমেত পাকা মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন আবার কোথাও তিনি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, খোলা আকাশের নীচে, ঝোপঝাড়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পূজিত হয়ে আসছেন।

(ঙ) পঞ্চানন্দের থান

আদিগঙ্গার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহুল পূজিত লৌকিক দেবতা হলেন পঞ্চানন্দ। এই লৌকিক দেবতার থান অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রাম ও পাড়ায় দেখতে পাওয়া যায়। এই দেবতার থানকে দিয়ে আমরা মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির ও সর্বোপরি অর্থনীতির বিকাশের ধারাকে পাঠ করতে পারব। আমরা দক্ষিণবঙ্গে পঞ্চানন্দের থানকে বিভিন্ন ভাবে দেখতে পাই। এই থানগুলিকে মোটের উপর তিনিটি ভাগে দেখতে পারি। যেমন বেশ কিছু থান মাঠের ধারে, গ্রামের মধ্যে কোনো রাস্তার ধারে, পুকুরের পাড়ে, বিভিন্ন গাছের তলায় খোলা আশের নীচে দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো থান পাকার অর্থাৎ ছাদযুক্ত থান। আবার বেশ কিছু থান পাব যেগুলির ভীত ও তিন দিক পাকার হলেও তাতে কোন ছাদ দেওয়া হয়নি। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, এই লৌকিক দেবতা কোনো আবদ্ধের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে না। এই লৌকিক দেবতা উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রাকৃতিকভাবে থাকতে পছন্দ করেন। এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছেন—

প্রাচীন দুটি বাঁধানো অশ্বত্থ গাছের তলায় পঞ্চানন্দ ঠাকুর বিরাজ করেন, কোনো মন্দির নেই।[৩৮]

বিনয় ঘোষ জয়নগর-মজিলপুরে পঞ্চাননের যে থান আছে তার পরিচয় দিয়েছেন—

> পণ্ডিতপাড়ার পঞ্চানন্দ ও শীতলা পাশাপাশি বিরাজমান, রাস্তার তেমাথার মোড়ে একটি সাধারণ ইঁটের ঘরে। আগে চালাঘর ছিল।[৩৯]

আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় দেখেছি যে, জয়নগরের কয়াল পাড়া ও রক্তাখাঁ পাড়ায় পঞ্চাননের থানগুলি এখনও একইভাবে আছে। রক্তাখাঁ পাড়ার পঞ্চানন্দ যদিও পাকার থানে আছেন। থানটি আদিগঙ্গার পাড়েই অবস্থিত। থানটি বেশি বড় নয়, থানের ভিতরে বেশ খানিক গর্তের ভিতর পঞ্চানন্দ বিরাজ করেন। আবার পাল পাড়ায় দেখতে পাব যে, একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছের নীচে পঞ্চাননের থান। তেঁতুল গাছটিকে বেদির মতো করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মানুষদের থেকে শোনা যায় যে তারা একবার এই থানটিকে পাকা করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পঞ্চানন্দ তাদের আদেশ দেন যেন তাকে আবদ্ধ না করা হয়। কেননা তিনি খোলা আকাশের নীচে থাকতে পছন্দ করেন। আবার পঞ্চানন্দের থান কোথাও পর্ণকুটিরের মতো বিরাজ করে। কাশিনগরে মাইবিবির হাট বিবিমার নাম থেকে হয়েছে। এই হাটেই পঞ্চানন্দের থান আছে। এই হাটে পঞ্চানন্দের থান সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেন—

> হাটের মধ্যে একাধিক লোকদেবতারা অধিষ্ঠিত আছেন। তার মধ্যে প্রধান পঞ্চানন্দ ঠাকুর ও শীতলা ঠাকুর। পঞ্চানন্দ ঠাকুর হাটের মধ্যে পর্ণকুটিরেই প্রতিষ্ঠিত।[৪০]

আমরা আর একটি থানের উল্লেখ করব, করঞ্জলির পঞ্চানন্দ ওই গ্রামের প্রধান গ্রামদেবতা। এই পঞ্চানন্দের থান সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেছেন—

> সর্দার পাড়ার (মাহিষ্য) বাবা ঠাকুরের মূর্তিটি বিরাট এবং কোন ইঁটপাথরের কিছু না থাকলেও বাবা ঠাকুরের টিনের ঘরটি ও তার সামনের মণ্ডপটি বেশ জমকালো।[৪১]

আমরা পঞ্চানন্দের থানের অবস্থান সম্পর্কে বলেছি যে, এই সমস্ত থান সাধারণত বৃক্ষের তলায়, রাস্তার ধারে মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিরাজ করেন—

> পঞ্চাননের থান বৃক্ষতলে অবস্থিত। কোথাও কোথাও বট, অশ্বত্থ, শেওড়া ও বন্য বৃক্ষতলে। বেশিরভাগ থান কাঁচা বা মাটির।[৪২]

আমরা যেখানে পঞ্চানন্দের পাকার থান দেখেছি সেখানে তিনি বেশ রাজকীয়ভাবেই বিরাজ করেন। এবং যে পাকার থানে তিনি থাকেন সেখানে তিনি প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হন। পঞ্চানন্দের থানগুলি সাধারণত কোনো প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় থাকতে দেখা যায় আর সেই কারণে এই গাছের কেউ ক্ষতি করে না। আমরা দেখেছি যে গ্রামের মানুষ বট ও অশ্বত্থের বিয়ে দিয়ে বা পুজো করে রোপন করে ও সেখানে যে থান নির্মাণ করে তা সাধারণত পঞ্চানন্দের হয়ে থাকে—

> বিশেষত পাকা মন্দিরে ইনি বেদীর উপর উপবিষ্টই থাকেন। এঁর মন্দিরগুলি গাছের তলায় নির্মিত হয়, শহর অঞ্চলেও এঁর মন্দিরে বট অশ্বত্থ গাছের চারা রাখা আবশ্যিক করণীয়।[৪৩]

(চ) লোকায়ত শিবের থান

লোকায়ত শিবকে ঘিরে বাংলার লোকায়ত সমাজে চৈত্র মাসে চড়ক, গাজন প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির পরিসর তৈরি হয়। আমরা জানি যে শিবের একটি রূপ শাস্ত্রীয় আছে। আর একটি রূপ ধরা আছে লোকায়ত সমাজ-সংস্কৃতিতে। এই লোকায়ত শিব চাষবাস থেকে শুরু করে মাছ ধরতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আদিম সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে ধরা দেয়। এই শিব খুব সহজেই গ্রামীন মানুষের উপাস্য হয়ে উঠেছে তাঁর নানা কাজের ও স্বভাবের মধ্য দিয়ে। আসলে লোকায়ত শিবের মধ্যে আমরা আদিম সমাজ ব্যবস্থার নানা উপাদান খুঁজে পাই। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে সব থেকে বেশি এই লৌকিক দেবতার থানকে খুঁজে পেয়েছি। লোকায়ত শিবের থানকে আমরা কয়েকভাবে পাই— প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো বৃক্ষতলায়, নদীর পাড়ে একটি উঁচু বেদী করে তার উপর শিবলিঙ্গের পুজো করা হয়। এই যে বৃক্ষতলায় বা নদীর ধারে শিবের থান আমাদের আদিম সমাজের কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রতীক বলে মনে করা হয়। এছাড়া আমরা শিবের থান দেখতে পাই শ্মশানে। আমরা দেখেছি যে শ্মশানের পাশেই কোন পাকার থানে শিবের মূর্তি রাখা হয় ও সেই থানকে বলা হয় বড় কাছারির থান। এই থানকে ঘিরে লোকায়ত মানুষের মুখে মুখে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে। আর সেই সমস্ত কাহিনির বেশিরভাগই হল ভৌতিক কাহিনি। আমরা আদিগঙ্গার তীরে অসংখ্য শিবের পাকার থান দেখতে পাব। এই থানগুলি একই সরলরেখা বরাবর অবস্থান করেছে আবার কোথাও এককভাবে অবস্থান করতে দেখা যায়। এই থানগুলির মধ্যে আমরা বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের মন্দির শিল্পের প্রভাব স্পষ্ট দেখতে পাই। এই যে থানগুলি তার বেশিরভাগ তৈরি হয়েছে

পাল ও গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে। লোকায়ত সমাজে বহুল পূজিত এই লোকায়ত শিবের থান গ্রামের কেন্দ্র থেকে প্রান্তে সব জায়গায় দেখা যায়।

(ছ) ওলাবিবির থানের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে বিশেষকরে সোনারপুর, বারুইপুর, জয়নগর-মজিলপুর হয়ে ছত্রভোগ প্রভৃতি অঞ্চলে জাগ্রত লৌকিক দেবী হলেন ওলাবিবি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন স্থানে ওলাবিবির থান দেখতে পাওয়া যায়। এই ওলাবিবির সঙ্গে কোথাও কোথাও তাঁর অন্য বোনদের দেখতে পাওয়া যায়। তাই দক্ষিণবঙ্গে এদের সাতবিবি বা নয়বিবি বলে সম্বোধন করা হয়—

> অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মত ওলাবিবি পূজা কাহারও গৃহে বা বাস্তুভূমিতে হয় না বা ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে ইনি প্রতিষ্ঠিত হন না। ওলাবিবি পল্লীর বৃক্ষতলে পর্ণকুটীরে এঁর অপর ছয় ভগ্নীর সহিত থাকেন; সেইজন্য ওলাবিবির থানকে সাতবিবির থানও বলা হয়।[৪৪]

ওলাবিবি এই সমস্ত অঞ্চলে সবথেকে বেশি জাগ্রত গ্রাম্য লৌকিক দেবী। গ্রামীন লোকসমাজ কলেরা, ভেদবমি ও জলবাহিত যে কোনো রোগ হলে এই দেবীর শরণাপন্ন হয়। ফলে এই সমস্ত রোগের নিরাময় কল্পনা থেকে বিবিমা বা ওলাবিবির উত্থান। এই সমস্ত অঞ্চলে গ্রামের মধ্যে, কোনো মাঠের মধ্যে, ঝোপঝাড়ের ভিতর ও রাস্তার মোড়ের ধারে অসংখ্য থান দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে বা মাঠের মাঝে জমি থেকে সামান্য উঁচুতে সাতটি পাথর বা মাটির স্তূপকে সাতবিবির থান বলা হয়। কোথাও কোথাও আবার জমি থেকে আট-দশ হাত উপরে সিমেন্টের বেদীর উপর সাতবিবির থান দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ধরনের থান সংখ্যায় কম। সাতবিবির থান সাধারণত রাস্তার ধারে ভূমি থেকে সামান্য উচ্চতায় অবস্থান করে। এছাড়া বেশ কিছু পাকা বা মাটির থানে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে সাতবিবিকে থাকতে দেখা যায়। এই সাত বিবির থান সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেছেন—

> খড়ের চালা ঘরের মধ্যে সাতটি ছোট-ছোট মাটির ঢিবির (সমাধিচিহ্ন) সামনে তিনটি মাতৃমূর্তি, রঙিন মাটির পুতুল। ...খোলা মাঠের মধ্যে গাছ তলায় বিবিমাতলা। ঝড়বৃষ্টিতে মাটির বিবিমা ও সমাধিঢিবির কি অবস্থা হয় জানি না, কিন্তু উন্মুক্ত আকাশের তলায় বিবিমার মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়াতে হয়।[৪৫]

বর্তমানে ওলাবিবির পাকার থানও দেখা যায়; পাকার থান বলতে বোঝায় যে, সিমেন্টের বেদী করে তাতে সাতটি বা নয়টি সিমেন্টের বিবিমায়ের মূর্তি করে তৈরি হয় বিবিমায়ের থান। এই পাকা

থানটিকে সাধারণত লালা রঙের করা হয় ও তা খোলা আকাশের নীচেই থাকে। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণকালী মণ্ডল জানিয়েছেন—

> ওলাবিবির পাকা থান ও মন্দির কিছু কিছু আছে- কিন্তু তা কমই- বেশিরভাগই গ্রামে একথানে, অশ্বত্থতলায়, বা কোন সাধারণ স্থানে, পুকরপাড়ে, মাঠের এককোণে ওলাবিবির কাঁচা মাটির থান থাকে। ...এখন অবশ্য অনেক স্থলেই খড়ের চাল ও কাঁচা মাটির দেওয়াল দেওয়া থান দেখতে পাওয়া যায়। টালির চালা বা পাকা মন্দির কমই।[৪৬]

দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক ওলাবিবির থান দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণবঙ্গের বহু থান জঙ্গলকাটির সময়ের। মানুষ যখন জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে; সেই সময় তারা দেখতে পায় এই দেবীকে ও পরে তারা এই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবেই তৈরি হয়েছে বেশ কিছু বিবিমায়ের জঙ্গলকাটির থান। এছাড়া কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় যে বিবিমা কোন ব্যক্তিকে স্বপ্নে বলেছেন কোন নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর থানটি প্রতিষ্ঠা করতে। যদিও এই স্বপ্নাদেশ পাওয়া ও দেবদেবীর থান নির্মাণ প্রায় সব লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কে বলা যায়। সাতবিবির থান সম্পর্কে বলা হয়—

> নদীর দক্ষিণ তীরে খেতের মাঝে একটি অতি বড় মোল-পাথরের উঁচু টিলা। টিলায় দেবীর থান। সমতল থেকে অন্তত চব্বিশ ফুট উঁচু। একটি প্রকাণ্ড বট গাছ। চারদিকে লুয়াজঙ্গল, ক্যাঁদ, আসন, শ্যাওড়া প্রভৃতি গাছের আবেষ্টনীর মধ্যে সাতবইনীর থান।[৪৭]

আমরা আগেই বলেছি যে, ওলাবিবি গ্রাম্য দেবী। ফলে এর থান পাড়ার মোড়ে মোড়ে, রাস্তার ধারে, বাড়ির উঠোনে দেখা যায়। এছাড়াও ওলাবিবির থান একেবারে গ্রামের প্রান্তীয় এলাকায়, কোনো গভীর জঙ্গলের মধ্যে, কোনো শ্যাওড়া গাছের তলায় সামান্য জমি পরিষ্কার করে তৈরি করা হয়। একথা বলার কারণ এই যে এই ওলাবিবির থানের বিস্তার গৃহের উঠোন থেকে একেবারে গ্রামের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিরাজ করে। আর এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় ওলাবিবি বা বিবিমায়ের জনপ্রিয়তা। ওলাবিবির থান সম্পর্কে বলা হয়—

> পল্লীর এক প্রান্তে একটি পরিষ্কার থানে(স্থানে) একটি উঁচু বেদীর মত করে তার উপর একটি শঙ্কুর মত মাটির ঢিবি করা হত। এটিই মা ওলাবিবির প্রতীকী থান।[৪৮]

(জ) মনসার থান

দক্ষিণবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানে সাপের উপদ্রব মানুষের প্রতিদিনের সমস্যার মধ্যে অন্যতম। নদী, খাঁড়ি, বন-জঙ্গলে মানুষকে যেতে হয় জীবিকার জন্য। আর এই সমস্ত এলাকায় সাপের কামড়ে মানুষের প্রতিনিয়ত মৃত্যু ঘটে। ফলে সমস্ত দক্ষিণবঙ্গে মূলত সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়া ও প্রজননকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাসের উপর ভর করে লোকায়ত মানুষ মনসার পুজো করে। এছাড়াও এই এলাকার প্রতিটি বাস্তু ভিটেতে মনসার থান দেখা যায়। এই বাস্তু থান মূলত ভিটের ও গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় তৈরি হয় । আমরা নিম্নবঙ্গের মনসার থান রাস্তার ধারে বা বাড়ির উঠোনে একটি মনসা গাছের তলায় (এক প্রকার ক্যাকটাস জাতীয় গাছি, যার পাতা সাপের ফনার মত) একটুখানি জায়গা পরিষ্কার করে, তিনটি ইঁট তিন দিকে আড়াআড়ি ভাবে বসিয়ে দিয়ে তার উপর একটি ইঁট রেখে ছোট ঘরের মতো করে তৈরি হয় মনসার থান। এই থান আমরা বাংলার প্রায় প্রতিটি গ্রাম, পাড়া ও বাড়ির উঠোন থেকে শুরু করে রাস্তার দুই পাশে দেখতে পাব। কোনো কোনো জায়গায় এই ঘরটিও তৈরি করা হয় না। মনসা গাছের নীচেই থান ভেবে পুজো দেওয়া হয়।

মনসার জন্ম-বৃত্তান্তের সঙ্গে প্রজননকেন্দ্রিক জাদু-বিশ্বাস জুড়ে আছে। এছাড়া মনসার জন্ম পদ্মপাতার বৃত্তান্তে বয়ে আনে আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে। বাংলার নানা জায়গায় মনসার থান খোলা আকাশের নীচে, মনসা সীজের তলায় হওয়ার মধ্য দিয়ে আসলে সেই আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে। মিহির চৌধুরী কামিল্যা মনসার থানগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—

> ক) সমতল ছাদ-বিশিষ্ট বড় ইঁটের মন্দির। এগুলি বড় সাম্প্রতিক তৈরী। খ) মাটির দেওয়াল, খড় বা কর্গেট বা টালি প্রভৃতির ছাউনিযুক্ত মন্দির। গ) উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বা গাছতলায় মাটির বা সিমেন্টের বেদী বা বেদীহীন থান। এমন থান যত্রতত্র, ঝোপ, ঝাড়ে, পথে, ঘাটে বিদ্যমান।[৪৯]

তিনি মনসার থানের বিবর্তনের যে ক্রম তৈরি করেছেন সেটাকে আমরা নীচের দিক থেকে পড়ব। কেননা থানের এই বিবর্তন ধারা পাঠের মধ্য দিয়ে অনার্য, তান্ত্রিক, লৌকিক দেবী থেকে মনসার শাস্ত্রীয় দেবী হয়ে ওঠার ইতিহাস বুঝতে পারব। আমরা জানি যে সর্পপূজার মধ্য দিয়েই আসলে মনসার দেবী হয়ে ওঠার প্রাথমিক যাত্রা শুরু। মনসার থানগুলো বন-জল-জঙ্গল ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে পাওয়া যায়। কোথাও আবার গাছের পাতায় মনসার থান হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়

যে, সেই সমস্ত পাতাগুলোতেই মনসার থান হিসেবে বিবেচিত হয় যাদের আকৃতি সাপের ফনার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। এর থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, মনসার দেবীমূর্তির আগে লোকায়ত মানুষ সর্প পুজো করত। এরপরে মনসাকে এই সর্পদেবী হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে। কিন্তু এই সর্পদেবীর প্রতিষ্ঠার কাহিনি আমরা সবাই জানি নানা মঙ্গলকাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে। সেখানে মনসার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কাহিনি ও আর্য সমাজের সঙ্গে তার বোঝাপড়ার ইতিহাস আমরা দেখতে পাব। এই লৌকিক দেবী লোকায়ত মানুষের কাছে চরম ভয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছে। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নান্দনিক বোধের উন্মেষ ঘটে। আমরা মনসার বহু থানে দেখতে পাব খড়ের ছাউনিযুক্ত। যদিও এই পর্বে আমরা যে সমস্ত থান পাই তাতে প্রাকৃতিক উপাদান বেশ পরিমাণ ব্যবহার করা হত। এরপর মনসার থানের অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনের ধারায় আমরা মনসার ছাদযুক্ত পাকা থান বা মন্দির দেখা যায়। এই যে ঝোপঝাড়ে, খোলা আকাশের নীচের থান থেকে একেবারে ছাদযুক্ত পাকা থান বা মন্দিরে উন্নীত হওয়ার মধ্যে ধরা আছে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাস। মনসার থান মন্দিরে উন্নীত হওয়ার মধ্যে এই দেবীর আর্যীকরণের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা সম্পর্কযুক্ত।

(ঝ) শীতলার থান

দক্ষিণবঙ্গের আর এক জাগ্রত দেবী হলেন শীতলা। এই দেবীকে সবাই ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা করে চলে। ফলে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ইনি ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা দ্বারা পূজিত হন। শীতলার থান সাধারণত খোলা আকাশের নীচে থাকে না। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখেছি রাস্তার ধারে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে বা কোনো গাছের তলায় তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু শীতলার ক্ষেত্রে এমনটা চোখে পড়ে না। এর প্রধান কারণ হল, এই দেবীকে সবাই ভয় পায়। আমরা শীতলার যে সমস্ত থান পাব তার বেশির ভাগ পাকা মন্দিরের পর্যায়ে। কিন্তু এই পাকার থানগুলি খুব বেশি পুরানো নয়; বাকি যে সমস্ত থান পাব সেগুলি টালির ছাউনিযুক্ত, কঞ্চির বেড়া দেওয়া ছোট কুঁড়ে ঘর। শীতলার থান সম্পর্কে ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা তাঁর *আঞ্চলিক দেবতাঃ লোকসংস্কৃতি* বইতে বলেছেন—

> চণ্ডী-মনসাদি গ্রামদেবীর মতো শীতলার এখনকার থানগুলি সর্বদাই কোনো বৃক্ষছায়া তলে সুনির্দিষ্ট নয়, বরং ইনি এখন প্রায় সর্বত্রই কোনো না মন্দিরে অধিষ্ঠিতা রয়েছেন। তবে খুব প্রাচীন প্রস্তর

নির্মিত শীতলা মন্দির পশ্চিম বাংলার কোথাও নেই। ছোট ইঁটে নির্মিত আনুমানিক ১০০-১৫০ বছরের প্রাচীন মন্দির আছে,... আর অধিকাংশ স্থানের মন্দিরগুলি অতি সাম্প্রতিককালের তৈরী। এগুলির কিছু ছোট পাকা দালান এবং অধিকাংশ মাটির ঘর-খড়, করগেট বা টালি দিয়ে ছাওয়া।[৫০]

আমরা মিহির চৌধুরী কামিল্যার মতকে সমর্থন করেও এই মন্দিরগুলোকে থান বলব। কেননা লোকায়ত সমাজ লৌকিক দেবদেবীর থান যতই সুউচ্চ, পাকার হোক না কেন তাকে দেবদেবীর থান বলেই মনে করে।

২.৮ উপসংহার

বাংলার লোকসংস্কৃতির আঙিনায় লৌকিক দেবদেবী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। লৌকিক দেবদেবী ও তাদের আবসস্থলকে বাদ দিয়ে লোকসংস্কৃতির পাঠ খণ্ডিত থেকে যায়। লোকায়ত মানুষের অনেক অস্ফুট কথা, অনুচ্চারিত বাসনা লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। মানুষ ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্ত দিয়ে এই সমস্ত দেবদেবীকে পুজো করেছে। কিন্তু সময়ের ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাপনের যেমন নানা পরিবর্তন হয়েছে ঠিক তেমন করে এই সমস্ত দেবদেবী ও লোকধর্মের মধ্যে বহু বিচিত্র, জটিল বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে। যেমন থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, লৌকিক দেবদেবীর থান কোনো ঝোপঝাড়-জঙ্গলের মধ্যে থাকে। আবার কোথাও পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে বা কোনো ফাঁকা মাঠের মধ্যে গাছের তলায় পাওয়া যায়। আদিম মানুষ থেকে আজকের মানুষ নানা ক্রমবি্কাশের মধ্য দিয়ে তথাকথিত সভ্য হয়েছে। আমরা লৌকিক দেবদেবীর থানের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই এই থান খোলা আকাশের থেকে, কাঠ খড়ের ছাউনি থেকে আজকের সুদৃশ্য, পাকা মন্দিরে পরিণত হয়েছে। থানের এই ক্রমবিকাশ দিয়ে আমরা লোকায়ত সমাজের তার সভ্যতার বিকাশকে দেখতে পাই। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লোকধর্মের নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকায়ত সমাজের অলিখিত ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায়।

দক্ষিণবঙ্গে দেবদেবীকে এই সমস্ত মানুষের জীবন-জীবিকার নিরিখেই গড়ে উঠেছে। জল-জঙ্গল ঘেরা দক্ষিণবঙ্গের মানুষকে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলিকে এরা সহজে লাভ করতে পারে না। লোকায়ত মানুষ এই চাহিদাগুলিকে পেতে

চেয়েছে কোনো অলৌকিক শক্তির সহায়তায়। তাই আমরা দেখতে পাই জেলে-মৌলে, বাউলে জঙ্গলে মাছ, মধু ও কাঠ কাঠতে গেলে জঙ্গলে বনবিবির নাম উচ্চারণ করে বা জঙ্গলের ধারে অস্থায়ীভাবে বনবিবির থান তৈরি করে। আসলে দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর উৎপত্তির পিছনে মানুষের জীবন-জীবিকাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

আমরা আগেই বলেছি এই সমস্ত দেবদেবীর মধ্য দিয়ে লোকায়ত সমাজের ঐতিহ্য পরম্পরাকে দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে যে আচার-সংস্কৃতি বা পূজাচার প্রচলিত আছে তার মধ্য দিয়ে এই দেবদেবীর আদি উৎসকে খুঁজে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তার বিপুল আয়তন নিয়ে এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীকে গ্রাস করার চেষ্টা করেছে এবং কিছু দূর পর্যন্ত সফলও হয়েছে। কিন্তু বাংলার নিজস্ব, একান্ত আপন লৌকিক দেবদেবীরা নিজেদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যকে কোনভাবেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চাপে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেনি। আমরা লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি ভাবনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত দেবদেবী আদিবাসী ও অরণ্যচারী মানুষের দ্বারাই পূজিত হত। এই সমস্ত দেবদেবীর ভয়াল, ভয়ঙ্কর মূর্তি ও এদের নিয়ে যে আখ্যান প্রচলিত আছে তা আমাদের সেই প্রাক-বিভক্ত অরণ্যচারী মানুষের সমাজে হাজির করে। এছাড়া এই দেবদেবীর পূজার উপকরণে যে উপাদান দেখা যায় তাতে আমাদের এই ধারণাকে আরও মজবুত করে। লৌকিক দেবদেবীর পূজাচারের মধ্য দিয়েই এই দেবদেবীর সঙ্গে শাস্ত্রীয় দেবদেবীর মৌলিক পার্থক্যকে বুঝতে পারা যায়। ফলে লৌকিক দেবদেবী, তার আবাসস্থল থেকে শুরু করে পূজাচার, তৈরি হওয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি বাংলার লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ।

তথ্যসূত্র

১। ভূএ্যা, ড.ফাল্গুনি। *বাংলার লোকসংস্কৃতি: মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষা ও প্রয়োগ।* কলকাতা: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন। ২০১১, পৃ. ৩৭১।

২। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস। ১৯৬৬। পৃ. ২০৪

৩। মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা।* নব চলন্তিকা। ২০০১। পৃ. ৬৭

৪। সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৪০। পৃ. ১৩।

৫। রায়, নীহার রঞ্জন। *বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)।* কলকাতা: দে'জ। ১৩৫৯। পৃ. ৪৮১

৬। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ।* কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ১৯৯৫। পৃ. ২২৮।

৭। দাস, জ্ঞানেনদ্রমোহন। *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ১৯৭৯। পৃ. ১০২৮।

৮। রায় বিদ্যানিধি, যোগেশ্চন্দ্র। *বাঙ্গালা শব্দকোষ।* কলকাতা: ভূর্জপত্র। ১৩২০। পৃ. ৪০৪

৯। হক, মহম্মদ এনামুল। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।* কলকাতা: বাংলা একাদেমি। ১৯৭৪। পৃ. ৫৭৭।

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ।* সাহিত্য অকাদেমি। ১৯৬৬। পৃ. ১০৭৪।

১১। মুখোপাধ্যায়, সোমা। *সংস্কৃতির উত্তারাধিকার ও বাংলার লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: একুশ শতক। ২০১০। পৃ. ২৪।

১২। বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা)। কলকাতা: *দক্ষিণ ভারতের গ্রামদেবতা।* কথক। ১৮১৭। পৃ. ১৪৭।

১৩। রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)।* কলকাতা: দে'জ। ১৩৫৬। পৃ.৪৮১

১৪। রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)।* কলকাতা: দে'জ। ১৩৫৬। পৃ. ৪৭৭

১৫। রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস(আদি পর্ব)।* কলকাতা: দে'জ। ১৩৫৬। পৃ. ৪৮১

১৬। রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)।* কলকাতা: দে'জ। ১৩৫৬। পৃ. ৬৩৩

১৭। মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা।* নব চলন্তিকা। ২০০১। পৃ. ১৫৯

১৮। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস। ১৯৬৬। পৃ. ২।

১৯। নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৮। পৃ. ৩৮।

২০। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস। ১৯৬৬। পৃ. ৪।

২১। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস। ১৯৬৬। পৃ. ৩৫।

২২। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং হাউস। ১৯৬৬। পৃ. ১৪৯।

২৩। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)* । কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০৪, পঞ্চম সংস্করণ। পৃ ১।

২৪। নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৮। পৃ. ৫৩।

২৫। ঘোষ, সঞ্জয়। *সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা।* সুচেতনা। ২০১২। পৃ. ৮৩।

২৬। হালদার, বিমলেন্দু (সম্পা)। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র।* ২০১২। পৃ. ২০।

২৭। পাড়ুই, অমৃতলাল। *গ্রামোন্নয়ন কথা।* আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৪। পৃ. ৩১।

২৮। চৌধুরী, দুলাল (সম্পা)। *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ।* কলকাতা: আকাদেমী অফ ফোকলোর। ২০০৪। পৃ. ৪৯১।

২৯। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* কলকাতা: দে'জ প্রকাশনী। ১৯৬৬। পৃ. ১৭।

৩০। ভট্টাচার্য, মালিনী। লোকশ্রুতিঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। পৃ. ১৮১

৩১। চৌধুরী, দুলাল (সম্পা)। *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ।* কলকাতা: আকাদেমী অফ ফোকলোর। ২০০৪। পৃ. ৪৯৩

৩২। ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি(চতুর্থ খণ্ড)।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৯৮৬। পৃ. ১৬।

৩৩। চৌধুরী, দুলাল(সম্পা) *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ।* কলকাতা: আকাদেমী অফ ফোকলোর। ২০০৪। পৃ. ৪৮৩।

৩৪। ঘোষ, সঞ্জয়। *সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা।* সুচেতনা। ২০১২। পৃ. ১০।

৩৫। ঘোষ, সঞ্জয়। *সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা।* সুচেতনা। ২০১২। পৃ. ৯৩।

৩৬। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* কলকাতা: দে'জ প্রকাশনী। ১৯৬৬। পৃ. ১৫০।

৩৭। ঘোষ, সঞ্জয়। *সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা।* সুচেতনা। ২০১২। পৃ. ৮০।

৩৮। ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড)।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৯৮০। পৃ. ২৪৩।

৩৯। ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড)।* প্রকাশ ভবন। কলকাতা। ১৯৮০। পৃ.২৫৪।

৪০।ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড)।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৯৮০। পৃ. ২৬০।

৪১। ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড)।* প্রকাশ ভবন। কলকাতা। ১৯৮০। পৃ. ২৬৬।

৪২। ভট্টাচার্য, মালিনী। *লোকশ্রুতিঃ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।* পৃ. ১৮৫।

৪৩। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* দে'জ প্রকাশনী। কলকাতা। ১৯৬৬। পৃ. ৩১।

৪৪। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* কলকাতা: দে'জ প্রকাশনী। ১৯৬৬। পৃ. ১৭৭।

৪৫। ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড)।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৯৮০। পৃ. ২৬৭।

৪৬। মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা।* নব চলন্তিকা। ২০০১। পৃ. ১৫০।

৪৭। চৌধুরী কামিল্যা, মিহির। *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি।* নদিয়া: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯২। পৃ. ১৪৪

৪৮। মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা।* নদিয়া: নব চলন্তিকা। ২০০১। পৃ. ১৪৯

৪৯। চৌধুরী কামিল্যা, মিহির। *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি।* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯২। পৃ. ২১০।

৫০। চৌধুরী কামিল্যা, মিহির। *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি।* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯২। পৃ. ২৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষেত্রসমীক্ষা: পদ্ধতি, সমীক্ষা ও প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ

৩.০ ভূমিকা

লোকসংস্কৃতিতে 'লোক' শব্দটি 'ফোক'-এর অনুবাদ ঋণ। এই 'লোক'-এর মানুষ কোনো একক নয়, সামূহিক। এই 'লোক'-এর সামূহিক পরিচয় ও তাদের পালিত সংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে কোনো বিদ্যায়তনিক পরিসরে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র বিদ্যায়তনিক পরিসরে লোকসংস্কৃতি চর্চা অসম্পূর্ণ। লোকসংস্কৃতিকে বোঝার জন্য তত্ত্ব যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমন করেই আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে লোকায়ত সমাজ থেকে পাওয়া তথ্য। লোকসংস্কৃতি পাঠ বা বোঝাপড়া পূর্ণাঙ্গ তখনই হয় যখন ক্ষেত্র থেকে পাওয়া তথ্যের উপর তত্ত্বের আলো পড়ে সুবিন্যস্ত আকার ধারণ করে। আবার ক্ষেত্র থেকে পাওয়া তথ্য নতুন কোনো তত্ত্বের দিক নির্দেশ করতে পারে। এই দ্বিমুখী জ্ঞান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমাদের লোকসংস্কৃতি চর্চা সফল হতে পারে। লোকায়ত মন ও তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বুঝতে গেলে আমাদের এই গ্রামীন, কৌম্য সমাজের অন্দরে প্রবেশ করতে হয়। আর একবার সেই প্রবেশ পথের দিশা পেয়ে গেলে আমাদের চিন্তা চেতনার দিগন্ত খুলে যায়।

দক্ষিণবঙ্গের লোকায়ত সমাজ চলমান তথ্যের ভাণ্ডার। গ্রামীন মানুষ দিনের পর দিন তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যকে, সময়ের প্রভাব স্বীকার করেও লালনপালন করে চলেছে। বাংলার এই সমস্ত অঞ্চলের মাঠেঘাটে পায়ে হেঁটে চললে; আমরা এই প্রান্তীয় সমাজের লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান দেখতে পাব; যা লাইব্রেরী বা কোনো লিখিত তথ্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলে প্রতিদিন কিছু না কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। বারো মাসে তেরো পার্বণ এই লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এই সমস্ত দেবদেবীকে কেন্দ্র করে মানুষের মুখে মুখে অজস্র মৌখিক আখ্যান প্রচলিত আছে। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে এই আচার-অনুষ্ঠান ও মৌখিক আখ্যান আমরা একমাত্র লোকায়ত মানুষের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই পেতে পারি। লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য বা তাদের কেন্দ্র করে যে আচার-অনুষ্ঠান ও আখ্যান প্রচলিত আছে তা সময় ও স্থানের নিরিখে পাঠ করলে আমরা তার নানা বৈচিত্র ও বিবর্তন দেখতে পাব। শহরে লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে

ভাবনা আর গ্রামীন সমাজে সেই দেবদেবীকে কেন্দ্র করে ভাবনার পার্থক্য বুঝতে গেলে ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া উপায় নেই। ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্মীয় ভাবনার রকমফের দেখা যায়। আমার গবেষণায় শহর থেকে একেবারে প্রান্তিক গ্রাম সমাজকে নির্বাচন করা হয়েছে, এই ভাবনা বা চিন্তার ফারাক বোঝার জন্য। এই বিবর্তনকে বুঝতে গেলে লোকায়ত সমাজের মধ্যে গিয়ে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে হবে; দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে, মেঠো পথ ধরে, ক্ষেত খামারে কাজ করা, লৌকিক দেবদেবীর থানে পুজো দেওয়া কোনো ব্যক্তি, কোনো রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে হবে; আর এভাবেই আমরা লোকসংস্কৃতির নানা সুলুক সন্ধান পেতে পারি।

৩:১ এলাকা ও বিষয় নির্বাচন

আমার গবেষণার মূল বিষয় থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি। ফলে গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা অনিবার্যভাবে দরকার। কেননা লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক আখ্যান লিখিত আকারে তেমন নেই। কিন্তু বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীদের নিয়ে অজস্র মৌখিক আখ্যান বংশ-পরম্পরায় প্রচলিত আছে। ফলে লোকায়ত মানুষদের সঙ্গে আলাপচারিতা ছাড়া প্রাথমিক তথ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব। গবেষোণায় এই সমস্ত দেবদেবীকে নিয়ে প্রচলিত আখ্যানে লোকায়ত মানুষের ধর্মভাবনা, লোকায়ত মানুষের পালিত সংস্কৃতি ও সর্বোপরি এই সমস্ত আখ্যানের মধ্যে মানুষের পরিবেশ ভাবনার স্বরূপকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সমাজ যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন করে তার ধরন-ধারণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষোণার এই সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাধান হতে পারে কোনো লাইব্রেরি বা ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে নয়। এই প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য আমরা পেতে পারি গ্রাম সমাজের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে ও তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেখা ও বোঝার মধ্য দিয়ে।

বাংলার সব অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে গবেষণা করা এক প্রকার অসম্ভব। গবেষণার নির্বাচিত অঞ্চল হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কিছু অঞ্চল। প্রকৃতি রক্ষা বা প্রকৃতি পূজা নতুন কোনো বিষয় নয়; এর সঙ্গে আদিম কৌম্য সমাজের যোগসূত্র বা ঐতিহ্যসূত্র রয়েছে। আর এই জন্য গবেষণার এমন একটি অঞ্চল নির্বাচন করা হয় যাদের মধ্যে আদিম সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আসলে মানুষের পরিবেশভাবনা নিয়ে সময় ও স্থানের নিরিখে পাঠ করা খুবই জরুরি। গবেষণার এইসব

বিষয়ের দিক থেকে আদিগঙ্গা বরাবর অঞ্চল সবদিক থেকে উপযুক্ত পরিসর। নাগরিক পরিসরে বাস করে মানুষ তার ঐতিহ্যকে ভুলে যায়; মানুষের মূল্যবোধের অভাবজনিত কারণে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আশ্রয় নেয় ইঁট-পাথরের জঙ্গলে। আবার নগর থেকে দূরে থাকা লোকায়ত সমাজ ঐতিহ্যকে বহুলাংশে লালন করে। আদিগঙ্গার সঙ্গে আমাদের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস যুক্ত আছে এবং আদিগঙ্গার সঙ্গে নিম্নগাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের ধর্মীয় ভাবাবেগ যুক্ত হয়ে একটি গবেষণার পরিসর তৈরি করে। আদিগঙ্গার গতিপথের সঙ্গে যুক্ত অঞ্চলের নানা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ড নিয়ে মঙ্গলকাব্যে একটি বিশিষ্টতা পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণরামের '*রায়মঙ্গল*'-এ এই নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। চৈতন্যদেব নীলাচলে যান এই আদিগঙ্গার পথ ধরে। চৈতন্যদেবের যাত্রাকালে আদিগঙ্গার তীরবর্তী বিভিন্ন স্থানে অবস্থান ও লৌকিক দেবদেবী থেকে শুরু করে শিবকেন্দ্রিক পূজাচার এই এলাকাগুলির ধর্মীয় মাহাত্ম্য তৈরি করেছে। এর সঙ্গে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। আমরা বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* (১৫৩৫ খ্রি) থেকে চৈতন্যদেবের নীলাচল যাত্রা ও আদিগঙ্গার দুই পাড়ে রাত্রি যাপনের মধ্য দিয়ে নানা তীর্থ স্থান তৈরি হতে দেখব। চৈতন্যদেবের যাত্রাকালীন যে সমস্ত স্থান আজও সেই স্মৃতি নিয়ে জীবন্ত হয়ে আছে তার বিবরণ আমরা *চৈতন্যভাগবত* থেকে জানতে পারি—

> হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।/ উত্তরিলা আসি 'আটিসারা' নগরেতে।।/... এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।/ আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতুহলে।।/ ... জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।/ 'অম্বুলিম্বঘাট' করি বোলে সর্বজনে।।/ ...গঙ্গা- শিব প্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম।/ হইলা পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম।।[১]

আমরা বুঝতেই পারি যে, চৈতন্যদেবের আদিগঙ্গার যাত্রার জন্য এখানকার স্থান মাহাত্ম্য যেমন বাড়ে ঠিক তেমন করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোকায়ত মানুষ তার ধর্ম নিয়ে সচেতন হয়। আদিগঙ্গা কোন পথে সাগরে মিশেছে তা নিয়ে নান বিতর্ক আছে। আদিগঙ্গার পথ নিয়ে নানা গ্রন্থে নানা মত আছে আবার লোকায়ত সমাজে মৌখিকভাবে এর যাত্রাপথের বর্ণনা করা আছে। আদিগঙ্গা পথের প্রবাহ প্রসঙ্গে পুরঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> গঙ্গা-ভাগীরথীর যে মধ্যযুগীয় ধারাটি হাওড়া জেলার বেতড়ের বিপরীতে, বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তরপ্রান্ত দিয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে পরে ক্রমশ দক্ষিণ মুখে গেছে, সেটাই আদিগঙ্গা বলে অভিহিত। গতিপথে পূর্বদিকে প্রথমে কালীঘাট মন্দির, পরে ক্যাওড়াতলা মহাশ্মশান।... এরপর আদিগঙ্গা

টালিগঞ্জের শিরিটি শ্মশান (করুণাময়ী শ্মশানঘাট) ছুঁয়ে কুঁদঘাটে পৌঁছেছে।... পরে গড়িয়ার কাছে পূর্ববাহিনী আদিগঙ্গার উত্তরপারে...বৈষ্ণবঘাটা।...গড়িয়ার পরে আদিগঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হয়েছে। পূর্বপারে বিখ্যাত গড়িয়া মহাশ্মশান ও জোড়া শিবের মন্দির।... এরপরে আদিগঙ্গার তীরে মহামায়াপুরে বেহুলাঘাট। পরে প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জনপদ বোড়াল ছেড়ে আফিগঙ্গার পথে পূর্বদিকে রায়পুর।...পরে হরিনাভীতে নবীনচন্দ্র ঘোষের ঘাট বাঁয়ে ফেলে বড়দিহ কোদালিয়া হয়ে পূর্বে অন্তত পাঁচশ বছরের প্রাচীন মালঞ্চ-মাহিনগর জনপদটি পড়ে।...মালঞ্চের পরে আদিগঙ্গার পশ্চিমে দক্ষিণ গোবিন্দপুর।...এরপর আদিগঙ্গার প্রবাহপথে পশ্চিমে ধোপাগাছি, পুরন্দরপুর, (বারুইপুর)।... এরপর সূর্যপুর।...এরপরে ধপধপির পরে চাঁদোখালি ঘাট (চাঁদ সদাগরের নামে)। পরে দক্ষিণ বারাশত হয়ে পশ্চিমে জয়নগর পূর্বে মজিলপুর।... এখানে রয়েছে ক্ষেত্র মিত্রের ঘাট, ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা, মতিলাল গঙ্গা। আরও দক্ষিণে মধুরাপুর ফেলে আদিগঙ্গার তীরে ছত্রভোগ ঘাট, চক্রতীর্থ, বদরিকাকুন্ডু। দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে নদীতীরে মমহাশ্মশান। এর দক্ষিণে অম্বুলিঙ্গ ঘাট। তারপর নালুয়া, মুড়ি, খাড়ি, কাশিনগর, বড়াশি, হাতিয়াগড়, চৌমুখি, শতমুখী হয়ে বারাতলা, সপ্তমুখী বা কালনাগিনী নদীতে মিশে যেত।[২]

আবার, সঞ্চয় ঘোষ তাঁর *'সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা'* বইতে আদিগঙ্গার যে প্রবাহ পথ দিয়েছেন তা মোটামুটি এইরকম– কালিঘাট, রাজপুর, বারুইপুর আটিসারা, বোড়াল, শাসন, মুলটি, গোচরন, সরিষাদল, জয়নগর, মজিলপুর, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ, খাড়ি, কাশীনগর, বকুলতলা, মন্মথপুর হয়ে মনসাদ্বীপ পর্যন্ত গিয়ে সাগরে মিশেছে। আদিগঙ্গার এই প্রবাহপথটি মোটামুটি সবাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হয়েছে আদিগঙ্গা কোথায় সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। একজন ক্ষেত্রসমীক্ষক হিসেবে অঞ্চল বুঝতে না পারা বড় সমস্যার মধ্যে পড়ে। কোনো কোনো গবেষক বলেন, আদিগঙ্গা সাগরদ্বীপের ধবলাটে মিশেছে। অনেকে গঙ্গার এই বহুধা বিভক্ত হয়ে সাগরে মিলিত হওয়ার জন্যে একে 'শতমুখী গঙ্গা' বলে। কালীদাস দত্ত হলেন গঙ্গারিডি সভ্যতা চর্চার জন্য একজন প্রসিদ্ধ গবেষক। তিনি বলেন, আদিগঙ্গা, বুড়িগঙ্গার ভিতর দিয়ে সাগরদ্বীপে মিশেছে। তিনি প্রচলিত ধারণা হিসেবে আদিগঙ্গা বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিলিয়ে মাতলার মোহনা দিয়ে সাগরে মেশার বিষয়টি মানতে পারেননি। আবার অনেকে বলেন, আদিগঙ্গার একটি ধারা ঘৃতবতি নদীতে মিশেছে। এই ঘৃতবতী ধারা কাকদ্বীপের মধ্য দিয়ে সাগরে মিশেছে। আসলে এই গবেষণায় আদিগঙ্গার যে প্রবাহ সোনারপুর ছুঁয়ে সাগরদ্বীপে মিশেছে তার সম্পূর্ণ পথটিকে সমীক্ষিত অঞ্চল হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

আদিগঙ্গার দুই তীরবর্তী অঞ্চলকে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য নির্বাচনের নানা কারণ আছে। আমরা জানি এই সমস্ত অঞ্চল আগে জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। জল-জঙ্গল ছিল মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান পথ। এই অঞ্চলে জেলে, বাগদি প্রভৃতি মানুষ বসবাস করে এবং এরা মূলত জল-জঙ্গলের ওপর নির্ভর

করেই জীবনযাপন নির্বাহ করে। আদিগঙ্গার প্রবাহ ধরে চৈতন্যদেবের যাত্রা ও নানা ঘাটে রাত্রি যাপনের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত এলাকার কৌলিন্য বৃদ্ধি হয়েছে। আমরা জানি, চৈতন্যদেব আদিগঙ্গার পাড়ে বিভিন্ন বারামূর্তি ও লৌকিক দেবদেবীর পূজা করে। ফলত, আমরা বুঝতেই পারি এখানকার ধর্মীয় চিত্রকে। আমরা আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করেছি দক্ষিণবঙ্গের এই সমস্ত এলাকায় ব্রাহ্মণ বসতি হয়েছে গুপ্তযুগ থেকে। গুপ্তযুগে ভূমিদান সূত্রে বহু ব্রাহ্মণ এই সমস্ত অঞ্চলে এসে বসতি করে। আবার দক্ষিণী ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশদের আগমন সেন আমলে গতি পায়। এই সমস্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের আগমন সব থেকে বেশি বৃদ্ধি পায় মুসলমান শাসনকালে। বহু ব্রাহ্মণ নিজেদের মানসম্মান বজায় রাখতে এই নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে চলে আসে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে মানুষজন বসতি স্থাপন করতে থাকে। এরপরে ইংরেজ শাসনকালে জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে রাঁচী, ছত্রিশগড়, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি এলাকা থেকে আদিবাসী অর্থাৎ কোল, মুন্ডা, ওঁরাও জনজাতি বেশি সুবিধার জন্য এই সমস্ত অঞ্চলে আসে তাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে। এছাড়া মেদেনীপুর ও ওড়িষ্যা থেকে মানুষ এই নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য আসে। সবশেষে ওপার বাংলা থেকে বহু মানুষ আসে সুস্থ জীবনযাপনের প্রত্যাশায়। আমরা আদিগঙ্গার দুই তীরের অঞ্চলে মিশ্র সংস্কৃতির পরিসর দেখতে পাই । এছাড়া এখানে নিম্নবর্ণের মানুষের পালিত সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে তার বিরোধ-সমন্বয় এই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে। এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে আবার মিশে আছে গঙ্গারিডি সভ্যতার সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য। আদিগঙ্গা প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসে গঙ্গারিডি সভ্যতার কথা। বর্তমানে আদিগঙ্গার দুই পাশের জন বসতি সেই গঙ্গারিডি সভ্যতার ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছে। এই গঙ্গারিডি সভ্যতা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়ে চলেছে। বিনয় ঘোষ এই গঙ্গারিডি সম্পর্কে বলেছেন—

> দক্ষিণবঙ্গের ব-দ্বীপাঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বাস ছিল। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দেই তাদের নিজেদের রাজধানী ছিল গঙ্গা নামে।... মনে হয় বর্তমান গঙ্গা সাগর বা গঙ্গা সাগর সঙ্গমের কাছে এই গঙ্গা নগর ছিল। চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের আগেই গঙ্গাসাগর-তীর্থের প্রসিদ্ধি ছিল।... রাষ্ট্রিক ও ভৌগলিক অবনতির ফলে গঙ্গাসাগর যাত্রা ক্রমে বিঘ্ন হয়ে ওঠে এবং সমুদ্রের ভাঙাগড়ায় গঙ্গানগর নষ্ট হয়ে যায়।[৩]

সব মিলিয়ে আদিগঙ্গার দুই পাড়ের অঞ্চল ও লোকায়ত সমাজ-সংস্কৃতি বিস্তৃত গবেষণার পরিসর তৈরি করে। গবেষণায় আদিগঙ্গার দুই পাড়ের অঞ্চল ও নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চল সব দিক থেকে উপযুক্ত বলে নির্বাচিত করা হয়েছে।

৩.২ ক্ষেত্রসমীক্ষার পদ্ধতি

ক্ষেত্রসমীক্ষায় সবার আগে ক্ষেত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এই ক্ষেত্র সম্পর্কে অনিমেষকান্তি পাল জানিয়েছেন-

> কোনো এক বা একাধিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে যে সব পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে তাকেই বলা হয় ক্ষেত্র। ... যেমন চারদিকে আল। তার ভিতরে চাষের জায়গা। সেই হল একটা ক্ষেত্র। ধরা যাক সুবর্ণরেখা ও কংসাবতী নদীর মধ্যেকার ভূভাগ। সীমাবদ্ধতা এখানে দুটি নদীর। এখানে বিষয় বা পরিস্থিতি হতে পারে- মানুষ, চাষবাস, সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি।[৪]

এই ক্ষেত্র থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদানকে খোঁজা বা অনুসন্ধানের নামই হল ক্ষেত্রসমীক্ষা। এই খোঁজ বা সমীক্ষা গবেষকের গভীর মনোযোগ দাবী করে। ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়কে নানা দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিশ্লেষণ করা ও তাকে সঠিক ভাবে সাজালেই ক্ষেত্রসমীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। আমরা জানি লোকসংস্কৃতির গবেষণায় কেবলমাত্র তথ্যের ওপর নির্ভর করলে সেই গবেষণা সম্পূর্ণ হয় না। লোকসংস্কৃতির গবেষণায় তত্ত্বনির্ভরতা যেমন দরকার হয়, এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা ক্ষেত্রে গিয়ে তথ্যকে সামনে থেকে দেখা। লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অচিন্ত্য বিশ্বাস আমাদের জানান—

> ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া লোকসংস্কৃতিবিদ্যা নুন ছাড়া তরকারি, জল ছাড়া মাছ। ক্ষেত্রসমীক্ষা না করে যারা লোকসংস্কৃতিবিদ্যা চর্চা করেন তাদের বলা হয় ‘armchair folkorist’ লোকসংস্কৃতিবিদ্যা একদিকে প্রায়োগিক অন্যদিকে তাত্ত্বিক। এ হল মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক নির্ণয়ের- অধীত বিদ্যাকে প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝে নেওয়ার- দ্বিমুখী জ্ঞান কাণ্ড।[৫]

ফলে আমরা বুঝতে পারি যে, লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আসলে লোকায়ত মানুষের চলমান জীবন ও তার স্বরূপ বৈচিত্র্যকে বুঝতে গেলে গবেষককে সেই জীবনের সঙ্গে একান্ত নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করতে হবে। আর এই সম্পর্কের মধ্য দিয়েই লোকসংস্কৃতির তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হয়। লোকসংস্কৃতি পাঠের জন্য আমাদের যে ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে,

লোকায়ত মানুষের মাঝে গিয়ে এই চলমান সংস্কৃতিকে বুঝতে হবে। রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতিচর্চা প্রসঙ্গে অনেক আগেই একথা বলেছেন—

> যেখানেই হউক না কেন, মানব সাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানার একতা সার্থকতা আছে,- পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে, তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোন ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।[৬]

লোকসংস্কৃতি তাই কেবলমাত্র বিদ্যায়তনিক পরিসরে সম্ভব নয়। চলমান জীবনকে বুঝতে গেলে আমাদের নির্বাচিত ক্ষেত্রে যেতেই হয়। কারণ লোকসংস্কৃতি লোকায়ত মানুষের জীবনযাপনের মধ্যেই নিহিত আছে। আর এই চলমান সংস্কৃতিকে জানতে গেলে ক্ষেত্রে যেতেই হবে। লোকসংস্কৃতির নিয়ে গবেষণায় যেমন করে ক্ষেত্রসমীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, ঠিক তেমন করে ক্ষেত্র থেকে কেমন করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে বা লোকায়ত মানুষের সঙ্গে কেমন আচরণ করলে তারা সহজেই তথ্য দান করবে এই সবটাই নির্ভর করে সমীক্ষকের আচরণ ও তার শিক্ষার উপরে। একজন যোগ্য সমীক্ষকই পারে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিজের চাহিদা মতো তথ্য সংগ্রহ করতে। এই বিষয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, একজন সমীক্ষকের বিজ্ঞান ভিত্তিক মানসিকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কোনো অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে গেলে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি-পরম্পরা দিয়ে তাকে বুঝতে হবে। এখানে একজন সমীক্ষক নিজের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ ঘটাতেই পারেন কিন্তু তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি থাকাটাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একজন সুযোগ্য সমীক্ষক বলতে রেবতীমোহন সরকার আমাদের যা বলেছেন তা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য—

> ...৩।একজন সুযোগ্য সমীক্ষকের প্রাথমিক গুণ হল অফুরন্ত ধৈর্য্য এবং নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়। ...৫। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে সমীক্ষকের একেবারে শুরু থেকেই সমীক্ষা কার্যটির প্রকৃতি ও ধারণার বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সমীক্ষার বিষয়বস্ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর তাঁর সুস্পষ্ট আধিপত্য থাকা বাঞ্ছনীয়।... ৮। যেহেতু ক্ষেত্রসমীক্ষক মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন পরিবার-পরিজনদের অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে তাঁর কর্ম সঞ্চালন করেন সেই হেতু তাঁকে খুব অমায়িক, ভদ্র ও নম্র হতে হবে।... সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্তা এবং আন্তরিক প্রেরণা যেন সকলকে আকর্ষণ করে সে বিষয়ে লক্ষদান করতে হবে।[৭]

প্রাক-ক্ষেত্রসমীক্ষা

লোকসংস্কৃতির নিয়ে গবেষণায় প্রাক-ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পর্বেই ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতি পর্ব সেরে নিতে হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য কোন অঞ্চলে যাওয়া হবে থেকে শুরু করে, ক্ষেত্রসমীক্ষার মূল প্রবণতা, কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, তার বিশদ পরিকল্পনা এই প্রাক-ক্ষেত্রসমীক্ষা পর্বেই তৈরি করা হয়। প্রাক-ক্ষেত্রসমীক্ষা কী কারণে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ও ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে আমাদের কোন কোন বিষয় মনে রাখা উচিত তার একটি রূপরেখা অচিন্ত্য বিশ্বাসের *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা* বইতে দিয়েছেন—

> ক্ষেত্রসমীক্ষা করার আগে কিছু কাজ করে নেওয়া জরুরি। যথাঃ ক। ১। স্থান নির্বাচন ২। বিষয় নির্বাচন ৩। পথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং ৪। স্থানীয় তথ্য দাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রচনা।[৮]

ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে বা তার খসড়া তৈরি করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখা উচিত। ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহর এটা একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া হতে পারে না। বিশেষত, কোনো বিদ্যায়তনিক পরিসরে গবেষণা করলে ক্ষেত্রসমীক্ষার ধরণ, সময় ও অর্থের নিরিখে ঠিক করা উচিত। এইজন্য কোনো ক্ষেত্রসমীক্ষাকেন্দ্রিক গবেষণায় পাইলট সার্ভে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই পাইলট সার্ভের মধ্যেমে আমরা কোনো এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান বা অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারি। পাইলট সার্ভের গুরুত্ব সম্পর্কে রেবতীমোহন সরকার বলেছেন—

> কোনো বিষয়ের ব্যাপক এবং প্রকৃত অনুসন্ধানের পূর্বে স্বল্প সময়ের জন্য যে ত্বরিত সমীক্ষা করা হয় তার নাম পথদেশক সমীক্ষা।... এই পথদেশক সমীক্ষা কোনো ধরনের অনুকল্প প্রণয়ন ব্যতিরেকেই করা হয়ে থাকে। ...এই ত্বরিত সমীক্ষা ধারার মাধ্যমে অনুসন্ধানের কাজে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাষা, চালচলন, বহিরাগতদের সঙ্গে ব্যবহার এবং তার প্রতিক্রিয়া, সমগ্র এলাকাটির প্রাথমিক সমস্যাবলী, যাতায়ত ব্যবস্থা, সমীক্ষকদের অস্থায়ী আশ্রয়স্থল ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়।[৯]

আবার ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রাথমিক তথ্যদাতা কে বা কারা হবেন তার সম্পর্কে অবগত হওয়া খুব জরুরি। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য কাদের থেকে প্রাথমিক তথ্য পেতে পারি এই প্রসঙ্গে শঙ্কর সেনগুপ্ত বলেছেন—

> যোগাযোগ করতে হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, খেলাধূলা ও শারীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, নাঠ্য সংস্থা, সাহিত্য সংস্থা, সমাজ সেবা সংস্থা, বারোয়ারি সংগঠন, স্থানীয় পত্র-পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতির সঙ্গে।[১০]

এই প্রাক ক্ষেত্রসমীক্ষা পর্বেই ঠিক করে নিতে হয় ক্ষেত্রে যাওয়ার সময় কোন কোন প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যেতে হবে। গবেষণার বিষয় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। প্রসঙ্গত এই গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য যে সমস্ত জিনিসের একান্ত প্রয়োজন তার তালিকা নিম্নরূপ—

(ক) কোনো বিদ্যায়তনিক পরিসরে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতিপত্র নেওয়া জরুরি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি অনুমতিপত্র নেওয়া এই ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। কেননা শহর বা গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে এমন কিছু পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়, যেখানে এই অনুমতিপত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

(খ) ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। এই তথ্যকে সংগহ করার জন্য ক্যামেরা, অডিও রেকর্ডার, খাতা ও কলম সঙ্গে থাকা জরুরি। ক্ষেত্রসমীক্ষায় ক্যামেরা ও অডিও রেকর্ডার কেন গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে বলা যায় যে—

> সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন ক্যামেরার লেন্স-এর দৃষ্টি। ক্যামেরা বিভিন্ন বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বিশ্বস্তভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাবলির চিত্র ধরে রাখতে পারে- মানুষের সাধারণ চোখের দৃষ্টিতে যা কোনোদিনই সম্ভব নয়। কোনো সমীক্ষক যখন ক্ষেত্রের মধ্যে তথ্যসংগ্রহে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলির সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ধারা প্রয়োগ করেন তখন বিভিন্নরূপী কর্মকাণ্ডের জন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর কার্যাবলির অথবা কোনো অনুষ্ঠানের বহুমুখী কর্মধারার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে ধরে রাখতে পারেন না। ...এই বিশেষ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আলোকচিত্রগ্রহণ বিশেষ সুবিধাজনক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই কারণে আলোকচিত্র বর্তমানে একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রসমীক্ষা পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।[১১]

এই বিষয়ে বলা যায়, এখানে কেবলমাত্র ক্যামেরা নয়, ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ও তাকে সংরক্ষণের জন্য উপরের সমস্ত জিনিসগুলি একান্ত প্রয়োজন।

(গ) ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাওয়ার আগে একটি যথাযথ প্রশ্নপত্র নেওয়া জরুরি। আগে থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি থাকলে ক্ষেত্র থেকে তথ্য পেতে সুবিধে হয় ও সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়ার

আগে একটি নির্দিষ্ট ও যথাযথ প্রশ্নপত্র তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়ে। ফলে এই ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন পত্র তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র যথাযথ হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রশ্নপত্রের উপর নির্ভর করেই একজন সমীক্ষক তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রশ্নপত্রের সবার প্রথমে থাকতে হবে—

(ক) সংগঠিত প্রশ্নাবলি (Strucured question)— এই ধরণের প্রশ্ন খুব সহজ রকমের হয়ে থাকে। অনেকগুলি বিকল্পের মধ্যে থেকে সাক্ষাতদাতা নির্বাচন করে উত্তর দেবে।

(খ) মুক্ত প্রশ্নাবলি (Open end questions)— এই ধরণের প্রশ্নে কোন বিকল্প থাকে না। উত্তরদাতাকে একটি মজবুত উত্তর দিতে হয়।

(গ) দ্বিবিভাজিত প্রশ্নাবলি (Dichotomous question)— এই ধরণের প্রশ্নে হ্যাঁ ও না এই দুই বিকল্প থাকে। সাক্ষাৎকারদাতা নিজের মতো করে উত্তর দেবে।

(ঘ) বহু পছন্দের প্রশ্নাবলি (Multiple choice question)— এই ধরণের প্রশ্নে আমরা অনেকগুলি বিকল্প দেখতে পাব। এবং সাক্ষাৎকারদাতা সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে একটি বিকল্প বছে নেবেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, এই ধরণের প্রশ্ন সহজ হবে এবং তথ্যদাতার জ্ঞানের দিক খেয়েল রেখেই প্রশ্ন সাজাতে হবে।

(ঘ) ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য কোনো একটি জায়গাকে রাত্রে থাকার জন্য নির্বাচন করা জরুরি। এই রাতে থাকার জন্য সমীক্ষককে বেশ কয়েকটি জামাকাপড় থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। এরসঙ্গে সমীক্ষকের একটি ল্যাপটপ সঙ্গে রাখা দরকার। কারণ অডিও রেকর্ডার ও ক্যামেরায় মেমরি পূর্ণ হয়ে গেলে কাজ করতে সমস্যা হয়। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য প্রতি রাতে ক্যামেরা ও রেকর্ডার থেকে তথ্য ল্যাপটপে রাখা হয়েছে; ফলে ক্যামেরা ও রেকর্ডারে জায়গার সমস্যা হয় না। এরসঙ্গে ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত একটি পিঠ ব্যাগ জরুরি। এই গবেষণার এলাকায় যেহেতু সোনারপুর থেকে একেবারে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত, এরফলে কলকাতা থেকে প্রতিদিন গ্রামে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব। তাছাড়া কলকাতা থেকে খুব ভোরে রওনা দিলেও নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছাতে দুপুর হয়ে যায়। আর ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিয়মকে একজন সমীক্ষকের মানতেই হয় আর এরমধ্যে হল, কাউকে বিরক্ত বা জোর করে তথ্য না নেওয়া। এটি ক্ষেত্রসমীক্ষার মৌলিক ও

অনিবার্য পালনীয় শর্ত হিসেবে ধরা হয়। আমরা জানি যে লোকায়ত মানুষের দুপুরের 'ভাতঘুম' তাদের জীবনযাপনের অঙ্গ। ফলে কোনো ব্যক্তির একান্ত, নিজস্ব আরামকে বিঘ্নিত করে কোনো তথ্য আনা মানেই ক্ষেত্রসমীক্ষার নিয়মের বিরোধী কাজ। এর ফলে সমীক্ষিত অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে রাত্রিকালীন বসবাসের জন্য। এক্ষেত্রে জয়নগর পৌরসভার গেস্ট হাউসকে নির্বাচন করা হয়। কারণ জয়নগর থেকে সমীক্ষিত সব অঞ্চলে কম সময়ে পৌঁছে যাওয়া যায়। এছাড়া এই ক্ষেত্রসমীক্ষার সমীক্ষিত অঞ্চলের সমস্ত গ্রামে পৌঁছতে গেলে বাইক একমাত্র সহায়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাতে সমস্ত এলাকায় ভালোভাবে পৌঁছতে পারা যায় তারজন্য একটি বাইক ভাড়া করে নেওয়া হয়েছে।

(ঙ) যে কোনো অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়ার সময় খুব জরুরি ওই এলাকার ভৌগোলিক মানচিত্র সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা। এই জন্য সব সময় একটি মানচিত্র সঙ্গে রাখা খুবই দরকার। এই গবেষণার জন্য নির্বাচিত অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা এখনও সব দিক থেকে প্রত্যন্ত এবং কোনো কোনো গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। এই সমস্ত অঞ্চলে রাত্রের জন্য একটি টর্চ খুবই দরকার হয়ে পড়ে। এই সমস্ত গ্রাম্য অঞ্চলে সবসময় খাওয়ার হোটেল পাওয়া যায় না। এইজন্য ব্যাগে কিছু শুকনো খাওয়ার ও পানীয় জল নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়ার আগে বা ক্ষেত্র থেকে বেশ কিছু মানুষের মোবাইল নম্বর সযত্নে রেখে দেওয়া জরুরি । কেননা ক্ষেত্র থেকে নানা তথ্যের পুনরায় সন্ধান করতে হলে বা আবার যেতে হলে এই সমস্ত মানুষদের সাহায্য একান্তই প্রয়োজন। প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় কোনো রকম শারীরিক সমস্যা হলে ঔষধ সব সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই সঙ্গে করে কিছু জরুরি ঔষধ ও ফার্স্ট এইড কিট সঙ্গে রাখা খুবই প্রয়োজন।

(চ) কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য কোন কাজে লাগে না বা সঠিকভাবে তথ্য পাওয়া যায় না। এই ক্ষেত্রসমীক্ষার পরিকল্পনায় দুই ধরণ হল— প্রথমত, ক্ষেত্রসমীক্ষা কোন সময়ে করা হবে তার দিনক্ষণ আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে গবেষণার তত্ত্বাবধায়কের মতামত কার্যকরী ভূমিকা নেয়। এই গবেষণার যা ধরন-ধারণ তাতে লোকায়ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলা বা আলোচনা জরুরি। আবার এই সমস্ত মানুষদের সাংস্কৃতিক পরিসরকে

কাছ থেকে দেখা জরুরি। এক্ষেত্রে বছরের দুটি নির্দিষ্ট সময়কে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রথম সময় ছিল বর্ষা পরবর্তী সময়, অর্থাৎ, মানুষের যখন মাঠে ধান বোনা শেষ হয়ে যায়। আমরা জানি গ্রামের মানুষ শারীরিক পরিশ্রম বেশি করলেও দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করে না। আর ধান বোনা হয়ে গেলে এই সমস্ত মানুষদের কাছে বিস্তর সময় থাকে। এই সময় গ্রামের মানুষ কোনো চায়ের দোকান, রাস্তার ধারে বা কোনো মন্দিরের চত্বরে বসে অবসর বিনোদন করে থাকে। এরফলে এই সময়ে মানুষদের সঙ্গে অনেক সময় কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া আরেকটি সময় ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য উপযুক্ত। এই গবেষণা যেহেতু লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নিয়ে। এবং এই সমস্ত দেবদেবীর বাৎসরিক পুজোর সময় নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। লৌকিক দেবদেবীর বাৎসরিক পুজো সাধারণত ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাসের মধ্যে হয়ে থাকে। ফলত, এই সময় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে লৌকিক দেবদেবীর থানে অনুষ্ঠিত আচার-সংস্কৃতি বিশদে সামনে থেকে দেখার সুযোগ হয়। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্য বিশ্বাসের অভিমত খুবই গ্রহণযোগ্য । তিনি কতগুলি বিষয় ভেবে নিয়ে ক্ষেত্রে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন; যাতে ক্ষেত্র থেকে সুষ্ঠ ভাবে তথ্য পাওয়া যায় ও ক্ষেত্রের নানা অবাঞ্ছিত বিষয়কে এড়িয়ে চলা যায়। কেননা বর্তমান সমীক্ষকের এমন অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে যেখানে ক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যায় যে, অনেক ব্যক্তি নিজের আগ্রহের কারণে বা মানসিকতার কারণে তথ্য পেতে সমস্যার উদ্রেগ করে। ফলে ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে নিম্ন উদ্ধৃত বিষয়গুলি মাথায় রাখতেই হয়—

১। ক্ষেত্রসমীক্ষক সমীক্ষিত অঞ্চলের ভাষাটি জানবে।

২। স্থানীয় ভুগোলটি জানতে হবে ভালো করে।

৩। সমীক্ষিত অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি জানতে গেলে স্থানীয় মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা জানা থাকা জরুরি।

৪। অনেকখানি পদযাত্রা করার শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাকা চাই।

৫। ক্ষেত্রসমীক্ষকের যেন অন্যের কথা মেনে নেবার মানসিকতা থাকে। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য তার জানা তথ্য বা ধারণার সঙ্গে না-ও মিলতে পারে কিন্তু সে ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক করার দরকার নেই। এতে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

৬। পোশাক পরিচ্ছেদ এমন হওয়া উচিত যাতে স্থানীয় মানুষের কাছে ক্ষেত্রসমীক্ষক সহজে গ্রহণযোগ্য হয়।

৭। ক্ষেত্রসমীক্ষক মন দিয়ে তথ্যদাতার কথা শুনবে। তর্ক করবে না। হতে হবে বন্ধু ভাবাপন্ন।[১২]

ক্ষেত্র থেকে নানা পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তার মধ্যে দু'টি পদ্ধতি হল- নিয়মনিষ্ঠ পদ্ধতি (formal method) এবং ঘরোয়া পদ্ধতি (informal method)। এরমধ্যে নিয়মনিষ্ঠ পদ্ধতিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি নির্দিষ্ট ছক মেনেই হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্রসমীক্ষায় যে প্রশ্ন থাকে কেবলমাত্র তার ভিত্তিতে তথ্যদাতাদের থেকে উত্তর নেওয়া হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় ঘরোয়া পদ্ধতি (informal method) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিতে রাস্তার চায়ের দোকান বা কোনো থানের কাছে তাস খেলার জায়গায় মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় তা একেবারেই খাঁটি । এই যে চলতে চলতে, চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে মানুষদের কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় সেই তথ্যে নানা দিক প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত তথ্য জীবন্ত, কার্যত কথা বলে। আসলে ক্ষেত্রসমীক্ষা যখনই কোনো নির্দিষ্ট ছক নির্ভর হয় তাতে বৈচিত্রের প্রবেশ থাকে না। ফলে ক্ষেত্রসমীক্ষাতে ফর্মাল মেথডে নির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া তার মধ্যে অন্য কিছু পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে ঘরোয়া-পদ্ধতি তখনই কার্যকরী হয়ে উঠবে যখন কোনো সমীক্ষক নিজের আমিত্বকে জাহির না করে ঐ সমস্ত মানুষদের একজন হয়ে উঠবেন। সমীক্ষক নিজের শিক্ষার অহংবোধ দিয়ে যদি দূরত্ব তৈরি করে রাখে তাহলে লোকায়ত মানুষদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের নানা পদ্ধতি তৈরি হয়েছে। এই পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হল, ব্যক্তিগতভাবে তথ্য সংগ্রহ। অর্থাৎ, একজন সমীক্ষক কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে বিশদে তথ্য সংগ্রহ করবে। এই সংগ্রহ পদ্ধতিকে বলে *'সামনা-সামনি'* পদ্ধতি। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের আর একটি পদ্ধতি হল— *'দলগত'*ভাবে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি। অর্থাৎ, তথ্যদাতারা দলগতভাবে এক জায়গায় জড় হবেন সমীক্ষক তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন বা কোনো অনুষ্ঠানের সময় সমীক্ষক সেখানে গিয়ে সরাসরি ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন। যদিও সমীক্ষক নিজের পরিস্থিতি অনুযায়ী এই দুই পদ্ধতি একসঙ্গে প্রয়োগ করতে পারে। কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বা জানাশোনা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। তার মধ্যে বিশেষত লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেখানে ক্ষেত্রসমীক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে সেখানে আমাদের বোঝাপড়া সাধারণত দুইভাবে হয়ে থাকে— *পূর্ব জ্ঞান-পদ্ধতি* (prior knowledge) এবং *তাৎক্ষণিক জ্ঞান-পদ্ধতি* (instant knowledge) এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমে। ক্ষেত্রসমীক্ষার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগে থেকেই ওই এলাকা বা সেখান থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার হাল-হকিকত জেনে ক্ষেত্রসমীক্ষা করাকে পূর্বজ্ঞান পদ্ধতি বলে। এক্ষেত্রে নানা বই ও পত্র-পত্রিকা পড়ে সেই এলাকার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা নিয়ে একজন সমীক্ষক ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। আবার সমীক্ষক তার সমীক্ষিত অঞ্চল সম্পর্কে কোনো পূর্বজ্ঞান ছাড়াই উপস্থিত হয়। ক্ষেত্রে গিয়ে সরাসরি এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে সেই এলাকার বিশদে জ্ঞান লাভ করে। এই যে পূর্ব-জ্ঞান ছাড়াই কোনো এলাকার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে জানাকে তাৎক্ষণিক জ্ঞান আহরণ পদ্ধতি বলা হয়। কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রসমীক্ষা পদ্ধতি বেশি করে খরচ সাপেক্ষ এবং এতে অনেক বেশি সময় যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাদের থেকে তথ্য পাওয়া যায় তাদের ক্ষেত্রবন্ধু বলা হয়। অনিমেষকান্তি পাল একটি ছকের সাহায্যে আমাদের বুঝিয়েছেন যে আমরা কাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করব—

> ১। স্থানীয় মানুষ(Local) ২। উত্তমরূপে অবিহিত ৩। সুপরিচিত ও প্রভাবশালী এবং উদার ও প্রগতিশীল।[১৩]

সমীক্ষক এই পদ্ধতিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করলে ক্ষেত্র থেকে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবে তথ্য পেতে পারে। তথ্যদাতা সব সময় ভালো মনে তথ্য দেবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বিশেষকরে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা কোনো বিষয়ে ভালোভাবে জানা ব্যক্তির থেকে তথ্য পেতে সমস্যা হয়। কেননা, তারা নানা ব্যস্ততার জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষককে সময় দিতে পারেন না। এছাড়া কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সব সময় সমীক্ষককে তথ্যদানে উৎসাহ দেখান না। ফলে একজন সমীক্ষককে নিজের চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্ষেত্র থেকে তথ্য নিতে হয়। এছাড়াও তথ্যদাতার কতগুলি বিষয় আমাদের মাথায় রাখতেই হয়। অনিমেষকান্তি পাল এই বিষয়টি সুন্দরভাবে বলেছেন—

> ১। তথ্যদাতার শিক্ষাগত মান ২। তথ্যদাতার জীবিকা ৩। অথ্যদাতার আদি বাসস্থান ৪। তথ্যদাতার ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি।[১৪]

যেকোনও ক্ষেত্রসমীক্ষায় সমীক্ষকের তথ্যদাতার সম্পর্কে এই বিষয়গুলি জানা একান্ত জরুরি। কেননা, তথ্যদাতার সামাজিক অবস্থান ও তার জীবিকার কারণেই তিনি লোকায়ত বা তার স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। যেমন যে সমস্ত মানুষের জীবিকা জল-জঙ্গলে মাছ ধরা তারা বনবিবি

থেকে শুরু করে তাদের পূজিত দেবদেবী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। এছাড়াও একজন ক্ষেত্রসমীক্ষক ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে আরও কতগুলি বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা উচিত বলে মনে করা হয়। এই ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি একান্ত জরুরি বা যে প্রস্তুতি নিয়ে ক্ষেত্রে যাওয়া হয়েছে তাহল— প্রথমে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য যে অঞ্চল ঠিক করা হয়েছে সেই এলাকার কোনো মানুষের সঙ্গে পরিচয় করা হয়েছে, যাতে ওই ব্যক্তি এলাকার বিশদে পরিচয় দিতে পারে। এরপর ওই এলাকায় একবার পাইলট সার্ভে করা হয়। এই পাইলট সার্ভের মধ্যদিয়ে সমীক্ষিত এলাকায় কতকগুলি লৌকিক দেবদেবীর থান আছে সে সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। পাইলট সার্ভে বা পথদেশক সমীক্ষা যে কোনো ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য একান্ত জরুরি। কোনো থানের বা সেই থানের দেবদেবীর বিশদে পরিচয় পাওয়ার জন্য সেই থানের পূজারী বা সেবায়েতের সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাওয়ার আগে ঐ থানের পূজারী বা সেবায়েতের সঙ্গে কথা বলে একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে আসা হয়েছে।

এই গবেষণার জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা উপরের পদ্ধতি ছাড়াও আরও কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে— (ক) কোনো এলাকার ব্যক্তির সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে ও তাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করলে তথ্য পাওয়া অনেক সহজে হয়। (খ) কোনো এলাকার কোনো ব্যক্তি বা কারো সঙ্গে পূর্বপরিকল্পনা না করেই বহু ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। আমরা যখন কোনো অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাই তখন একটি নির্দিষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়েই যাই। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে আমাদের চাহিদা মতো তথ্য নাও মিলতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষার বিশেষজ্ঞদের মত হল, ক্ষেত্র নিজেই গবেষণার বেশ কিছু জিজ্ঞাসাকে নিজেই তৈরি করে দেবে। আবার নিজের গবেষণার জিজ্ঞাসাকেও ঠিক রাখতে হবে। ফলে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়েই একটি সমৃদ্ধ ও যুক্তি নির্ভর তথ্য আমরা পেতে পারি। একজন গবেষক তার নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী (focus) তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। আবার সমীক্ষক উদ্দেশ্যহীনভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। আমাদের এখানে বলার বিষয় হলো যে, একজন ক্ষেত্রসমীক্ষকের তার নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা, সময়, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করেই তথ্য সংগ্রহে মন দেওয়া উচিত। কেননা সমীক্ষক অগাধ ক্ষেত্রের মধ্যে দিশেহারা হয়ে, কেবলমাত্র নিজের ভালো লাগার দ্বারা

চালিত হয়ে তথ্য সংগ্রহ করলে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। ফলে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তিপরম্পরার দ্বারা চালিত হওয়া উচিত বলে মনে হয়। একজন ক্ষেত্রসমীক্ষকের তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা উচিত বা একটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে হলে কীভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা দরকার অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা* বইতে বলেছেন—

> ১. সাময়িক: অল্প সময়ের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা সাময়িক ২. ধারাবাহিক- কোনো একটি গোষ্ঠী বা বর্গ, উৎসব বা অনুরূপ কোনো বিষয়ে নিগূঢ় (Intensive) তথ্যাহরণের জন্য কোন কোন অঞ্চলে বার বার যেতে হতে পারে। সেরকম ক্ষেত্রসমীক্ষা ধারাবাহিক। ৩. বদ্ধ : সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় জানার জন্য একটি বা দুটি বিষয় নির্বাচন করে শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করার নাম বদ্ধ (Closed) ক্ষেত্রসমীক্ষা। ৪. মুক্ত কোনো একটি অঞ্চলে কোনো একটি গোষ্ঠীর মধ্যে গিয়ে তাদের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তথ্য তাল্লাশ করার জন্য যদি কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয় স্থির না করা থাকে- যদি মুক্ত মনে ক্ষেত্রসমীক্ষক দল মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে তবে সেই পদ্ধতিকে বলে মুক্ত (Open) ক্ষেত্রসমীক্ষা।[১৫]

লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে পালিত আচার-অনুষ্ঠানের ও এই সমস্ত দেবদেবীকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস পেতে গেলে কেবলমাত্র একবার সেই অঞ্চলে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করলে হয় না। লোকসংস্কৃতির কোনো বিষয়ে সম্যক ধারণা বা জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেই সংস্কৃতির পূর্বাপর ইতিহাসকে জানতে হয়। । এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আমার গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষায় কেবলমাত্র একটি থানে, একজনের সঙ্গে একবার কথা বলে বিষয়টির সম্পর্কে বিশদে ধারণা লাভ করা যায় না। এইজন্য কোন থানে গিয়ে ওই পাড়া বা গ্রামের যথাক্রমে— পুরোহিত, নিত্য পূজারি, গ্রামের বয়স্ক পুরুষ, নারী সর্বোপরি নতুন প্রজন্মের সঙ্গে থানকেন্দ্রিক সংস্কৃতি, সাহিত্য নিয়ে একাধিকার কথা বলার মধ্য দিয়ে একটি বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এই ক্ষেত্রসমীক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বয়স্ক নারীদের। কেননা আমরা জানি যে, আমাদের ঐতিহ্য ধারণে সবথেকে বেশি ভূমিকা নেয় নারীরা। নারীর পালিত আচারই আমাদের ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। এদের সঙ্গে কথা বলে, থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতির আদিরূপটি সহজে পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতি নিয়ে কোনো গবেষণায় তাই লোকায়ত মানুষের পালিত সাহিত্য-সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন রূপটিকে জানা খুবই জরুরি—

> লোকসংস্কৃতির আলোচনায় এই সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দান করতে হবে। কোনো একটি উপাদানের উৎস কোথায় এবং কীভাবে সেটি বিকশিত হয়েছিল এবং যুগ ও কালের সীমানাকে অতিক্রম করে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনান্তে সেটি একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধানে তার উল্লেখ অপরিহার্য।[১৬]

ফলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় কোনো এলাকায় একবার উপস্থিত হয়ে তথ্য সংগ্রহ করলে এই বিষয়টি বোঝা যায় না। কেননা লোকসংস্কৃতি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই চলমান সংস্কৃতি সময় ও স্থানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলে নেয়। আজকের সময়ের সংস্কৃতির চালচিত্র কয়েক বছর পর তা বদলে যেতে পারে। এই পরিবর্তিত সংস্কৃতির রূপ ও তার আদি রূপকে পেতে গেলে বারবার ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হবে, বিভিন্ন শ্রেনি, বয়সের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আর এইভাবেই আমরা লোকসংস্কৃতির অন্দরমহলের সন্ধান পেতে পারি।

৩.৪ বর্তমান সমীক্ষকের অভিজ্ঞতা ও সমীক্ষাপ্রাপ্ত মৌখিক আখ্যান

ক্ষেত্রসমীক্ষা১ (৫/৪/২০১৪)— এই ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রথম দিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চত্বরে পেশায় রিকশাচালক বিমল মণ্ডল প্রভূত সাহায্য করেন। বিমলবাবু আগে থেকেই এই সোনারপুর এলাকায় নিজের পরিচিত যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর থান আছে তার একটি তালিকা মানসিক ভাবে তৈরি করে রাখতেন এবং ওই থানের সেবায়তের সঙ্গে কথা বলে রাখতেন। এর ফলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়েছে। ফলে এখানে ক্ষেত্রসমীক্ষার পূর্বজ্ঞান পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। বিমলবাবুর মাধ্যমে সোনারপুর থানার হাসানপুর গ্রামে কয়েকটি থানের ইতিহাস পাওয়া যায়। বিমল বাবুর সঙ্গে সোনারপুর থানার বেশকিছু গ্রামে ঘুরে লৌকিক দেবদেবীর আখ্যান ও সেই সমস্ত দেবদেবীর থানের স্বরূপ বুঝতে সুবিধা হয়েছে। এক্ষেত্রে দুইভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে— প্রথমত, বিমলবাবু যে সমস্ত থানকে চিনতেন ক্ষেত্রে গিয়ে সবার প্রথমে সেই সমস্ত থানের তথ্য নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিমলবাবু গ্রামের বেশকিছু বয়স্ক মানুষদের আগে থেকেই বলে রেখে দিয়েছিলেন। এরফলে কোনো থানের সম্পর্কে দশ জনের মতামত পাওয়া পাওয়া যায় ও একইসঙ্গে থানটির বিশদে পরিচয় লাভ করা যায়। এই বিভিন্ন মতামতের ফলে তথ্যের বিভ্রান্তির সুযোগ থাকে তেমনি আবার এর মধ্যদিয়ে একটি বিষয় সম্পর্কে নানা অবস্থানের বা বিষয় বৈচিত্র পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক কোনো থানের লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের কাহিনি প্রচলিত আছে। এবং জড়ো হওয়া দশজনের সেই কাহিনির নানা রকমফের পাওয়া যায়। আমরা এর

মধ্যদিয়ে বুঝতে পারি যে, ওই লৌকিক দেবদেবী কতটা জীবন্ত বা লোকায়ত মানুষের ভাষায় 'জাগ্রত'। কিন্তু এখানে একটি বিষয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে একটি কাহিনির নানা রূপভেদ। এই সমস্তের মধ্যে থেকে প্রকৃত তথ্য জানতে গেলে আমাদের যেমন বারবার ক্ষেত্রে যেতে হয় তেমন করেই সেই বিষয় নিয়ে বিশদে জ্ঞান অর্জনের দাবী রাখে। বিমলবাবুর সঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময়ে একটি বিষয় বারবার সামনে এসেছে, এই সমস্ত মানুষ নিজের এলাকার বাইরে দূরের গ্রামের লৌকিক দেবদেবীর থান নিয়ে কথা বলেন। এরফলে যেমন এক জায়গায় অঞ্চলের নানা দেবদেবীর তথ্য সহজে পাওয়া যায়। ঠিক তেমন করে দেবদেবী কেন্দ্রিক আখ্যানের নানা স্তর পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দিন বিমলবাবু সোনারপুর স্টেশন থেকে যে রাস্তাটি ভাঙড়ের দিকে গিয়েছে সেই রাস্তা বরাবর অঞ্চলের দেবদেবীর থানে নিয়ে যান। ক্ষেত্রসমীক্ষার পরের দিন একটা বাইক ভাড়া করে নেওয়া হয়। কেননা এই সমস্ত গ্রাম্য পথে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গেলে বাইক-ই একমাত্র সুবিধাজনক বাহন হতে পারে। ভাঙড়ে শীতলার যে প্রাচীন থানটি আছে তার সম্পর্কে বিমল বাবু আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। বিমলবাবুর সঙ্গে শীতলার থানে নিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ, থানের যে নিত্য সেবায়েত মহিলা, তার ওপর মা শীতলার ভর হয় একটি নির্দিষ্ট দিনে। সেই নির্দিষ্ট দিনে না হলেও বিমলবাবু ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেন ও এই থানের সম্পর্কে বিশদে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষার আরেকটি সুবিধা হল ক্ষেত্রবন্ধু যদি আগে থেকে পরিচিত হন। বিমলবাবুর সঙ্গে এই মহিলার যেহেতু আগে থেকেই পরিচয় ছিল ফলে সমস্ত বিষয়ে জানতে সুবিধা হয়েছে ও তথ্য পেতে সুবিধা হয়েছে। এরপর হাসানপুর থেকে সোনারপুর স্টেশনের কাছে আসা হয়। অর্থাৎ, সোনারপুর স্টেশন থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে যে রাস্তা গিয়েছে সে রাস্তা ধরে একটু এগোলেই বনবিবির থান পাওয়া যায়। ওই থানের পুরোহিতের সঙ্গে কথা হয়। পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে থানের উৎপত্তি, থানের দেবীর মূর্তি ও এই দেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কাহিনির বিশদে পরিচয় নেওয়া হয়। এই থানে বনবিবির একক মূর্তির বদলে সাতটি মূর্তি। বনবিবির সঙ্গে সাতবিবির কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এই সমীক্ষার মধ্য দিয়ে জানা গিয়েছে। সোনারপুরে বনবিবির থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময় তার পরের দিনের ক্ষেত্রসমীক্ষার একটি রূপরেখা তৈরি করে রাখা হয়। ফলে পরের

দিনের ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি নির্দিষ্ট ক্রম মেনে হতে থাকে ও ক্ষেত্রসমীক্ষায় গতি আসে। কোনো বিদ্যায়তনিক পরিসরে ক্ষেত্রসমীক্ষা করলে এমন পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। এই একই দিনে সোনারপুরের বোসপুকুর কলেজের পাশে পঞ্চানন্দের থান ঐতিহ্য পরম্পরায় পূজিত হচ্ছেন। এলাকার বহু মানুষ সঙ্গে কথা বলে এই থানের ঐতিহ্য সম্পর্কে ও এই থানে পালিত আচার-অনুষ্ঠানের বিশদে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই থানের উৎপত্তি ছাড়া নানা বিষয় নিয়ে লিখিত পত্রিকা সংগ্রহ করা হয় যা গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এরফলে লিখিত ঐতিহ্যের সঙ্গে মৌখিক ঐতিহ্যের একটি তুলনামূলক আলোচনার পরিসর তৈরি হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া লোকসংস্কৃতির উপাদানের এই বিষয় বৈচিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। বোসপুকুরের কাছে একটি গম্বুজ আকৃতির থানে বিশাল আকৃতির পঞ্চানন্দের মূর্তি আছে। এই থানের যিনি পূজারী ক্ষেত্রসমীক্ষার দিনে উপস্থিত ছিলেন না। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে এই সমস্যায় বারবার পড়তে হয়। কোনো থানের সম্পর্কে জানতে হলে সব সময় তথ্য সহজে পাওয়া যায় না। আসলে যে সমস্ত মানুষদের থেকে তথ্য নেওয়া হয় তারা প্রায়ই কোনো না কোনো কারণে বাড়ির বাইরে থাকেন। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে ওই বাড়ি বা গ্রামের কোনো বয়স্ক নারী পুরুষের থেকে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে তথ্য নেওয়া হয়েছে। এরফলে পাওয়া তথ্য গবেষণার অন্য মাত্রা যোগ করে। আসলে যে কোনও বিষয়ে পুরুষের ও নারীর পাঠ ভিন্ন হয়। ফলে তথ্য বা কোনো বিষয়ে তার বয়ানও আলাদা হবে।

এই বছরে এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখে মগরাহাটে দ্বিতীয়পর্বে বেশ কিছু লৌকিক দেবদেবীর থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়। এই সমস্ত অঞ্চলে প্রতিটি বাড়িতে যেমন গৃহ দেবতার নিত্যপূজা হয়, আবার গ্রাম্য পথে, পাড়ার প্রান্তে ও বিভিন্ন স্থানে গ্রাম্য, আঞ্চলিক দেবদেবীর থান দেখতে পাওয়া যায়। মগরাহাটে এই সমস্ত দেবদেবীর থান ও তার ইতিহাস জানার জন্য এই পর্বে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়া হয়। এই গবেষণার একটি প্রধান জিজ্ঞাসাই হল, থানের অবস্থানের জন্য সেই জায়গার বাস্তুতন্ত্র বা পরিবেশের সংরক্ষণ কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। মগরাহাট স্টেশনের কাছে উত্তরপাড়া বলে একটি গ্রামে গাজিবাবার থান। রাস্তার পাশে একটি বাঁশঝাড়ের কাছেই এই থানটি আছে নিতান্তই প্রাকৃতিকভাবে দিনের পর দিন পূজিত হয়ে আসছে। কিন্তু এই থানকে নিয়ে বহু কাহিনি প্রচলিত আছে। সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা যায় এই গাজিবাবার থান তারা

বংশপরম্পরায় পুজো করে আসছে। ওনার সঙ্গে কথা বলেই জানা যায় যে, এই থানটি ও তার চারপাশের বেশ কিছু জমি হল দেবোত্তর এবং তা নিষ্কর। ফলে এই দেবোত্তর জমি বলে এই জায়গায় নাগরিক প্রভাব গ্রাস করতে পারেনি। এরপর ময়দার রবীন পাকড়াশী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করা হয়। ময়দার বিশালাক্ষী থানের সম্পর্কে নানা তথ্য রবীনবাবুর থেকে জেনে নেওয়া হয়। এই থানটি এক বিরাট বট গাছের নীচে অবস্থিত। কথা বলে জানা যায় যে, থানটি আনুমানিক দু'শো বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। এই থানটিতে যাওয়ার একটি প্রধান কারণই হল একে ঘিরে তৈরি হওয়া আখ্যানকে বিশদে জানার জন্য। বাংলায় বহুল প্রচলিত মৌখিক আখ্যান হল দেবীর শঙ্খ পরিধান ও শাক খাওয়ার ইচ্ছে। এই বিশালাক্ষীর থানকে কেন্দ্র করে এই দুটি আখ্যান বংশপরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে। এছাড়াও এই থানের সাংস্কৃতিক নানা কর্মকান্ডের কথা আলাপ চারিতার মধ্য দিয়ে উঠে আসে। কোনো অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে করতে অবধারিত ভাবে যেটা হয়ে থাকে তা হল, ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে করতে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যাওয়া বা কোনো এলাকার থেকে অন্য এলাকার কোন দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া। আসলে যখন কোনো থানের সম্পর্কে সেই এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে একইসঙ্গে তাদের থেকে অন্য এলাকার দেবদেবীর সন্ধান জানতে চাওয়া হয়েছে। এরপর মগরাহাট থেকে এই একই কারণে সোনারপুর চলে আসা হয়। সোনারপুরের কলুপাড়া রোড ধরে মাহিনগর বিবিমা তলায় এলে বিবিমায়ের থান পাওয়া যায়। একটি উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে অনেক উঁচুতে ঢিবির মতো থানে সাতটি মাটির স্তূপ আছে। একেই বিবিমায়ের থান বলে লোকায়ত মানুষ। থানে উপস্থিত হলে, তখন প্রায় দুপুর হয়ে গেছে এবং একটি মেয়ে থানটি পরিষ্কার করছে পুজো দেওয়ার জন্য। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে জানা যায় সে এই থানটির নিত্যপূজারী। এই থানের সম্পর্কে জানার জন্য অশোক সাধুখাঁ মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলা হয়। এই থানের সঙ্গে আখ্যানে ধরা আছে পারিবারিক বিবাদের প্রসঙ্গ। এখানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়ার কারণই হল, এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবী কীভাবে নিজের দেবীত্ব সরিয়ে ঘরের মানুষ হয়ে যায়, তা জানার জন্য। এই আখ্যানের মধ্যে ধরা আছে- গৃহ বিবাদের জন্য যেমন করে মানুষে ঘর আলাদা হয়ে যায় ঠিক এই দেবদেবীর মধ্যে বিভেদ হয় এবং তাদের স্থান পরিবর্তন ঘটে। এই দেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আখ্যানে দেবদেবী নিজেদের এলাকা ভাগের কথা বলছে। এইরকম তথ্য বাংলার বিভিন্ন থানকে কেন্দ্র করে পাওয়া যায়। একইভাবে

অশোকবাবুর থেকে জয়নগরের একটি থানের সন্ধান মেলে। বারুইপুর থেকে একটি রাস্তা দক্ষিণ বরাবর জয়নগরের দিকে চলে গিয়েছে, এই রাস্তার পাশেই থানটি অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, অশোকবাবু ছাড়া এই থানের ঠিকানা রাস্তার ধারে মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করেই জানা সম্ভব হয়েছে। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষায় এই রাস্তার মানুষকে জিজ্ঞেস করে ঠিকানা সন্ধান করা একটি অতি প্রচলিত ও কার্যকরী তথ্য সন্ধানের পথ। থানটিতে মনসা, শীতলা এবং পঞ্চানন্দ এই তিন দেবদেবীর মূর্তি আছে। এই থানকে কেন্দ্র করে যে পুজো কমিটি আছে, মোহন ভাট তার সভাপতি। এই থানকে কেন্দ্র করে যে আখ্যান আছে তাতে এলাকার মানুষের নিত্য জীবনযাপনের নানা চিত্র দেখা যায়। বহু প্রাচীন এই থানকে কেন্দ্র করে যে আখ্যান আছে তা এই অঞ্চলের সময়ের দলিল হিসেবে কাজ করে। আর সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই থানের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও তার ক্ষমতার ইতিহাসকে জীবন্ত আকারে পাওয়া যায়। মোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, একবার এই থানে অন্য পুরোহিত দিয়ে পুজো করানোর জন্য নানা সমস্যা হয় ও পুরোনো পুরোহিতকেই বহাল রাখা হয়। এইরকম ঘটনা ও তাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের আখ্যান আমরা বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এরপর জয়নগরের হলদিয়া গ্রামের সাতবিবির থান উল্লেখযোগ্য। জয়নগর স্টেশন থেকে দক্ষিণ বরাবর বেশ কিছুটা গেলে এই সাতবিবির থান পাওয়া যায়। এই থানের সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন পুলীনবিহারী মণ্ডল মহাশয়। বাংলার লোকায়ত সমাজের কাছে কলেরা একটি গুরুতর সমস্যা। এই কলেরার দেবী হিসেবে সাতবিবিকে পুজো দেওয়া হয়। এই দেবীকে কেন্দ্র করে আখ্যানে দেখা যায় যে তিনি যে গ্রামে কলেরা হয়েছে রাত্রে সেই গ্রামে ঝাঁড়ু দিয়ে জঞ্জাল সাফ করছেন। দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের নৈকট্য তা এইসমস্ত দেবদেবীকেন্দ্রিক আখ্যানের মধ্যে ধরা আছে। এই সাতবিবির থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা শেষ করতে প্রায় বিকেল হয়ে যায়। জয়নগর থেকে সরাসরি রাস্তা ধরে কলকাতার দিকে আসার পথে দক্ষিণ বারাসতের বহড়ু গ্রাম পাওয়া যায়। এখানে নাইয়া পাড়ায় লোকায়ত শিবের থান আছে। এই বহড়ুর নাম হয়েছে এই শিবের নাম অনুসারে। বহড়ু মানে এদের কাছে বড়-এর অপভ্রংশ। আমরা রামদাস নাইয়ার থেকে প্রায় সন্ধ্যার দিকে এই থান সম্পর্কে নানা কাহিনি ও তথ্য জানতে পারি। একটি বিরাট বকুলগাছের নীচে একটি কালো পাথরকেই এরা শিব বলে পুজো করে। অবশ্য কয়েকটি বারামূর্তিও আমরা দেখা যায়। রামদাসবাবু ও স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে

কথা বলে জানা যায়, চৈতন্যদেবের এখানে রাত্রিবাস ও শিবের পুজো করার প্রসঙ্গ এবং এখানে যে নাইয়া পাড়া হয়েছে, তারা আসলে চৈতন্যদেবের নৌকার সহযাত্রী বা নাবিকরা। এছাড়া এখানে যে ফল বিহীন বকুলগাছ আছে তাকে কেন্দ্র করেও বহু কাহিনি তৈরি হয়েছে। এরপরের দিন, অর্থাৎ ছয় তারিখে আমি মগরাহাটে কয়েকটি জায়গায় আবার ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়া হয়। মগরাহাটে উড়েলচাঁদ গ্রামে একটি আটেশ্বরের থান আছে। এলাকার মানুষের কাছে এই লৌকিক দেবতা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ের সঙ্গে বিরাজ করছেন। একটি ফাঁকা মাঠের মাঝখানে এই দেবতার থান। থানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এই থানের ভিতরে একটি গর্ত আছে ও সেখানে মানুষ মানত করে কিছু চাইলে নানা ঔষধ উঠে আসে এবং এরজন্যে মানুষের বহু রোগ সেরে যাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন কামনা পূর্ণ হয়েছে। এই গর্তটিকে কেন্দ্র করে বহু আখ্যান নূরগাহাজ নস্করবাবুর থেকে পাওয়া যায়। এছাড়াও এই থানটি এক বিশেষ কারণের জন্য বিখ্যাত। এই থানের পাশেই দেখা যায় বট ও অশ্বত্থের সদ্য বিয়ে দিয়ে রোপণ করা হয়েছে এবং এর কিছুটা দূরেই একটি বড় বট-অশ্বত্থের বিয়ে দেওয়ার পর সিমেন্টের বেদী করে বাঁধানো আছে। এই বেদীতে নানা সাল-তারিখ সমেত বৃক্ষরোপণকারী ও এই প্রথা বহনকারীর নাম পর্যায়ক্রমে দেওয়া আছে। এখান থেকে বাংলার বৃক্ষপূজা ও তার ইতিহাস সম্পর্কে একটি বিস্মৃত তথ্য আমাদের সামনে সহজেই চলে আসে। এরপর ময়দার পাতালভেদী কালীমন্দিরে যাওয়া হয়। ময়দার এই মন্দিরটি একেবারেই মূলরাস্তার ধারেই অবস্থিত। এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে একটি বড় মাপের বাজার গড়ে উঠেছে। এই মন্দিরটি আসলে পরবর্তী সময়ে তৈরি হয়েছে, এই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাটির থান পাকা মন্দিরে উন্নীত হয়। বর্তমানে কালীর মন্দির হলেও এর প্রাচীন বা আদিরূপ এমনটা ছিল না। এর আদিরূপ বা মন্দিরটির উৎপত্তির সঙ্গে জয়নগরের জয়চন্ডী দেবীর মিল পাওয়া যায়। এখানেও জমিদার নৌ বাণিজ্যে যাওয়ার সময় নদীর পাড়ে একটি বকুল গাছে বালিকা দেখতে পান এবং যথারীতি তাকে ধরতে যায় ও হার মানে। পরে রাত্রে স্বপ্নাদেশ পায় ও দেবীর উদ্ধার হয়। দুই জায়গার দেবীকে কেন্দ্র করে গল্পের কাঠামো একই। কিন্তু এই মন্দিরের বা দেবীর বিশেষত্ব হল, এই দেবীকে ঘিরে তৈরি হওয়া বাজার ও এর সঙ্গে এই অঞ্চলের জমিদারদের সংযুক্তির ইতিহাস। বাংলার জমিদারতন্ত্রের ইতিহাস ও তার ধরণ এই সমস্ত দেবদেবীর থান ও তাদের কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া আখ্যানের মধ্যে ধরা আছে।

যাদবপুরের বাজারে সবজি-বিক্রেতা কার্তিক কাঁসারি ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রভূত সাহায্য করেছেন। কার্তিকবাবুর বাড়ি মগরাহাটের জলধাপা গ্রামে। তিনি নিজেই একজন পালা গায়ক, এরফলে এলাকার বাইরে তিনি বিভিন্ন সময়ে গান করতে যান। মগরাহাট থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকার কোথায় কোন কোন থান আছে, কার্তিকবাবুর প্রায় মুখস্থ বললে চলে। মগরাহাট স্টেশনে নেমে পূর্ব দিকের রাস্তা ধরে একটু এগোলেই বিবিমায়ের থান পাওয়া যায়। লোকাল গাইড কার্তিকবাবু এইখানে প্রতিবছর মায়ের পালা গান করে থাকেন। এই থানে চৈত্রমাসে মায়ের বাৎসরিক পুজোর দিনে যাওয়া হয়। গ্রামীণ পরিবেশে এই বিবিমার পুজো ঘিরে মেলা বসে। এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, এই সমস্ত দেবদেবীকে ঘিরে মানুষের প্রতিদিন ও বাৎসরিক আচার-আচরণ তথা এর সাংস্কৃতিক দিকটি সরাসরি প্রত্যক্ষ করা। কার্তিকবাবুর জন্য এমন একটি গ্রামীণ পরিসরে বিবিমায়ের মেলা ও তাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দেখার সুযোগ হয়। এই মেলায় কার্তিকবাবু ও তার দলের অন্যদের সঙ্গে কথা বলে মেলার ধরণ ও দৈবীমহিমা কেন্দ্রিক মাহাত্ম্যের কাহিনি জানতে পারা যায়। এই বিবিমার থানের মেলা ঘিরে যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেক ফারাক হয়ে গেছে। এই থানের চাতালে বসে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে জানতে জানা যায় যে, আগে এখানে মনসা, শীতলা ও বিবিমায়ের পালা হতো। বর্তমান সময় কেবলমাত্র সন্ধ্যের দিকে এক ঘন্টা মতো বিবিমায়ের পালা হয়ে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিৎপুরের যাত্রা ও হাঙ্গামার মধ্যে দিয়েই মানুষ আনন্দের খোরাক খুঁজে নেন। আসলে গ্রামের বয়স্ক, পুজো কমিটির মানুষরা এই পরিবর্তিত মন ও চাহিদার কথা বুঝেই তাদের পালিত সাংস্কৃতিক পরিসরে নানা আধুনিক দিকের প্রবেশ ঘটিয়েছেন। এই থানের উৎপত্তির ইতিহাস ও বিবিমাকে নিয়ে প্রচলিত কাহিনি পাওয়া গিয়েছে কার্তিকবাবু ও তাঁর অন্য শিল্পীদের কাছ থেকে। কার্তিক বাবুর পালা গান শেষ হতে হতে রাত্রি আটটা বেজে যায়। এরপর কার্তিকবাবুর সঙ্গেই তাঁর বাড়িতে রাতে থাকা হয়। যে কোনও গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে গ্রামের মানুষের কাছে এই আতিথ্য পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। কোনো এলাকায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক এইভাবে তৈরি হয়। আর এই সম্পর্কের জন্য ক্ষেত্রে যে কোনও পরিসর থেকে সহজেই তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে।

পরের দিন সকালেই জলধাপা গ্রামের কার্তিকবাবুর বাড়ি থেকে সামান্য দূরে মাঠের মাঝখানে হোগুলা বনের ভিতর দিয়ে একটি ছোট্ট ঢিবির মতো দ্বীপচণ্ডীর থানে যাওয়া হয়। এই দ্বীপচন্ডীর থান নানা কারণে এই গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ। এর উৎপত্তি সম্পর্কে যে তথ্য এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, তার সঙ্গে বাংলার অতীত ইতিহাসের সম্পর্ক আছে। জানা যায় যে, এই থানের উৎপত্তি বা প্রতিষ্ঠা করেছে শ্রীমন্ত সওদাগর। এই থানের পাশেই দেখা যায় যে, একটি পুকুরের মধ্যে কিছু নৌকার কাঠ এখনো মাটির নীচ থেকে দেখা যাচ্ছে। এলাকার মানুষের বক্তব্য যে, এককালে এখান দিয়ে অর্থাৎ কিনা আদিগঙ্গা দিয়ে মানুষ যাতায়াত করত এই নৌকার মাধ্যমে। একসময় যে এই সমস্ত এলাকা জলে ঘেরা দ্বীপ ছিল তা এই দেবীর নামের মাধ্যমেই বোঝা যায়। এলাকার মানুষদের সঙ্গে ও কার্তিকবাবুর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শ্রীমন্ত সওদাগর এই দ্বীপেই চণ্ডী পুজো করেন। আর সেই জন্য এই থানের নাম দ্বীপচণ্ডী। এখানে খোলা আকাশের নীচে একটি দেবদারু গাছের নীচে কয়েকটা মূর্তিকে থান বলে মানুষ পুজো দিচ্ছেন। কিন্তু গ্রামের বলেন যে, এই উন্মুক্ত থানের মূল চণ্ডী হল দুটি সাদা পাথর। কিন্তু এই পাথর সব সময় থাকে না। যে কোনো গবেষকের কাছে এমন দুটি পরস্পরবিরোধী তথ্য আসবে যেখান থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল হয়ে ওঠে। এই দ্বীপচন্ডীর থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে প্রথম লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে প্রথমেই একটি কাহিনি পাওয়া যায়। একটি মেয়েকে ধর্ষকের হাত থেকে মায়ের কৃপায় উদ্ধার হওয়া নিয়ে তৈরি আখ্যানে লোকায়ত মানুষের দৈব-নির্ভরতার দিক প্রকাশিত হয়। এবং এই সমস্ত তথ্য ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া পাওয়া অসম্ভব। জলধাপা থেকে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মগরাহাট স্টেশনের দিকে অগ্রসর হলে বহু প্রাচীন বনবিবি ও শীতলার থান পড়ে। এই থানে দুইবার এখানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়া হয়েছে। বাংলার বহু থানেই বনববিবি ও নারায়ণীর মূর্তি একসঙ্গে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এই থানটি একটু ব্যতিক্রমী, কারণ এইখানে যেদিন বাৎসরিক পুজো থাকে, থানের ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং মুসলমান ফকির যথাক্রমে শীতলা ও বনবিবির পুজো দেয়। কার্তিকবাবু ও সেই থানের পুরোহিত এবং ফকিরকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে, এই প্রথা তারা বংশপরম্পরায় মেনে চলে আসছে। লোকসংস্কৃতি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ঐতিহ্যের সঙ্গে হাত রেখে গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই ঐতিহ্যের স্বরূপ পাঠ ও গ্রহণ-বর্জনের কারণ বুঝতে গেলে লোকায়ত সমাজকে

সামনে থেকে দেখতে হবে। একজন লোক সংস্কৃতির গবেষক কেবলমাত্র 'রেডি মেটেরিয়াল' দিয়ে তার গবেষণার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না। আর পারলেও ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে গবেষকের আলোচনা সীমাবদ্ধতার দোষে দুষ্ট হতে পারে। লোকসংস্কৃতির গবেষকের যদি ক্ষেত্রসমীক্ষা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে তাহলে তার আলোচনার নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে। উন্মোচিত হতে পারে আলোচনরা নতুন নতুন পরিসর।

ক্ষেত্রসমীক্ষা২ (১২.০৫.২০১৪)— গবেষণার একেবারে প্রথম দিকে আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. সুজিত কুমার মণ্ডল মহাশয় ক্ষেত্রসমীক্ষা কীভাবে করতে হয় ও সমীক্ষায় কী কী নিয়ম পালন করা উচিত, তা বিশদে বলেন। একজন ক্ষেত্রসমীক্ষকের ক্ষেত্রে গিয়ে কীভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে কীভাবে তা সংগ্রহ করতে হয় তা তিনি বলে দেন। এইপর্বে বারুইপুরকে ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চল হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। বারুইপুরের ধপধপী বিখ্যাত দক্ষিণরায়ের জন্য। দক্ষিণবঙ্গের রক্ষাকর্তা হিসেবে এই লৌকিক দেবতাকে বাবা দক্ষিণেশ্বর বলে ডাকা হয়। এই থানটি জঙ্গল কেটে যখন মানুষ বসতি স্থাপন করে সেই সময়ে তৈরি বলে জানা যায়। প্রথমেইএ ই থানের পূজারি সুমন্ত চক্রবর্তী(৪৮) মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলা হয়। ধপধপির এই দক্ষিণরায়ের থানে পৌঁছতে গেলে যাদবপুর থেকে প্রথমে বারুইপুরে যেতে হয়। তারপর বারুইপুর থেকে রাস্তাটি দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি রাস্তা যায় জয়নগরের দিকে এবং আর একটি রাস্তা যায় ক্যানিং-এর দিকে। এই ক্যানিং এর দিকে যাওয়া রাস্তা ধরে কিছুটা দূর এগোলে ধপধপীর এই থান পাওয়া যায়। এই থানটির উৎপত্তির ইতিহাসে দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলকাটি সময় তথা বাংলার জমিদারতন্ত্রের ইতিহাস ধরা আছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে আমরা এই থানটি ও দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক আখ্যান নিয়ে যে বইটি আছে তা সংগ্রহ করা হয়। এই থানটিতে দক্ষিণবঙ্গ থেকে শুরু করে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন আসে দক্ষিণ রায়ের কাছে নানা সমস্যার কথা জানাতে। থানে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য উপস্থিত হলে দেখা যায় সেই সময় দক্ষিণরায়ের নিত্য পুজোর সময়। এই নিত্যপুজোর সময় একজন বাড়ির গৃহবধূ নিজের ছোট সন্তানের নামে মানত শোধ করছে। তিনি বলেন যে, তার কোনোমতেই সন্তান হচ্ছিল না। তিনি এই লোকদেবতার কাছে সন্তান কামনায় মানত করে এবং তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেন। ফলে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে ফার্টিলিটি কাল্ট বা উর্বরতাকেন্দ্রিক ধারণার যোগ পাওয়া যায়। সুমন্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়

দক্ষিণরায় প্রথমে বন-জঙ্গলে যাওয়া মানুষের রক্ষাকর্তা ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত অঞ্চলের জীবন জীবিকার নির্ভরতা জল-জঙ্গলের থেকে সরে গিয়েছে। এর ফলে দক্ষিণরায় নিজের ভূমিকা পরিবর্তন করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এই মতের সমর্থন দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণরায়ের থানে দেখা যায়। দক্ষিণরায়ের এই থানের মধ্যে একটি কালো পাথরকে লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে। সেবায়তের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই পাথরকেই সর্ব প্রথমে লোকায়ত সমাজ পুজো করত। পরে দক্ষিণরায়ের মূর্তি হওয়ার পর মূর্তির পাশেই এই পাথরকে রাখা হয়েছে এবং পুজোও করা হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার যে, এখানে দক্ষিণরায়ের যে মূর্তি আছে তা যোদ্ধার বেশ এবং দক্ষিণরায়ের হাতে বন্দুক আছে। দক্ষিণরায়ের এই বিষয়টি বাংলার অন্যত্র যেখানে দক্ষিণরায়ের মূর্তি আছে তার থেকে ব্যতিক্রমী।

ক্ষেত্রসমীক্ষা৩ (১৮/০৯/১৬)— ক্ষেত্রসমীক্ষার পরবর্তী পর্বে জয়নগর ও দক্ষিণ বারাশতকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন হয়। জয়নগরে লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে সমৃদ্ধ পরিসর। এছাড়া এই অঞ্চলে লোকসংস্কৃতি নিয়ে বহু মানুষ দিনের পর দিন প্রচারের আলো থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত আছেন। জগনগরের সঞ্জয় ঘোষ সেইরকম একজন ব্যক্তি। সঞ্জয়বাবু দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করছেন। জয়নগরের লৌকিক দেবদেবী নিয়ে জানতে সঞ্জয়বাবু প্রভূত সাহায্য করেন। সঞ্চয়বাবুর সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার গাজন গান নিয়ে কথাবার্তা হয়। এই গাজন গানের প্রসঙ্গ আসার কারণ হল, দক্ষিণবঙ্গে গাজন গান সাম্প্রতিক কালে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আর আমাদের সবার জানা যে, গাজন লোকায়ত শিবকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে। ফলে, এই শিবের গাজন ও তাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান আমার গবেষণার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই লোকায়ত শিবের তীর্থগুলি আমায় সঞ্চয়বাবু বলে দেন। আমার আগে থেকেই কিছু ধারণা ছিল যে, শিবের গাজন সাধারণত বড়কাছারিকেন্দ্রিক শিবের থানে হয়ে থাকে। সঞ্চয়বাবুর সঙ্গে কথা বলে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি এমন শিবের থানের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে চৈত্রমাসে চড়ক থেকে শুরু করে শিবের গাজন প্রতিবছর হয়ে থাকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই সব কটি থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সেইসব থানগুলিতেই ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে যে সমস্ত থানের প্রাচীন ইতিহাস বা তাদের উৎপত্তির সঙ্গে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক

ইতিহাস জড়িয়ে আছে। জয়নগর থেকে দক্ষিণ বারাশতের দিকে গেলে এইরকম একটি শিবতীর্থ পড়ে। মূলরাস্তা থেকে কিছুটা দূরেই বিশাল এলাকা জুড়ে ও একটি প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে এই লোকায়ত শিবের থানটি আজও সমানভাবে জাগ্রত। এই থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সুবিধা হয়েছে সঞ্চয়বাবুর মাধ্যমে। এই থানটির পূর্ব দিকে একটি পুকুর আছে এবং এই পুকুরকে নিয়ে নানান ভৌতিক কাহিনি প্রচলিত আছে। সঞ্চয়বাবু এবং মণিশংকর দেবনাথবাবুর থেকে এই থানটি সম্পর্কে বিশদে তথ্য দেন। এই থানটি নিয়ে নানা অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে যার একদিক বাংলার মুসলমান রাজত্বের কথা বলে। আমরা বাংলায় মুসলমান রাজত্বের সময় হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও ধর্মস্থান ধ্বংসের কথাই বেশি করে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলমানদের হাত ধরে হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ইতিহাসকেও অস্বীকার করা যায় না। বারাশতের এই শৈবতীর্থকে নিয়ে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকাতার ইতিহাসকে দেখা যায়। এখানে যে কাহিনিটি প্রচলিত আছে তাতে আলিবর্দী খাঁর উল্লেখ আছে। আমরা জানি যে, বাংলায় আলিবর্দী খাঁয়ের শাসনকাল মোটামুটি ১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত। ফলে কাহিনিতে বাংলার ইতিহাসের এক বিরাট কালপর্বকে ধারণ করছে এবং ধর্ম-সমন্বয়ের ইতিহাস বয়ান করে চলছে। এই শৈবতীর্থকে নিয়ে প্রচলিত কাহিনিটি হল—

> প্রচলিত ধারণা প্রাচীনকালে যখন মন্দির ইত্যাদি কিছুই ছিলও না এই গাছ থেকেই গাজন সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ দিত। একদা বাংলার তৎকালীন নবাব আলিবর্দী খাঁ নিকটের রাস্তা দিয়ে সদলবলে যাবার সময়ে গাজন সন্ন্যাসীদের হৈ চৈ আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে লোক পাঠিয়ে সন্ন্যাসীদের রোমাঞ্চকর ঝাঁপের কথা জানতে পারেন। তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে ঝাঁপের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বর্শার উপর ঝাঁপ দিতে আহ্বান জানান। মূল সন্ন্যাসী বাবা অম্বুলিঙ্গকে স্মরণ করলে বাবা তাঁকে শঙ্খচিলরূপে মাথার উপর দর্শন দিলে তখন ঝাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী ঝাঁপ দিলে বর্শা ভেঙ্গে যায়। সেই থেকে গ্রামের নাম হয় বড়াশী। সেই ঘটনাকে আলিবর্দী কুজরুকি অর্থাৎ অলৌকিক বলে বর্ণনা করেন। ...আলিবর্দীর নির্দেশে সূর্যাস্ত অবধি ঘোঁড়া ছুটে যতদূরত্ব অবধি যেতে পারে সেই ৫৪৫ বিঘা নিষ্কর জমি অম্বুলিঙ্গ শিবের নামে দান করেন।[১৭]

বাংলার লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে এমন অসংখ্য অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে যে কাহিনির গর্ভে ইতিহাসের বিশাল সময়কে ধারণ করছে। এই সমস্ত মৌন ইতিহাসকে পেতে গেলে লোকায়ত সমাজের কাছে যেতে হবে নইলে বাঙালির ইতিহাসের একটি বিশ্বস্ত উপাদান অধরা থেকে যায়।

যাদবপুর থেকে ডায়মন্ড হারবার বা লক্ষ্মীকান্তপুরগামী ট্রেন ধরে দক্ষিণ বারাশত স্টেশনে নামলে শতবারার থান পাওয়া যায়। এই থানটির সম্পর্কে সঞ্চয়বাবু তথ্য দিয়েছেন। দক্ষিণ বারাশত স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মের কাছেই এই থানটি। থানের পাশ দিয়েই বয়ে যেত আদিগঙ্গা। প্ল্যাটফর্মের পাশে পথের দোকানে কয়েকজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে এই থান আলাপচারিতার মাধ্যমে অথ্য সংগ্রহ কর হয়। এই শতবারা থানের সঙ্গে বাংলার মঙ্গলকাব্যের সম্পর্ক যুক্ত হয়ে আছে। এই সমস্ত লোকায়ত মানুষের সঙ্গে কথা বলে জনা যায় যে, চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য যাত্রার সময়ে এখানে রাত্রি যাপন করেন ও তিনি একশত বারা পুজো করেন। সেখান থেকে এই জায়গার নাম হয়েছে বারাশত। স্থানীয় আঞ্চলিক পত্রপত্রিকায় এই আখ্যানকে ধরা আছে—

> রায়মঙ্গল কাব্যে- চাঁদ সওদাগরের বানিজ্যযাত্রার বর্ণনায় জনা যায় জয়নগর হতে কয়েক ক্রোশ উত্তরে চাঁদ রাজা একশত বারামূর্তি পূজা করে পুনঃযাত্রা করেন। জনশ্রুতি এরপর হতে এই স্থানের নাম হয় ‘বারাশত’। এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানটি আজো চিহ্নিত হয়েছে দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য্য উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে।[১৮]

ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে দেখা গিয়েছে যে, বর্তমানে থানটির অবস্থা খুব ভালো অবস্থায় নেই।

ক্ষেত্রসমীক্ষা৪ (২৮.০৯.২০১৬)— সুন্দরবন অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় ঘোষ এই ক্ষেত্রসমীক্ষায় বিশষভাবে সাহায় করেন। এই পর্বে সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে দেখা করার মূল কারণ গবেষণার অঞ্চলকে বিশদভাবে পরিচয় লাভ করা এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা উচিত সেই সম্পর্কে বিশদে জ্ঞান লাভ করা। ক্ষেত্রসমীক্ষার একটি মৌলিক শর্ত হল সেই বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা। সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে পরামর্শের ফলে আদি গঙ্গার দুই পাড়ের অঞ্চলে কীভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষা করলে তা খুব সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন হবে তার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষার ধরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে উদাহরণ দেওয়ার জন্য সঞ্জয়বাবু জয়নগরের কয়েকটি বিখ্যাত থানে নিয়ে যান। প্রথমেই পালপাড়ার পঞ্চানন্দের থানে যাওয়া হয়। পাল পাড়ায় পঞ্চানন্দের থান নিয়ে কৈলাস দাসের সঙ্গে কথা হয়। একটি বিশাল তেঁতুল গাছের নীচে পঞ্চানন্দের মূর্তি উন্মুক্ত অবস্থায় আছে। ওই পঞ্চানন্দ গ্রাম দেবতা হিসেবই দীর্ঘদিন ধরে পূজিত হয়ে আসছেন। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে কেন বিশেষজ্ঞ দরকার হয় পাল পাড়ায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে তার সম্যক ধারণা হয়। সঞ্জয়বাবু বুঝিয়ে দেন ওই দুই দেবতা পঞ্চানন্দের সহচর পেঁচো-খেঁচোর স্বরূপ। ফলত এখানেই ক্ষেত্রে

বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা টের পাওয়া যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ থাকলে আরেকটি বিষয় খুবই সুবিধা হয়, তা হল, লোকায়ত মানুষের কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তাতে আবেগ বা মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস মিশে থাকার কারণেই তা মাঝে মাঝে সত্যের অপলাপ হয়ে পড়ে। কোনো বিশেষজ্ঞ থাকলে সেই তথ্য বা তত্ত্ব তাৎক্ষনিক যাচাই করা যায়। এরপর জয়নগরের কয়াল পাড়ায় শীতলার থানে যাওয়া হয়। জয়নগরের সব থান নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয় আর বাস্তবে তা সম্ভবও নয়। সঞ্জয়বাবু এক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সঞ্জয়বাবুর থেকে এই নির্বাচনের রাজনীতি বঝা যায়। তিনি কোনো এলাকার প্রতিনিধি স্থানীয় বা যে দেবদেবী বেশি জাগ্রত সেখানে বেশি করে নজর দিতে বলেন। এই নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি অবশ্য এ কথাও মনে করিয়ে দেন যে, কোনো দেব-দেবী সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় বা অর্থনীতির নিরিখে প্রান্তিক হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু সেই দেব-দেবীর সঙ্গে বাংলরা ধর্মীয়, সামাজিক ও ইতিহাসের বড় উপাদান যুক্ত হয়ে আছে। তবে বর্তমান *‘কালচারাল হেজিমনি’*র জন্য সেই দেবদেবী আজ গুরুত্ব হারিয়েছে। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে তিনি খনিয়াতে গাজী বাবার থানকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। গবেষণায় জয়নগর একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। কেননা জয়নগর সাহিত্য-সংস্কৃতিতে খুবই সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই জয়নগরকে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক এগোন দরকার। এক্ষেত্রে আদিগঙ্গাকে মাঝখানে রেখে গঙ্গার পূর্ব-পশ্চিম পাড়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য থানের বিষয়ে জানতে চেষ্টা করা হয়। জয়নগর-মজিলপুরের যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে তার পাশ দিয়ে আদিগঙ্গার মজে যাওয়া ধারা বয়ে গেছে। ঠিক তার পাশেই আছে রক্তাখাঁ পাড়া। এই পাড়ার নামই হয়েছে রক্তাখাঁ গাজীর নাম অনুসারে। এই থান সম্পর্কে বহু মৌখিক কাহিনি প্রচলিত আছে। এই থানের হদিস দেন সঞ্জয়বাবু। মজে যাওয়া আদিগঙ্গার পাড়ে একটি থান। থানে কোনো মূর্তি নেই। থানের ভিতরে সমতল থেকে বেশ খানিক নীচুতে একটি গর্ত আছে। আর সেখানেই রক্তাখাঁ গাজীর অবস্থান বলে সবার বিশ্বাস। এখানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে একটি সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এখানকার অনেক মানুষ এই থানকে বাবা পঞ্চানন্দের থান বলে মনে করেন। এখানেই বাংলার হিন্দু-মুসলিমের ধর্মকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের প্রসঙ্গ মনে করায়। এই বিষয়ে জানার জন্য বংশপরম্পরায় সেবায়ত অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৮৭) কাছে জানতে তাঁর বাড়িতে যাওয়া হয়। প্রায় মৃত্যু শয্যায় অসিতবাবু এই

থানের উৎপত্তি ও এই থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কাহিনি বলেন। এই থানকে তিনি পঞ্চানন্দের থান বলেই মনে করেন। কিন্তু আবার তিনি উল্লেখ করেন এখানে পূজারি হিসেবে ফকির আসতেন। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, হিন্দু ধর্মের আধিপত্যের জন্য এই মুসলমান দেবতা আজকে তার ধর্মীয় অবস্থানটি হারিয়ে ফেলেছেন। এই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে, এই থানের পাশেই আদিগঙ্গার পাড়ে শিবলিঙ্গের অবস্থান ও মানুষের মনে তার প্রভাব। এই প্রভাব যে গাজীর উপর কাজ করেছে তার ইতিহাস আমরা এখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা যায়। এই রক্তাখাঁ গাজীর থানের একটু উত্তরে গেলেই দেখা যায়, আদিগঙ্গার পাড় বরাবর শিব মন্দিরের আধিক্য। আর এই শিবের প্রভাব যে রক্তাখাঁর উপর পড়েছে তা বলা বাহুল্য। রক্তাখাঁ পাড়ার থেকে একটু উত্তরে, আদিগঙ্গাকে ডান দিকে রেখে এগিয়ে গেলেই জয়চণ্ডীর বিশাল থান। বর্তমানে এই থানটি তার আদি স্বরূপ হারিয়ে মন্দিরে পর্যবসিত হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে জানা গিয়েছে এই জয়চন্ডী হল জয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আর এই দেবীর নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম হয়েছে জয়নগর। যে কোন ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গেলে সমীক্ষকের কাছে কিছু সূচক প্রশ্ন থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রথম জানার বিষয় ছিল কীভাবে লৌকিক দেবদেবীর থানটি তৈরি হল, বা উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিসর কার্যকরী হয়েছিল কি না। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই সমীক্ষায় কোনো ব্যক্তিগতভাবে বা পারিবারিকভাবে পূজিত দেবদেবীকে আলোচনার মধ্যে রাখা হয়নি। মূলত গ্রাম্য, আঞ্চলিক দেবদেবীকেই আলোচনার ক্ষেত্রে হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সঞ্জয়বাবুর থেকে জয়চন্ডী থানের সংবাদ পাওয়া যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় একটি সুবিধা হয় যদি সেই দেবদেবীকে নিয়ে কোনো লিখিত তথ্য থাকে। জয়চণ্ডীর উৎপত্তি ও তাকে কেন্দ্র করে কাহিনিগুলি এখানকার মানুষ লিখিত আকারে রেখে দিয়েছেন। গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষা থাকলে যে কোনো গবেষক চাইবে ক্ষেত্র থেকে একেবারে আনকোরা তথ্য পেতে আর তথ্য যদি লিখিত রূপ পায় তাহলে তা আর আনকোরা বা জীবন্ত হিসেবে ধার্য করা যায় না। লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনে যে সমস্ত পত্রিকা ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে পাওয়া গিয়েছে তা কোথাও মনে হয়েছে চাপিয়ে দেওয়া বা জোর করে মহিমা কীর্তন করা। আসলে এখানে দেবীর প্রচারের মধ্যে দিয়ে অর্থনীতির একটি দিক আমরা দেখতে পাই। এক্ষেত্রে গবেষকের বা ক্ষেত্রসমীক্ষকের উচিৎ লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে প্রচলিত মৌখিক সাহিত্য

পাঠ করা। এই পাঠের ফলে আমরা একটি সঠিক তথ্য পেতে পারি। এই জয়চণ্ডীর ক্ষেত্রেও একইভাবে অগ্রসর হওয়া গিয়েছে। আমরা জেনেছি যে জয়নগরের নামকরণ ও এই এলাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন জয়চণ্ডী। এর ফলে এই দেবীর সঙ্গে জয়নগরের নানা ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সম্পূর্ণ বিষয়টিকে একদিনের ক্ষেত্রসমীক্ষায় বুঝতে পারা সম্ভব নয়। এই দেবীর উৎপত্তি ও জয়নগরের সঙ্গে তার সম্পর্কের খতিয়ান বুঝতে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছে, এবং নানা জনের সঙ্গে কথা বলে একটি স্পষ্ট ধারণায় আসা গিয়েছে। এখানকার মানুষ দেবী জয়চণ্ডীকেই এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে করেন। এই বিষয়ে যে আখ্যানটি প্রচলিত আছে—

> আজ থেকে প্রায় চার শতাধিক বৎসর পূর্বে (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) রাজা নন্দকিশোর মতিলালের বংশধর গুনানন্দ মতিলাল যশোর জেলার বিক্রমপুর থেকে সপরিবারে বজরায় মাঝি-মল্লা, লোক-লস্কর নিয়ে সাগর সঙ্গমে পুণ্যস্নান হেতু যাত্রা করেন। স্নান সমাপনে গাভীরথীর প্রাচীন পথ ধরে স্বদেশে প্রত্যাগমন পথে এক সায়াহ্নে বিশ্রাম ও রাত্রি যাপনের জন্য নদীর পশ্চিম তীরে বজরা নোঙর করে। ...হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটি সুশ্রী বালিকাকে জলপূর্ণ কলসি নিয়ে যেতে দেখেন। বিস্মিত গুনানন্দ কিছুদূর অনুসরণ করেন বালিকাটিকে সন্ধ্যা সমাগমে তিনি আর তাকে দেখতে পেলেন না। ... সেদিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, সেই বালিকাটি তাঁকে বলছেন- আমি দেবী জয়চণ্ডী, এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অরণ্য মধ্যস্থ বকুল বৃক্ষের তল থেকে তুই আমাকে উদ্ধার করে এখানে প্রতিষ্ঠা কর এবং বসবাস শুরু কর।[১৯]

এই রাজারা পরে এই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে ও সেখান থেকেই এই জায়গার নাম জয়নগর হয়। জয়নগরের এই দেবীকে নিয়ে অজস্র আখ্যান প্রচলিত আছে। এই আখ্যানের মধ্যে জয়নগরের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নামকরণের ইতিহাস যুক্ত আছে। এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় আমরা বিভিন্ন লেখা পাই। নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্রে আমরা এই দেবী ও তার সঙ্গে জয়নগরের পত্তনের ইতিহসকে আখ্যানের মধ্যে পাই—

> দেবী জয়চণ্ডীর নামে সেই নগরীর নাম হয় জয়নগর।[২০]

পরের দিন সকাল ছ'টায় জয়নগরের পূর্ব দিকে ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চল নির্বাচন করা হয়। প্রথমেই সঞ্জয়বাবুর কাছ থেকে জয়নগরের পূর্ব দিকে কোনো কোনো লৌকিক দেবদেবী আছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে জয়নগর স্টেশনের কাছেই প্রাচীন দেবী ধন্বন্তরি মায়ের মন্দিরে যাওয়া হয়। বিরাট চাতালযুক্ত আদি গঙ্গার পাড়েই এই দেবীর মন্দির। এখানে প্রথম প্রশ্ন ছিল, এই লৌকিক দেবী কীভাবে মাটির থান থেকে পাকা ছাদযুক্ত মন্দিরে উন্নীত হলেন এবং দেবীর এই নাম

কেন? এই মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই দেবী যেহেতু বহুদিন ধরে নানা মানুষের কাছে পূজিত হয়ে আসছেন ফলে এই দেবীকে কেন্দ্র করে বহু কাহিনি প্রচলিত আছে। জয়নগর, বারুইপুর প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এলাকায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে একটা সমস্যায় ক্ষেত্রসমীক্ষককে পড়তেই হয়। এই সমস্যাটি হল, এই এলাকার প্রায় সমস্ত মানুষ চাকুরীজীবী, এই সমস্ত বিষয়ে তাদের জ্ঞান আছে। সেক্ষেত্রে কোনো তথ্য পেতে গেলে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। যেখানে মানুষ কথা বলতে চাইবে না বা সমীক্ষককে মতলবী ভেবে দূরে চলে যাবে। এই সমস্যার মধ্যে পড়লে সমীক্ষকের প্রাথমিক কাজ হল খুব যত্ন সহকারে তথ্য দাতাকে বুঝিয়ে তথ্য নেওয়া। এই ধন্বন্তরি দেবীর সম্পর্কে এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ধন্বন্তরি দেবীর মন্দির থেকে একটু পূর্বদিকে জয়নগর স্টেশন রোড ধরে বেশ খানিক বাইকে করে গেলেই মনসার থান। কোনোমতে পাকা অর্থাৎ উপরে টালির ছাউনি ও একটি ইটের গাঁথুনি যুক্ত থান। কিন্তু এই মনসার থানটিকে নির্বাচন করার কারণ অন্য ছিল। পূজারির সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, শ্রাবণ মাসের মনসা পুজোর সময় এখানে যে আচার পালিত হয় তাতে আদিম সংস্কৃতির নানা উপাদান বা সাক্ষ্য বহন করে। পূজারী আরোও বলেন যে, দশহারা পুজোর সময়ে লোকায়ত মানুষ নিজের বুক চিরে রক্ত একটি পাকা কলায় দেয়। এই রক্তযুক্ত কলাকে মানুষ প্রসাদ হিসেবে খায়। এই তথ্য এই গবেষণার একটি নতুন দিক নির্দেশ করে যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নানা কিছু বদলালেও তার মূল আচার-অনুষ্ঠান বদলায় না। এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে মানুষ তার ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল। এইসময়ে সঞ্চয়বাবুর সঙ্গে জয়নগর ছাড়া আরও বেশ কিছু এলাকায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খাড়ি অঞ্চল ও সাহাজাদপুরের পঞ্চানন্দের থান। এইপর্বে সঞ্চয়বাবুর বাড়িতে সকালে গিয়ে সারাদিনের ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চল ঠিক করে নেওয়া হত। এই দুটি জায়গার ক্ষেত্রে সঞ্চয়বাবু সঙ্গে গিয়েছিলেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে, সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে এই দুটি এলাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ অঞ্চল। এই খাঁড়ি অঞ্চলে রায়মঙ্গল কাব্যে উল্লেখিত নারায়ণী ও বড়খাঁ গাজির এলাকা দখল নিয়ে যুদ্ধ হয়েছিল। এই খাঁড়ির একেবারে পূর্বপ্রান্তে বহুপ্রাচীন একটি বনবিবির থান। একেবারে নিম্নবিত্ত, লোকায়ত সমাজে এই থান আজও সমানভাবে পূজিত। এই খাঁড়ি অঞ্চলের

ওপর দিয়ে গঙ্গার একটি প্রবাহ বিদ্যাধরীতে মিশেছে বলে কথিত আছে। এই থানের উৎপত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার মুসলিম ধর্মের কাহিনি। কিন্তু এখানে মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, এই দেবী বর্তমানে তার ধর্মের খোলস হারিয়ে জাগ্রত ও পূজিত হয় মূলত জীবিকার জন্য। এখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, বনবিবির সঙ্গে নারায়ণীর যুদ্ধের প্রসঙ্গ। এখানে বনবিবি প্রথম পর্বে ধর্মের নিরিখেই পূজিত হতেন। কিন্তু এই অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ যেহেতু জীবন জীবিকার জন্য গভীর সমুদ্রে যায়, তাই এদের দেবী বা রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে বনবিবিকেই এরা মান্য করে। এখানে বনবিবির ধর্মের খোলস পড়ে গিয়ে দৈবী মহিমায় বিরাজ করছেন। এই খাঁড়ি অঞ্চলে বনবিবির থানের পাশেই একটি পরিত্যক্ত সিমেন্টের বড়খাঁ গাজির থান। এই থান যত্নের অভাবে ও নিত্যপুজোর অভাবে আজকের সময়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান হয়েছে। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে। থানের পাশেই দেখা যায়, কতগুলি মুসলিম পরিবারের অর্থনৈতিক দূরাবস্থার মধ্য দিয়ে বসবাস করছে। এইসমস্ত দরিদ্র মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলে জনা যায়, এরা এই বড়খাঁ গাজী সম্পর্কে উদাসীন। আসলে যেমন করে সাতবিবি, বনবিবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিন্দুদের দেবী হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবেই এই সমস্ত গাজী-পীরদের একই রেখায় রাখা যায়। এরপর খনিয়া ও শাহাজাদপুরে বিকেল নাগাদ ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়া হয়। বাংলার মুসলমান রাজত্বকালের অনেক ধর্মীয় ইতিহাসের সাক্ষী এই খনিয়ার শাহাজাদপুর। এখানে মুকুটরাজার দিঘি আছে এবং এর পাশেই দুটি তালগাছের নীচে কালুগাজী ও চম্পাবিবির থান। শাহাজাদপুরে মুকুটরাজার দিঘিতে এসে পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে যায়। এই সময় একজন ভদ্রমহিলা স্নান করে ওই থানে পুজো দিচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে এই থান সম্পর্কে এই নিত্য পূজারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর এই থানের বিশদ বিবরণ জানার জন্য বিষ্ণুপদ নস্কর(৯০)-এর বাড়ি যাওয়া হয়। বিষ্ণুবাবুর থেকে এই থানের উৎপত্তির ইতিহাস ও থানের কাছে বহু পুরোনো দুটি তালগাছের সঙ্গে সম্পর্ক কি, তার ইতিহাস জানা হয়। যেহেতু সঞ্চয়বাবুর সঙ্গে কথা বলে ওই দিনের ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চল ঠিক করে রাখা হয়েছিল, ফলে মুকুটরাজার দিঘিও তার পাশে গাজীকালু ও চম্পাবিবির থান সম্পর্কে জেনে শাহাজাদপুরের দক্ষিণ বিজয়নগর গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য যাওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রামসাতালের পুকুর যা আসলে হবে রাম সাঁওতালের পুকুর। এই পুকুরের পাড়েই নারায়ণীর একটি ছোট থান। রাঁচি,

ঝাড়খণ্ড থেকে প্রচুর আদিবাসী মানুষ যে এই সমস্ত অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এই রাম সাঁওতালের পুকুর ও তার পাড়ে নারায়ণীর বারামূর্তি সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। এই পুকুরের বর্তমান মালিক ঋষিকুমার সর্দ্দারের সঙ্গে কথা বলে পুকুর ও নারায়ণীর থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার একটি বড় অংশ জুড়ে আছে লোকায়ত মানুষের মনে পরিবেশ ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা কেমন তার খোঁজ করা। এরফলে এই পুকুর বা বড়গাছের নীচে অবস্থিত লৌকিক দেবদেবীর থান থাকলে, আমার ক্ষেত্রসমীক্ষায় তা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ঋষিকুমার সর্দ্দারের(৮৩) সঙ্গে ওই পুকুরপাড়ে বসে দীর্ঘ আলাপ চারিতার মাধ্যমে নারায়ণীর থানের সঙ্গে ওই পুকুরের সম্পর্কের স্বরপ সন্ধান করা জানা যায়। এছাড়ে ওই পুকুর ও থানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রচলিত কাহিনিগুলি সংগ্রহ করা হয়; এরপর শাহাজাদপুর থেকে পশ্চিমে কিছুক্ষণ বাইককে এগোলেই খনিয়া গ্রাম পড়ে। এই খনিয়া অঞ্চলটির নামকরণ হয়েছে খুন-খারাপি থেকে। নিরঞ্জন বৈদ্য (৮৪) বাবুর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, একসময় এই অঞ্চলে ডাকাতদের উপদ্রব ছিল। আর সেই জন্য এখানে খুন লেগেই থাকত। আদিগঙ্গার এই অঞ্চলে একসময় জল-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। আর এখানকার বেশ কিছু মানুষ জলদস্যু ও ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই খনিয়ার বৈদ্যপাড়ায় দক্ষিণরায়ের থান এক বিশেষ কারণে বিখ্যাত। এই থানে দক্ষিণরায়ের হাতে বন্দুক আছে। আমরা নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে কথা বলে এই অঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব ও দক্ষিণরায়ের হাতে বন্দুক, এই দুইয়ের কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুরের ধপধপিতে দক্ষিণরায়ের হাতে বন্দুক দেখা যায়। স্বাভাবিক কারণেই এই থানের গুরুত্ব অন্য মাত্রা দেয়। এই ক্ষেত্রসমীক্ষায় বাইক থাকার কারণে প্রত্যন্ত গ্রামে ও দূরে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে অসুবিধে হয়নি। শাহাজাদপুর ও খনিয়া থেকে সরাসরিই দক্ষিণ বারাসতের গাজীসাহেব তলায় আসা হয়। দক্ষিণ বারাসতের পোস্ট অফিসের পাশেই একটি মাঠের ধারে গাজীবাবার এই থানটি আছে। এই থানকে নির্বাচন করার কারণ হল, এই থানের পাশেই একটি বিরাট প্রাচীন তেঁতুল গাছ আছে, এবং এই তেঁতুল গাছকেও এখানকার স্থানীয় মানুষ পুজো করে। আর একটি কারণে এই গাজীবাবার থান বিখ্যাত, এখানে যে তেঁতুলগাছটি আছে তাতে এখনও শিকলের দাগ স্পষ্ট। শঙ্কর অধিকারীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, আগে যখন আদিগঙ্গা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত ও আজকে মজে যাওয়া নদীর পাড়ের গাছে তাদের জাহাজ বেঁধে রাখত।

জাহাজে রাত্রিযাপনের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মানুষরা তাদের দেবতাদের পুজো করত, সেখান থেকেই নানা দেবদেবী এই সমস্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা পায়। এই গাজী বাবার থান বা মাজার ও তার পাশে তেঁতুল গাছটি সেই সময়কার ইতিহাস বহন করে চলেছে। এরপর রাতে থাকার জন্য জয়নগরের পৌরসভার গেস্টহাউসে ফিরে আসা হয়। পরেরদিন এই জয়নগরের হাটপাড়ায় বনবিবির থানে যাওয়া হয়। এই থানের পূজারি প্রমীলা সর্দার(৭০)-এর সঙ্গে কথা বলে কেন এই থানে বনবিবির বাহন মোরগ তার ইতিহাস জানা যায়। এছাড়া বাগদীদের দ্বারা পূজিত এই বাহন রহস্য জানার জন্য এই থানে যাওয়া। সুন্দরবন অঞ্চলে এই মোরগের ওপর বনবিবির অবস্থান খুব একটা দেখা যায় না। এই কারণেই বাগদী সম্প্রদায়ের দ্বারা পূজিত এই দেবী গবেষণায় বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। এই প্রসঙ্গেই বলা যায় যে, লোকসংস্কৃতির গবেষণায় লাইব্রেরী থেকে পাওয়া তথ্য আর সরাসরি ক্ষেত্র থেকে পাওয়া তথ্য এই দু'ইয়ের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। ক্ষেত্র থেকে যে তথ্য আমরা পাই তা সবসময় আমাদের কাছে আলোচনার নতুন দিক খুলে দেয়। এরপরে জয়নগরের তুলসীঘাটায় পাঁচুগোপালের থান আলচনার দাবী রাখে । এই থান সম্পর্কে জানতে সুবল চন্দ্র নাইয়া (৬৫) মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলা হয়। লোকায়ত সমাজে পাঁচুগোপাল শিশুদের নানা রোগ থেকে রক্ষা করে এবং এই দেবতার সঙ্গে উর্বরতার প্রসঙ্গ আছে। এই থানকে নিয়ে লোকায়ত সমাজের সঙ্গে কথা বলে নানা বিশয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সঞ্চয়বাবুর মতো সুন্দরবনের লোকদেবতা ও নৃ-তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ হলেন দেবীশঙ্কর মিদ্যা। সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চলে দিনের পর দিন ক্ষেত্রসমীক্ষা করে বিভিন্ন চমকপ্রদ তথ্য তিনি হাজির করেছেন। সঞ্চয়বাবুর পরামর্শ অনুযায়ী দেবীশঙ্কর বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়। দেবীশঙ্করবাবুর কাছ থেকে লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকার সন্ধান পেতে সুবিধা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় যখন এই সমস্ত মানুষদের কাছে তথ্যের জন্য যাওয়া হয়, এই সুন্দরবন অঞ্চলের নদী-মাঠ ও নানা পরিসরে গবেষণারত ব্যক্তিরা সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। দেবীশঙ্কর মিদ্যার সঙ্গে মাইবিবির থানে যাওয়া হয়। এই থানটির নাম কীভাবে হয়েছে তার প্রাথমিক পরিচয় দেবীশঙ্করবাবুর থেকে পাওয়া যায়। এই জায়গাটির নাম হল বিবিমার হাট এবং এই হাটের নামকরণ হয়েছে বিবিমায়ের নামে। এই হাট ও বিবিমা সম্পর্কে আমায় বিস্তারিত জানান, হাটের পাশেই স্কুল শিক্ষক মহাশয় এবং

হাটের ব্যবসায়ীরা। হাটের মাঝখানে প্রাচীন বটগাছের নীচে থানটি অবস্থিত। স্কুল শিক্ষক এবং হাটের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা যায় এই দেবী আসলে ওলাবিবি। এই দেবীর মাহাত্ম্যে বা কৃপায় এই বাজার এলাকার উন্নতি হয়েছে তাই দেবীকে এই সমস্ত লোকায়ত মানুষ মায়ের সঙ্গে একীভূত করে মাইবিবি বলে সম্বোধন করে। ওলাবিবির এমন বড় মূর্তি দক্ষিণবঙ্গে সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না। এখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে একটি বিষয় জানা যায়, মুসলমানের দেবী হওয়া সত্ত্বেও এই দেবীর পূজা ও আচার সমস্ত কিছু হিন্দুমতে হয়ে থাকে। এই লৌকিক দেবীর থান আগে মুসলমান ও ফকিরদের হাতেই ছিল, পরবর্তী সময়ে এই দেবী হিন্দুদের দেবী হয়ে যায়। এখানে বাংলার সামাজিক-ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায়।

ক্ষেত্রসমীক্ষার শেষ দিকে রায়দিঘিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়া হয়। রায়দিঘি যদিও সেই ভাবে আদিগঙ্গার মধ্যে পড়ে না, কিন্তু গবেষণা জিজ্ঞাসার মধ্যে যেহেতু লোকায়ত বা লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জনসমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিসরকে বিশদে বুঝতে চাওয়ার চেষ্টা আছে, তাই রায়দিঘিকে এই গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন খুবই জরুরি ছিল। এছাড়া রায়দিঘি প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য। রায়দিঘির বাংলার অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে জটার দেউল। এই জটার দেউল নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে লোকায়ত সমাজ ও গবেষকদের মধ্যে। এই গবেষণার সঙ্গে সরাসরি জটার দেউল পড়ে না বলে এই প্রাচীন শিবের মন্দির নিয়ে যে বই আছে তা সংগ্রহ করা হয় এবং এলাকার কিছু স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিয়ে চলে আসা হয়। জটার দেউল-এর ইতিবৃত্ত নামে বইটি অর্ঘ্যচন্দন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদনা করেন। এই বইয়ের থেকে এই দেউলটি কবে নির্মাণ লাভ করেছে তার ইতিহাস জানতে পারা যায়। এছাড়া বাংলার মন্দির শিল্প সম্পর্কে এই বই থেকে কিছু তথ্য জানতে পারা যায়। এই মন্দিরের আবিষ্কারের পটভূমি এই গবেষনায় থান আবিষ্কারের কাহিনির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক যুক্ত। দক্ষিণবঙ্গের থানের ইতিহাস বা থান তৈরি সম্পর্কে বলেছি যে, অনেক থান জঙ্গলকাটির সময়কার। জটার দেউল আবিষ্কারের কাহিনি সূত্রটি একই—

> ইংরেজ আমলে সুন্দরবনের মনি নদীর তীরবর্তী গভীর অরণ্য আচ্ছাদিত এই অঞ্চলের লট নম্বর নির্ধারিত হয়েছিল ১১৬। দূর্গাপ্রসাদ চৌধুরি এবং দিগম্বর মিত্র এই লট নম্বরের ভূস্বামী হন। তাঁদের মদতে আনুমানিক ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এখানকার বনভূমি হাসিল করে আবাদি পত্তন শুরু হয়। সেই সময় ময়ূরভঞ্জ থেকে আগত ২০ জন মুণ্ডা এই বনভূমি হাসিল করার দায়িত্ব পান। ...বন হাসিল

করতে করতে বনভূমির মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে অপূর্ব সুন্দর রেখ শৈলীর দেউলটি। কেউ বলে জটাজুটধারী শিব, কেউ বলে জটাজুট বাঘের উপস্থিতির জন্য নাম হয় জটার দেউল।[২১]

ইংরেজ আমলে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই রকম লৌকিক দেবদেবীর থান আবিষ্কারের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই থান আবিষ্কারের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ধর্মীয় পরিসরের নানা দিক ধরা দেয়। বাংলার নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে এক সময়ে মন্দির শিল্পে যে প্রসিদ্ধ ছিল জটার দেউল আজও সেই ইতিহাসকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

রায়দিঘিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে যাওয়ার বড় কারণ হল, বনবিবি ও নারায়ণী বা দক্ষিণরায় নিয়ে যে ধর্মসমন্বয়ের কথা বলা হয় তার স্বরূপ জানাতে। ধর্ম-সমন্বয়ের যে প্রচলিত ধারনা তার থেকে লোকায়ত সমাজের চিত্র বেশ খানিক ভিন্ন। এলাকার জীবন জীবিকার ওপর ভিত্তি করে কোনো জায়গার বনবিবি আবার কোনো জায়গার নারায়ণীর প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমজটার আদিবাসী (মূলত মুন্ডা, ওঁরাও) অধ্যুষিত একটি গ্রামে লোকমুখে কুকুরঝাটি থানের সন্ধান পাওয়া যায়। থানটির নাম এমনই চমকপ্রদ যে, থানটির সম্পর্কে বিশদে জানা প্রয়োনীয় হয়ে পড়ে। থানটিতে গিয়ে দেখা যায় যে, এই থানটির নাম হয়েছে ওই থানে একটি গাছ থেকে। আদতে থানটি হল বনবিবি ও নারায়ণীর। দক্ষিণে আদিগন্ত মাঠ, পূর্বদিকে একটি পুকুর ও পশ্চিমদিকে কয়েকটি আদিবাসী ঘর। আদিবাসীরা এই দুই দেবীর পুজো করে থাকে। এই থানে কোনো মূর্তি নেই। গাছের নীচেই রোদ, ঝড়, বৃষ্টি সহ্য করে এই দুই অরণ্যদেবী নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল এই থানের মূল দেবী হলেন নারায়ণী। থানে বনবিবির অবস্থান ও নারায়ণীর অবস্থানের মধ্যে প্রভেদ আছে। নারায়ণী ভেবে যে মাটির ঢিবি এরা পুজো দিয়ে থাকে তার অবস্থান বনবিবির থেকে উপরে। ফলে এলাকার ওপর নির্ভর করে যে দেবদেবীর প্রাধান্য নির্ভর করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আদিবাসী সমাজে বৃক্ষ যে একটি বড় ভূমিকা পালন করে এবং আদিবাসী সমাজে বৃক্ষনির্ভরতার কথা আমাদের সবার জানা। এই থানেও সেই বৃক্ষনির্ভরতার ছবি ধরা পড়ে। এরা বৃক্ষকে কেবল পুজোই করে না, এই বৃক্ষকে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা করে। এখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই থানকে ঘিরে এই আদিবাসী সমাজ যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে তার মধ্যে আদিম, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের নানা ঐতিহ্য-সংস্কার মিশে থাকে। এখানকার লোকায়ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এদের আদি বাসভূমি পুরুলিয়া ও ঝাড়খণ্ড। এই সমস্ত জনজাতি

এখানকার জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তোলে। কিন্তু বসতভূমি বদলালেও এদের ঐতিহ্যগত সংস্কার ও নানা পরম্পরাকে ভুলে যায়নি। পশ্চিমজটার এই কুকুরঝাটি থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে সঙ্গে পরিচয় হয় গোষ্ঠবিহারী হালদাদের সঙ্গে। গোষ্ঠবাবু এইপর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেন। এই রায়দিঘির ইতিহাস ও এই অঞ্চলের বিখ্যাত লৌকিক দেবদেবীর থানের সন্ধান গোষ্ঠবাবুর থেকে পাওয়া যায়। বাইকে যেতে যেতে তিনি রায়দিঘির বিভিন্ন লৌকিক দেবতা সম্পর্কে বহু তথ্য তুলে ধরেন। গোষ্ঠবাবু প্রথমে আটেশ্বরের থানে নিয়ে যান। আটেশ্বরের থানটি পশ্চিমজটার কুকুরঝাটির থান থেকে রায়দিঘির দিকে আসতে হয়। এছাড়া কিছুটা গ্রাম্য মেঠো পথ দিয়ে আসার পর আটেশ্বরের থান পাওয়া যায়। মাটির থানে গদা হাতে আটেশ্বরের মূর্তি নিয়ে এই থান। এই থান ও তার চারপাশ দেখে এই এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার কথা অনুমান করা যায়। থানটি একেবারেই নদীর কাছে। গোষ্ঠবাবুর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, এই নদী বর্ষার সময় ভেঙে যাওয়ার অবস্থা হলে আটেশ্বর গদা নিয়ে বাঁধ সারাতে যান বা নদী বাঁধ পাহারা দেন। এই যে লৌকিক দেবদেবীর গ্রাম পাহারা দেওয়া ও গ্রামের পরিবেশ রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া, এই সমস্ত অজস্র কাহিনি লোকায়ত সমাজে প্রচলিত আছে। এরপর গোষ্ঠবাবুর সঙ্গে বিশালাক্ষীর থানে যাওয়া হয়। এই থানটি রায়দিঘির যে মূল রাস্তা তার পাশেই। এরপর ছাওয়াল পীরের থান পড়ে। ছাওয়াল পীরের থানটি পশ্চিমজটার থেকে পশ্চিমে যেতে হয়। বাইক নিয়ে ইঁটের রাস্তা ধরে একেবারে গ্রামের প্রান্ত সীমানায় এই থানটি অবস্থিত। একটি প্রাচীন লতানো গাছের নীচে কয়েকটি পাথরকে ছাওয়াল পীর হিসেবে পুজো করা হয়। বহু প্রাচীন এই লতানো গাছটি শক্ত হয়ে গিয়েছে এবং সেই গাছে একটি দোলনা টাঙানো আছে। দুপুর নাগাদ এই থানে উপস্থিত হলে দেখা যায় এই সময়ে দোলায় একটি ৩-৪ বছরের বাচ্চা দোল খাচ্ছে। এবং থানে এই বাচ্চার মা পুজো দিচ্ছিল। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা উচিত যে এই থানের সংবাদ গোষ্ঠবাবু থেকে পাওয়া যায়। এই থান সম্পর্কে বিশদে জানতে চাইলে ওই মহিলা একজনকে ডেকে আনেন। এই থানের পুজো কমিটির প্রধান এসে জানান যে, এই থানটি হল জঙ্গলকাটির সময়কার। ছাওয়াল পীর নাম হয়েছে তার কারণ, যে সমস্ত বিবাহিত মেয়েদের সন্তান হয় না এই লৌকিক দেবতার কাছে মানত করলে তার সন্তান হয়। ‘ছাওয়াল’ হল বাংলার একটি প্রচলিত লৌকিক বা আঞ্চলিক শব্দ। এরপর এই থানে যে মহিলা নিত্য পুজারী বহু তথ্য জানান। তিনি জানান যে, এই লৌকিক দেবতা রাতে কথা

বলেন ওই বিধবার সঙ্গে এবং নানা অভিযোগ করেন শিশুর রূপ ধরে। এই গ্রাম-দেবতাকে নিয়ে নানা ধরনের উর্বরতাকেন্দ্রিক আখ্যান প্রচলিত আছে। এর সঙ্গে হিন্দু মুসলমানকে কেন্দ্র করে নানা সংঘাত ও সমন্বয়ের কাহিনি প্রচলিত আছে। এছাড়া আরও জানা যায় এই গ্রাম-দেবতাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান হয় তার ধরন-ধারণ। রায়দিঘিতে একটি থান নামকরণের জন্য সবার কাছে খুবই পরিচিত। এই লৌকিক দেবীর নাম বুড়িমা। এই দেবী আসলে বিশালাক্ষী দেবী। একেবারেই নদীর ধারে এই দেবীর টালিযুক্ত থান। রায়দীঘির দক্ষিণ জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে এই দেবীর থানটি বহু বংশ পরম্পরায় পূজিত হয়ে আসছে। দেবীর এই নামকরণ নিয়ে একটি চমকপ্রদ কাহিনি প্রচলিত আছে। সঞ্চয় ঘরামী ও জয়কৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে দেবীর এই নামকরণের ইতিহাস জানা যায় । এছাড়া এই দেবীকে নিয়ে বহু অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে। বাংলার বহু পরিচিত একটি আখ্যান বা বিষয় হল, দেবদেবীর নৌকায় করে যাতায়াত করা। এই বুড়িমাকে নিয়েও এমন আখ্যান প্রচলিত আছে যা বাংলার মৌখিক সাহিত্যের ধারাকে জীবন্ত রাখে এই প্রক্রিয়ায়।

ক্ষেত্রসমীক্ষা৫ (০৩.১০.১৬)— আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, আদিগঙ্গা মিশেছে সাগরদ্বীপে গিয়ে। এই আদিগঙ্গার সঙ্গমস্থলেই গঙ্গাসাগর স্নান হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষার একেবারে শেষ দিকে এই সাগরদ্বীকে নির্বাচন করা হয় ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য। যাদবপুর থেকে ডায়মন্ড হারবার ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে সাগরদ্বীপে পৌঁছনোর সহজ রাস্তা। সাগরদ্বীপের বেশিরভাগ মানুষ মেদিনীপুর থেকে এসেছে। এদের পূজিত দেবদেবীর সঙ্গে আদিগঙ্গার উপরের অংশের পূজিত দেবদেবীর সামান্য কিছু ফারাক দেখা যায়। সাগরদ্বীপে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মনসা, শীতলা ও বিশালাক্ষীর প্রাধান্য দেখাআ যায়। এই এই দ্বীপে গিয়ে মানুষদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা হয়েছে কোথায় কোথায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হবে। এই বিষয়ে সাহয্য করেন স্থানীয় মাআনুষজন। বিশালাক্ষীর থান নিয়ে নানা বিষয় বিকাশবাবু ও তাঁর আশেপাশে জড়ো হওয়া মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।। এই থান বা দেবী নিয়ে প্রথম প্রশ্ন ছিল হল, বিশালাক্ষী বনদেবী কিনা? অর্থাৎ, এই দেবীর সঙ্গে বনের সম্পর্ক কোথায়? এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে নানা ধরনের চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। বিশালাক্ষী থানের পাশেই একটি থান আছে। থানটি নানা কারণে বিখ্যাত। এই থানটিও বিশালাক্ষীর। এই থানে একটি কালো পাথরের মূর্তি আছে। পুরোহিতের কথা অনুযায়ী এই মূর্তি নারায়ণের। মূর্তিটি সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া ধীবর

শ্রেণি পায়। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে এই মানুষদের বিশ্বাস মেলে না। এই বিশালাক্ষী দেবীকে ধীবর শ্রেণির মানুষেরা পুজো করে থাকে সাগরে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে। থানের পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে জানাআ যায়, এই দেবীর পূজাচারে ও নিত্যভোগে আমিষ নৈবেদ্য দেওয়া হয়। এখানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে আর একটি বিষয় নজরে আসে। এই থানের থেকে একটু দূরেই একটি গাছের নীচে দুটি কালো পাথর প্রাকৃতিক ভাবে পড়ে আছে। জানা যায় এই পাথর দুটিকে আগে মানুষ ভয় ও ভক্তি করে পুজো করত এবং এই পাথর দুটিকে নিয়ে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে। দক্ষিণবঙ্গের সম্ভবত সবথেকে বড় মনসার মূর্তিযুক্ত থান এই সাগরদ্বীপেই অবস্থিত। এই থানটি সম্পর্কে সাগরদ্বীপে বহু আখ্যান প্রচলিত আছে। এছাড়া মনসাদ্বীপ এই দেবীর নাম থেকেই হয়েছে। এই মনসার থানটি উত্তর-দক্ষিণে বেশ খানিক লম্বা ও উপরে অ্যাসবেসটসের ছাউনিযুক্ত। থানটির সামনে একটি পুকুর আছে, দেবীর পুকুর বলেই সবাই জানে। আদিগঙ্গা সাগরদ্বীপের ধবলাটে মিলিত হয়েছে। ধবলাটের একটি প্রাচীন মনসার থানে গ্রামের মানুষের থেকে সন্ধান নিয়ে পৌঁছই। থানটি ধবলাট শিবপুর গ্রামে। থানটির পূর্ব দিকে গঙ্গাসাগর, প্রতিনিয়ত যেন গর্জন করছে থানটিকে গ্রাস করার জন্য। আগের থানটি নদী গ্রাস করে নিয়েছে। তাই সাগর থেকে একটু পশ্চিমে বর্তমান থানটি। নারায়ণ দাস (৬৭)-এর সঙ্গে কথা বলে এই থানের উৎপত্তি ও এই থানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য। নারায়ণবাবু আমায় জানান, থানটির উত্তর দিকে যে গেঁওয়া গাছকে বেদীর মধ্যে রাখা আছে, সেই গাছকে তারা দেবী বলে পুজো করে।

এই গবেষণার প্রথম দুই বছর নির্বাচিত অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার দুই বছর ক্ষেত্র থেকে কয়েক শত লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক মৌখিক আখ্যান ওডিও রেকর্ডারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এই আখ্যানকে বিষয় অনুযায়ী সাজানো। আসলে ক্ষেত্রসমীক্ষার পরবর্তী কাজ হলো, ক্ষেত্র থেকে পাওয়া তথ্যের সঠিকভাবে, গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী সাজানো। গবেষণার নির্বাচিত অঞ্চল থেকে পাওয়া যে সমস্ত তথ্য ও ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবি তারিখ ও বিষয় অনুযায়ী তালিকা ভুক্ত করা। ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন ক্ষেত্র থেকে পাওয়া তথ্যকে ঝাড়াই-পোছাই করে গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হবে। ক্ষেত্রসমীক্ষার শেষে ক্ষেত্র থেকে পাওয়া মৌখিক আখ্যানগুলিকে দেবদেবী অনুযায়ী

তালিকাভুক্ত করা ক্ষেত্রসমীক্ষা উত্তর কাজের মধ্যে প্রধান। এছাড়া এই সমস্ত মৌখিক আখ্যানের লিখিত রূপ দেওয়া বা ট্রানস্ক্রাইব করাও এই পর্বের প্রধান কাজ।

৩.৫ উপসংহার

দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বিশেষত নিম্ন-গাঙ্গেয় অঞ্চল লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানে সমৃদ্ধ। এখানকার লোকায়ত মানুষ তাদের ঐতিহ্য পরম্পরাকে দীর্ঘদিন নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন হিসেবে পালন করছে। জীবন ও জীবিকার কারণে নানা অঞ্চল থেকে মানুষ এই সমস্ত প্রান্তিক অঞ্চলে এসে নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে। এখানকার মানুষের যাপন চিত্রের প্রতিটি পরিসরে আছে অসম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস। এই লড়াইয়ের ফলেই এই সমস্ত লোকায়ত মানুষের মনে তৈরি হয়েছে দৈবী নির্ভরতা। এই দৈবী-নির্ভরতা থেকেই তৈরি দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক নানা অলৌকিক আখ্যান ও নানা আচার-অনুষ্ঠান। মিশ্র সংস্কৃতির এই অঞ্চলের 'গ্রাম দেবতা' ও 'অঞ্চলিক দেবতা' মানুষের মুখে মুখে আখ্যানের মধ্য দিয়ে আজও সমান ভাবে জীবন্ত হয়ে আছে, কোন বিদ্যায়তনিক পরিসরে এই জীবন্ত আখ্যান ও লোকায়ত সমাজের দেবদেবী নির্ভরতা কেন্দ্রিক যাপনকে বোঝা বা পাঠ করা সম্ভব হবে না। বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও লোকায়ত ধর্মের ইতিহাসের ধারাকে বুঝতে গেলে ও সর্বোপরি বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাসকে বুঝতে গেলে, শহর থেকে শুরু করে একেবারে প্রান্তিক এলাকার মানুষের পূজিত লৌকিক দেবদেবীর ইতিহাসকে বুঝতে হবে। মানুষের সংস্কৃতির রূপান্তর হয় তার জীবিকার জন্য এবং এটাই আমাদের সংস্কৃতির গোড়ার কথা। মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকর যে রূপান্তর সেটাও এই জীবিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। এই ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতির রূপান্তর বা তার বদলের ইতিহাস আমরা পেতে পারি ওই লোকায়ত সমাজের প্রতিদিনের জীবনযাপনকে সরাসরি দেখার মধ্য দিয়ে; এই দেখা বা পাঠ করা ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র:

১। দাস, বৃন্দাবন। *শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত।* কলকাতা: দে'জ। ১৯৯৫। পৃ ২৯২।

২। মুখোপাধ্যায়, জীবন (সম্পা)। *রাজপুর-সোনারপুরঃ অতীত ও ঐতিহ্য (দ্বিতীয় খণ্ড)।* সোনারপুর: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০১৪। পৃ ১৭।

৩। ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড)।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৯৮০। পৃ। ৮০।

৪। পাল, নিমেষকান্তি। *লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ। ১৯৯৬। পৃ ১৭৫।

৫। বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা।* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। ২০০৬। পৃ; ২২৭।

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)।* বিশ্বভারতী। ১৩৬৮। পৃ ১০০৪।

৭। সরকার, রেবতীমোহন। *লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিদ্যা।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০৫। পৃ ৬৮।

৮। বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা।* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। ২০০৬। পৃ; ২২৭।

৯। সরকার, রেবতীমোহন। *লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিদ্যা।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০৫। পৃ ৭২।

১০। সেনগুপ্ত, শঙ্কর। *লোকবৃত্তঃ ক্ষেত্রসমীক্ষার মূল সূত্র।* কলকাতা: ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন। ১৯৭৮। পৃ ৬৫।

১১। সরকার, রেবতীমোহন। *লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিদ্যা।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০৫। পৃ ১২২।

১২। বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা।* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। ২০০৬। পৃ; ২৩২।

১৩। পাল, নিমেষকান্তি। *লোক সংস্কৃতি।* কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ। ১৯৯৬। পৃ ১৮৪।

১৪। পাল, নিমেষকান্তি। *লোক সংস্কৃতি।* কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ। ১৯৯৬। পৃ ১৮৬।

১৫। বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *লোকসংস্কৃতিবিদ্যা।* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। ২০০৬। পৃ ২৩১।

১৬। সরকার, রেবতীমোহন। *লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিদ্যা।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০৫। পৃ ১৭

১৭। ঘোষ, সঞ্জয়। *দক্ষিণ ২৪ পরগনার লোকসংস্কৃতি।* সাহিত্যিক ও সাহিত্য সৃষ্টি। ২০১৪। পৃ ২৪।

১৮। দাস, শৈলেন। *জয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়চণ্ডী।* জয়নগর: সংযোগ প্রকাশনী। ২০১৪। পৃ ১৮।

১৯। দাস, শৈলেন। *জয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়চণ্ডী।* জয়নগর: সংযোগ প্রকাশনী। ২০১৪। পৃ ২।

২০। হালদার, বিমলেন্দু। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র।* ২০১৭। পৃ ২২।

২১। অর্ঘ্যচন্দন চট্টোপাধ্যায় (সম্পা)। *জটার দেউল এর ইতিবৃত্ত।* প্রভাবতী অফসেট প্রিণ্টার্স। ২০১২। পৃ৪।

চতুর্থ অধ্যায়

থানকেন্দ্রিক আখ্যান: পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার ও বিশ্লেষণ

৪.০ ভূমিকা— দক্ষিণবঙ্গের লোকায়ত মানুষের ইতিহাসের জীবন্ত উপদান হলো তাদের পূজিত দেবদেবী এবং এই দেবদেবীর থানকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া মৌখিক আখ্যান। দক্ষিণবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানকার মানুষকে জীবন ও জীবিকার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। জল-জঙ্গল ঘেরা এখানকার মানুষকে প্রতিদিনের জীবন যাপনে নানা বাধা অতিক্রম করতে হয়। প্রকৃতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষতিকারক জীবজন্তু এখানকার মানুষকে সব সময় তাড়া করে বেড়ায়। এই সর্বাত্মক বিপদের মধ্যে মানুষের একান্ত ভরসার স্থান তাদের পূজিত দেবদেবী। এই দেবদেবীর উপর ভরসা করেই এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের দিন অতিবাহিত হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত মানুষের মনে তৈরি হয়েছে দৈব-নির্ভরতা। এই নির্ভরতা বা দেবদেবীর উপর ভরসার কারণেই মানুষ এদের নিয়ে অজস্র কাহিনি তৈরি করেছে যা পাঠ করলে এই দেবদেবীর স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। লৌকিক দেবদেবীর থানকে নিয়ে গড়ে ওঠা আখ্যানের মধ্যে ধরা আছে লোকায়ত মানুষের মনের নানা দিক। দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মৌখিক আখ্যান মানুষের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তৈরি ইতিহাসমালা।

লৌকিক দেবদেবীর থান নিয়ে তৈরি হওয়া আখ্যানে নানা বিষয়ের সমাবেশ দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক আখ্যানে একদিক মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়কে ছুঁয়ে আছে আবার অন্যদিক ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। আদিম মানুষের মন থেকে বর্তমান সময়ের মানুষের চিন্তা-ভাবনার দলিল এই দেবদেবী ও তাদের থানকেন্দ্রিক ঐতিহ্যবাহী মৌখিক সাহিত্যে। এই আখ্যানের মধ্যে লোকায়ত মানুষের পালিত আচার-আচরণের ইতিহাসকে পাওয়া যায়। আখ্যানের বিষয়বস্তুর মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি থেকে শুরু করে লোকায়ত মানুষের জীবন-জীবিকার স্তর-পরম্পরাকে খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক আখ্যানে নানাবিধ বিষয়ের সমবায় দেখা যায়। এই বিষয়ের মধ্যে গ্রামীন মানুষের প্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনার দলিল এই আখ্যানগুলি।

আমরা জানি আদিম অরণ্যচারী মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যকলাপ বুঝতে না পেরে প্রকৃতিকে ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা করেছে। আদিম মানুষ প্রকৃতির তাণ্ডব দেখে যতই ভয় করুক না কেন তারা জানত যে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ছাড়া তার অস্তিত্ব কোনোভাবেই টিকবে না। প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই নির্ভরতা থেকেই মানুষ প্রকৃতিকে পূজা করেছে। প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য আদিম অরণ্যচারী মানুষ নানা আচার-আচরণ পালন করেছে। আর এইভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ইতিহাস তৈরি হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর থান ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আখ্যানে মানুষের সেই আজন্ম পালিত প্রকৃতি লগ্নতার ইতিহাসকে পাওয়া যায়। আজকের সময়ে আমরা যখন প্রকৃতি থেকে দূরে চলে যাচ্ছি, আমাদের ভোগকেন্দ্রিক মানসিকতার জন্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছি তখন এই আখ্যানগুলি আমাদের আজন্মের প্রকৃতি পাঠের স্বরূপকে সামনে হাজির করে। বর্তমান সময়ে আমরা পরিবেশ বিপন্নতার যুগে বাস করছি। নগর সভ্যতার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা পরিবেশের শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে চলেছে। পরিবেশ এই বিপন্নতার একটি ইতিহাস আছে, হঠাৎ একদিনে পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়েনি। মানুষের ক্রমাগত ভোগ-বাসনার জন্য মানুষ নির্বিচারে প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করেছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রকৃতি ও নারী সমান গুরুত্ব পেয়েছে। মানুষ যেখানে প্রকৃতি থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়েছে পারস্পরিক সহাবস্থানের মানসিকতার নিরিখে। প্রকৃতি থেকে লুণ্ঠনের মানসিকতা সেখানে কখনই প্রকাশ পায়নি। কিন্তু বর্তমানের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের প্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনার বদল ঘটেছে। প্রকৃতিকে মানুষ মুনাফার দৃষ্টিতে দেখেছে; প্রাকৃতিক সম্পদকে লুণ্ঠন করে মানুষ প্রকৃতির সমূহ বিপদ ডেকে এনেছে। মানুষের প্রকৃতি নিয়ে এই চিন্তার জন্য পরিবেশ আজ বিপন্ন, পরিবেশের শৃঙ্খল আজ ভেঙে পড়েছে। পরিবেশের এই বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে দেখা যায়। পরিবেশের এই বিপন্নতার হাত ধরেই পাশ্চাত্যে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। এই সাহিত্যতত্ত্বটি প্রথম দিকে নিছক প্রকৃতিকেন্দ্রিক সাহিত্য নিয়ে কথা বলত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই সাহিত্যতত্ত্বটির বিরাট পরিধিতে মানুষের পালিত আচার, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে নানাবিধ বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আসলে এই সাহিত্যতত্ত্ব মানুষ ও প্রকৃতির যে পারস্পরিক সম্পর্ক তার খতিয়ানকে তুলে ধরে। এই খতিয়ানকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পরিবেশ সচেতনতাকেই প্রচার করে। আমাদের

চারপাশে বদলে যাওয়া পরিবেশকে এই সাহিত্যতত্ত্ব সবুজের আহ্বান শোনায়। প্রকৃতি ও পরিবেশের সমস্ত প্রাণের সমান মূল্য আছে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে, এই সাহিত্যতত্ত্ব সেই গভীর সত্যকে প্রকাশ করে।

আমরা জানি যে, লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নিবিড়। এই সমস্ত দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছে মানুষের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন থেকে। মানুষ প্রকৃতির থেকে কোনো উপাদান নিতে গেলে এই সমস্ত দেবদেবীর কাছে গিয়ে আবেদন করে। এই দেবদেবী যে অরণ্য থেকে উঠে এসেছে তা এদের পূজা-পদ্ধতি থেকে শুরু করে আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ধরা আছে। আসলে এই সমস্ত দেবদেবী নিজেই পরিবেশের রক্ষক হিসেবে পূজিত হয়ে আসছে। এই সমস্ত দেবদেবীর কারণে মানুষ পরিবেশের বিনাশ করার থেকে বিরত থাকে। মানুষের আজন্মের লালিত প্রকৃতির সঙ্গে যে সহাবস্থানের ইতিহাস তা এই দেবদেবীর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। আমরা এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে মৌখিক আখ্যান পাই তার মধ্যে নানা বিষয়ের সমাবেশ হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রকৃতি নিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনা। লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্যে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ চেতনা ধর্মের মোড়কে প্রকাশ পায়। এছাড়া লৌকিক দেবদেবীর থানের মধ্যেও লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনা প্রকাশ পায়। লৌকিক দেবদেবীর থান ও তাকে কেন্দ্র করে তৈরি সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের পরিবেশ ভাবনা প্রকাশ করে।

৪.১ পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

লোককথাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য নানা তাত্ত্বিক অবস্থান তৈরি হয়েছে। লোকায়ত মানুষের পালিত সাহিত্য-সংস্কৃতিকে গভীরে গিয়ে দেখার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নানা তত্ত্ব প্রতি মুহূর্তে তৈরি হয়ে চলেছে। সাহিত্যকে পাঠ করার জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বলে একটি নতুন সাহিত্য সমালোচনার ধারা তৈরি হয়। বর্তমান সময়ে পরিবেশ বিপন্নতা থেকেই এই সাহিত্য সমালোচনার তত্ত্বটি তৈরি হয়েছে। লোকসাহিত্যকে আমরা জানি মানুষের কামনার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, লোকায়ত মানুষের প্রতিদিনের মন মানসিকতার ছাপ এই সাহিত্যে ধরা থাকে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব দিয়ে আমরা দেখতে চাইব এই সমস্ত লোককথায় গ্রামীন, প্রকৃতিলগ্ন মানুষের পরিবেশ

ভাবনা কীভাবে তাদের পালিত সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ধরা পড়ছে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি ভারতবর্ষের পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার ধারা। ভারতবর্ষের প্রকৃতি ভাবনার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক ছিল নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের এই আধ্যাত্ম চেতানার সঙ্গেই ছিল পরিবেশকে রক্ষা ও বিস্তারের বীজমন্ত্র। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই পরিবেশ ভাবনা লোপাট হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পরিবেশ বিপন্নতার শব্দ আমরা প্রতি মুহূর্তে শুনতে পাই। ফলে সর্বত্র পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নানা সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মসূচি দেখতে পাই। পাশ্চাত্যে, সাহিত্যে কীভাবে প্রকৃতি ভূমিকা পালন করছে, কীভাবে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে দেখা হচ্ছে এইসব প্রশ্নের হাত ধরে পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্বটি উদ্ভব হয়েছে। পরিবেশ বিপন্নতার থেকেই এই সাহিত্যতত্ত্বটির জন্ম। এই সাহিত্য সমালোচনাটির সম্পর্কে জানার আগে পাশ্চাত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনার পরিচয় জানা জরুরি। কেননা, এই চিন্তাভাবনার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল পরিবেশের সর্বনাশের বীজ। আমরা জানি বাইবেলে মানুষকে সব কিছুর উপরে স্থান দিয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে ঈশ্বর সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেছে আর মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ফলে মানুষের সমস্ত কিছুর উপর অধিকার সে জন্মসূত্রেই পেয়েছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে, ঈশ্বর নিজের আদলে মানুষকে সৃষ্টি করেছে। তাই মানুষের অধিকার আছে সমস্ত কিছুর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার। এই যে পৃথিবীর জৈব ও অজৈব উপাদানের উপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তার করার মানসিকতা তার থেকেই পরিবেশ বিপন্নতার সূত্রপাত হিসেবে ধরা যায়। ভারতবর্ষের ধর্মীয় বাতাবরণে পরিবেশ রক্ষা ও তার সংরক্ষণ করার মানসিকতা নানা আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে ধর্মীয় গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যে এই মানসিকতার বিপরীত চলন দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেলের এই প্রসঙ্গকে বাদ দিলেও পাশ্চাত্যের দার্শনিক অবস্থানে প্রকৃতি থেকে মানুষের দূরে যাওয়ার কথা বা ভাবনা দেখতে পাই। মানুষ প্রকৃতি থেকে দূরে গিয়ে আসলে তার উপরে প্রভুত্ব করার মানসিকতা নিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। দার্শনিক স্তরেও মানুষের প্রকৃতি থেকে দূরে যাওয়ার ইতিহাস শুরু হল। পাশ্চাত্যে প্রকৃতিকে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা না দেখে বরং প্রকৃতিকে বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যে প্রকৃতিকে বা প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের উৎস না ধরে বুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। সেখানে প্রকৃতিকে বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করে তার সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের কথা

বলা হয়েছে। ফলে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে যে আত্মিক যোগ ছিল এই বুদ্ধির কাছে এসে তা ছিন্ন হয়ে পড়ল। এখান থেকে দ্বৈতবাদের জন্ম হল ও মানুষ এই মতবাদের দ্বারা প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গেল। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই মতবাদের সূত্রপাত করলেও ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের হাত ধরে এর চরম সার্থকতা লাভ করে। দেহ ও মন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেকার্ত এই দুইয়ের পৃথকত্বকে স্বীকার করে একটি দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন; যেখানে তিনি বলতে চান যে, মানুষের দেহের দ্বারা পাওয়া জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা যাচাই না করা পর্যন্ত সেই জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। এখানে তিনি বুদ্ধির দ্বারা যাচাই ছাড়া কোনো জ্ঞানকেই সঠিক বলে মনে করছেন না। এরফলে বুদ্ধির ব্যতিরেকে যে জগত বা দেহের মাধ্যমে পাওয়া জগতকে তিনি কোনো মূল্য না দিয়ে মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। দার্শনিক কাণ্ট বলেন, মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা বাইরের জগতকে আকার প্রদান করে ও প্রকৃতি আমাদের কাছে সেইভাবে আকার ধারন করে। কাণ্ট তাঁর দার্শনিক উপলব্ধির মাধ্যমে বলেন, বুদ্ধি আসলে প্রাকৃতিক জগতের নির্মাতা। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই যে বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত পরবর্তী সময়ে তার ফাটল আরও বড় আকার ধারণ করবে। পাশ্চাত্যের আলোক প্রাপ্তির যুগে মানুষ নিজের ও সমাজের অন্ধকার দিককে দূরে সরিয়ে আলোর দিকে যাত্রা করেছে ও জীবনকে আলোর দিকে নিয়ে গিয়েছে। আলোক-প্রাপ্তির সময়ে মানুষ যেমন নিজের জীবনকে উন্নত থেকে উন্নততর করার জন্য নানা পথ আবিষ্কার করেছে তেমন করে প্রকৃতি থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতার ফাটল বিরাট আকার ধারণ করে এই সময় থেকেই। যে প্রকৃতির কোলে মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ড সেই প্রকৃতিকে মানুষ অপর ভেবে তার বিনাশ করার জন্য মত্ত হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের আলোক প্রাপ্তির যুগ তাই এক অর্থে মানুষের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতার যুগ হিসেবেও ধরা যায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের নিজের উপর বিশ্বাসকে এমন মজবুত জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যেখান থেকে মানুষের সমস্ত কিছুর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের মানসিকতা প্রবল হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে মানুষ এই পর্বে বুঝে ওঠা ও তাকে কর্তৃত্ব করার মধ্য দিয়ে সে প্রকৃতি থেকে দূরে গিয়ে তাকে ব্যবচ্ছেদ করার কথা ভাবল। বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী চিন্তা ও তার সবল ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজের নানা লক্ষ্য পূরণের কথা ভাবতে লাগল। মানুষের জীবনের এই লক্ষ্য পূরণের অন্যতম আধার হয়ে দাঁড়াল প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা। মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্বিচারে ব্যবহারের ফলে পরিবেশের স্থিতাবস্থাকে নাড়িয়ে দেয়। এরপর সমাজের ধারা

যখন বুর্জোয়া অর্থনীতির মধ্য দিয়ে যায়, যেখানে মানুষ মানবিকতা থেকে শুরু করে যাবতীয় সম্পর্ককে মুনাফার ভিত্তিতে বিচার করা হয় তখন পরিবেশের বিপন্নতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদের উত্থান পরিবেশকে চরমভাবে বিপন্নতার মুখোমুখি করে তোলে। মানুষ এই সময় প্রকৃতি থেকে কেবল সরে এল না প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ দুই হাতে লুঠ করতে লাগল। এর ফলে পরিবেশের যে শৃঙ্খলা তা সব অর্থে ভেঙে পড়ে এবং পরিবেশ বিপন্নতা চরম আকার ধারণ করে। মানুষ পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে এই পরিবেশ বিপন্নতার জন্য। এই সময়ে পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নানা সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশপাঠ করার জন্য নতুন নতুন তত্ত্ব তৈরি হয়। বিশ শতকে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবনা দেখা দেয়। পরিবেশ সচেতনতার জন্য সবচেয়ে মৌলিক ও উল্লেখযোগ্য বই হল, রাচেল কার্সেনের সাইলেন্ট স্প্রিং(১৯৬২)। বিশ শতকের ছয়ের দশকে আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রে অত্যাধিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য কীভাবে নষ্ট হয়েছিল এই গ্রন্থে তার ইতিহাস বর্নিত হয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও মানুষের জীবনযাপনের উন্নতির জন্য মানুষ প্রকৃতি থেকে সম্পদ লুট করার মানসিকতা নতুন মাত্রা লাভ করে। সবুজ বিপ্লব মানুষের শস্য ভাণ্ডারকে ভরিয়ে তুলেছিল। এই সবুজ বিপ্লব মানুষের সঙ্গে কৃষির যে চিরায়ত সম্পর্ক ছিল তাকে লোপাট করে দেয়। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত অর্থের দরকার কেবল মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাবার জন্য অপরিহার্য হয়ে রইল না। মানুষ কৃষিকাজ করল নিজের মুনাফা বৃদ্ধি করার জন্য। বাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্য আরও বেশি চাই এই মানসিকতার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আজন্ম লালিতপালিত সম্পর্ক তলানিতে ঠেকে। রাচেল কার্সেন তাঁর গ্রন্থটি শুরু করছেন একটি গল্প দিয়ে। যেখানে তিনি আমারিকার একটি উদ্যানের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোচনা করেছেন প্রকৃতিকে প্রেক্ষাপটে রেখে। এক সময় যেখানে সবুজ আর প্রকৃতির অন্য প্রাণের শব্দে মুখরিত থাকত। বসন্তে প্রকৃতি ফুলে ফলে ও রঙের মধ্য দিয়ে গান গাইত কিন্তু মানুষের মুনাফার জন্য বেশি উৎপাদনের জন্য প্রয়োগ করতে লাগল কীটনাশক ও রাসায়নিক সার। এর ফলে প্রকৃতির প্রাণ সমূলে ধ্বংস হতে থাকে ও পাখির গুঞ্জনে মুখতির আকাশ বাতাস স্তব্ধতায় পর্যবসিত হয়। রাচেল কার্সেন

এই বইতে এই প্রকৃতির নীরবতাকেই আমাদের ভবিষ্যৎ বলেন। রাচেল কার্সেনের বইটি সম্পর্কে সমালোচক অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

> প্রাণ প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা না জানালে, মানুষের অস্তিত্বই একদিন বিপন্ন হয়ে পড়বে। রাচেল এই সার কথাটি Silent Spring-এর অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিস্তৃত করেছেন গত শতকের ষাটের দশকে। সেই সময়ে ভেলায় চড়ে এত বড়ো মাপের একুশ শতকীয় আগাম কথা, পরিবেশ পৃথিবীতে কেউই অমন গভীরতায়, বিস্তারে ও ভাষাছন্দে আগে বলতে পারেননি। রাচেল পেরেছিলেন। তিনিই আধুনিক বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনের জননী।[১]

রাচেল কারসেন বইটির পরিবেশ পাঠের নতুন দিগন্ত খুলে দিল। আমাদের কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশ আজকে বিপন্ন ও এইভাবে মানুষ পরিবেশের ক্ষতি করলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী ও প্রজন্মের জন্য অন্ধকার অপেক্ষা করে আছে এই বইটি আখ্যানের মধ্য দিয়ে সেই অশণি সংকেতের কথা বলে। পরিবেশ নিয়ে এই শতকে নতুন করে নানা চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয় এবং এর পরবর্তী সময়ে এই চিন্তাভাবনা ও পরিবেশ রক্ষার জন্য আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। পরিবেশ চিন্তার প্রাথমিক পর্বে শিল্প দূষণ প্রধান বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এর পরবর্তী সময়ে পরিবশের সব রকমের দূষণ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবেশ চিন্তা নিয়ে দার্শনিক পরিসরেও নানা রকমের তত্ত্ব ভাবনা গড়ে উঠতে দেখা যায়। পরিবেশ সচেতনার জন্য নানা স্তর থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন হতে দেখা যায়। আমরা ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিল চুক্তি ও ১৯৯২ সালে জীববৈচিত্র্য সম্মেলন পরিবেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে যে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল তার উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে। এই সমস্ত কর্মসূচি ও আলোচনার মধ্য দিয়ে মানুষ পরিবেশের রক্ষার বিষয়ে নানা প্রস্তাব রাখতে শুরু করে। পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা এই সময়ে সমাজের প্রায় সর্বস্তরে দেখা যায়। আসলে এই সময়ে আমাদের চারপাশের পরিবেশ চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে ও মানুষ তার বাসভূমিকে রক্ষার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক স্তর থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। কিন্তু পরিবেশ ও পরিবেশে সচেতনতা নিয়ে সাহিত্যে এই সময়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ দেখতে পাই না। সাহিত্যের পরিসরে সচেতনভাবে পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্য লেখা হয়েছে অনেক পরে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সাহিত্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মাধ্যমে সাহিত্য ও পরিবেশকে নতুন করে পাঠ করার সুযোগ তৈরি করে। সাহিত্য সমালোচনার এই

ধারাটি বিংশ শতাব্দীতে সুত্রপাত হলেও এই ধারাটি অল্প সময়ে খুবই জনপ্রিয় সাহিত্য সমালোচনার ধারা হয়ে ওঠে। পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত ১৯৭০-৮০-এর দশক থেকে শুরু হয়ে গেলেও এই সাহিত্যতত্ত্বটি জনপ্রিয় ও সর্বস্তরে স্বীকৃত হয় ১৯৯০ সাল নাগাদ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, এই সাহিত্যতত্ত্বটি পাশ্চাত্যের হাত ধরেই সব জায়গায় ছড়িয়েছে। পাশ্চাত্যের কিছু গবেষক ও অধ্যাপক সাহিত্যে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। বিদ্যায়তনিক পরিসরে এই অধ্যাপক ও কিছু গবেষক নানা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মধ্য দিয়ে এই ধারাটিকে সবার সামনে হাজির করেন। অধ্যাপক গলফেল্টি এই বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম। বিদ্যায়তনিক পরিসরে এই সাহিত্যতত্ত্বটি চিন্তাভাবনা ও প্রসার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে রেনোর ইউনিভার্সিটি অফ নভোদাতে একটি পদ পান। গল্টফেল্টির এই পদটির নাম ছিল Professor of Literature and the Environment। ফলে আমরা বুঝতে পারি এই পদটির মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য ও পরিবেশকে পাঠের ধরণ বা সাহিত্য ও পরিবেশের সম্পর্ককে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। সাহিত্য ও পরিবেশের সম্পর্কের খতিয়ানকে বোঝানোর জন্য গলফেল্টি ও ফর্ম (Fromm)-এর সম্পাদনায় *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology* (1996) নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, যা পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্বটিকে পাকা ভীতের উপর স্থাপন করেন। এই সময়ে আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যা এই সাহিত্যতত্ত্বটিকে আরও বিস্তৃতি দান করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ইকোক্রিটিসিজিম কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ইউলিয়াম রুকার্ট তাঁর *Literature and Ecology: An Experimental in Ecocriticism* গ্রন্থে। এই সময়েই গ্লেন লভ (Glen Love) প্রকাশ করেন 'American Nature Writing: New Contexts, New Approches' । এই দুইটি বই প্রকাশের ফলে সাহিত্যে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা প্রসারিত হতে দেখা যায়। আমরা এই বছরেই স্থাপিত হয় ASLE (Association for the Study of Literature and Environment)। এই সংস্থাটির প্রথম সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন স্কট স্লভিক (Scott Slovic)। এই সংস্থাটির প্রধান কাজ ছিল সাহিত্যকে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার ক্ষেত্র তৈরী করা (redrew)। এই শাখটি খুব শীঘ্র বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংস্থাটি মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে নতুন করে তুলে ধরে। এছাড়াও প্রকৃতিকেন্দ্রিক লেখাকে (Nature Writing) এই সংস্থার মধ্য দিয়ে সবার সামনে

হাজির হয়। এই সংস্থাটি যখন প্রথম শুরু হয় তখন সদস্য ছিল মাত্র তিরিশ জন কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে সাতশোর কাছাকাছি। ফলে বোঝা যায় এই সাহিত্য শাখাটির জনপ্রিয়তার ধরণকে। ASLE প্রত্যেক বছরে দুইবার করে *ASLE* News এবং *ISLE* (Inter Disciplanry Studies in Literature and Environment) নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। ASLE-এর প্রত্রিকা প্রকাশ ও কাজের মৌলিক উদ্দেশ্যই হল সারা পৃথিবীতে পরিবশ-সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও এই সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা ও গবেষণাপত্র প্রকাশ করা। এই সংস্থা মানুষের সঙ্গে পরিবেশে মানুষের পালিত সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ককে দেখার চেষ্টা করে। *ISLE* নামে পত্রিকাটি পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনার ধারাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্যকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখার সূত্রপাত হয়। এছাড়াও এই পত্রিকার মাধ্যেমে সাহিত্য ও পারফর্মিং আর্টের সম্পর্ককে পরিবেশ ভাবনার নিরিখে পাঠ করা হয়। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব প্রথম দিকে খুবই সীমাবদ্ধ পরিসরে বিরাজ করে, রোমাণ্টিক কবিতা, নেচার রাইটিং প্রভৃতি কয়েকটি পরিসর ছিল এর বিচরণের পরিধি। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ভয়াবহ বিপন্নতার জন্য মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। পরিবেশ বিপন্নতার জন্যই পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের পরিধী আরও বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে। পরিবেশবাদী সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্বকে আমরা এই সময়ের থেকেই আন্তঃবিদ্যা এই তকমা দিতে পারি। কেননা, এই সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্বটি তার বিশাল পরিধীতে নানা বিষয়ের সন্নিবেশ করতে লাগে।

পরিবেশবাদী সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্বটির পরিধী এতই বিস্তৃত যে কোনো একটি সংজ্ঞায় এর সম্যক ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে খুব সহজ করে বুঝতে গেলে বলতে হয়, সাহিত্য ও আমাদের চারপাশের যে ভৌত পরিবেশ তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে পাঠ করার একটি তাত্ত্বিক অবস্থান। আমরা যেমন নানা তত্ত্ব দিয়ে সাহিত্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করি। যেমন নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বে আমরা দেখতে পাই লিঙ্গ-রাজনীতির দ্বারা সাহিত্যকে পাঠ করা হচ্ছে। আবার মার্ক্সীয় সাহিত্য-বীক্ষায় দেখা হয় উৎপাদনের পদ্ধতি ও ধরণের জন্য নতুন নতুন শ্রেণির তৈরি হচ্ছে। এই শ্রেণির দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সেখান থেকে কেমন করে তার সমন্বয় হচ্ছে। সাহিত্যে এই বিষয়গুলি কীভাবে বর্ণিত হচ্ছে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে সাহিত্যকে পৃথিবী বা পরিবেশ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়।

এই সাহিত্যতত্ত্বে দেখা হয় একটি কবিতা বা সনেটে প্রকৃতি কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে; একটি উপন্যাসের কাঠামোয় বা প্লটে প্রকৃতি কীভাবে ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া লেখক কোন মূল্যবোধের দ্বারা চালিত হয়ে উপন্যাসে বা সাহিত্যে প্রকৃতিকে বর্ণনা করছেন সেটাও এই তত্ত্বে দেখা হয়। লেখক যখন কোনো সাহিত্য রচনা করছেন তখন সেই সাহিত্যে প্রকৃতিকে নিয়ে কোন ইচ্ছে প্রকাশ করছেন বা পরিবশের সজ্জা কেমন হবে তার কোনো দিশা তিনি দিচ্ছেন কিনা তা দেখা হয়। আমরা জানি যে, প্রকৃতিকে দেখা ও তাকে বোঝার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি সমান নয়। এই সাহিত্যতত্ত্ব প্রকৃতিকে নারী ও পুরুষ কীভাবে দেখছে তা বুঝতে চায় এবং যদি এদের দেখার মধ্যে কোনো ভিন্নতা থাকে তাহলে সেই ভিন্নতার কারণ কী? এই সন্ধান এই সাহিত্যতত্ত্বের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এই তাত্ত্বিক পরিসরটি বুঝতে চায় আমাদের বন্যতা (Wildness) সম্পর্কিত ধারণার স্বরূপকে এবং প্রতি মুহূর্তে এই ধারণা কীভাবে বদলে যাচ্ছে তার খোঁজ এর মৌলিক অনুসন্ধানের মধ্যে পড়ে। বর্তমান সাহিত্যে ও মানুষের পালিত সংস্কৃতি এই দুই পরিসরে প্রকৃতিকে কীভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বা কীভাবে স্থান দেওয়া হচ্ছে তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করা। কেননা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে প্রকৃতি ও মানুষের পালিত সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ককে বুঝতে চায়। আমরা জানি মানুষের সংস্কৃতি বাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল ভাষা ও সাহিত্য। ফলে সাহিত্যের ভাষা কাঠামোয় এই প্রকৃতিক বোঝার জন্য ও তাকে বর্ণনার জন্য কোন কৌশল ব্যবহার করছে তাকে দেখা হয়। এই সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাই বলা যায়—

> As a Critical Stance, it has one foot in literature and the other one land; as a theoretical discourse, it negotiates between the human and the nonhuman.[২]

আমরা বুঝতেই পারছি যে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে সাহিত্য ও চারপাশের ভৌত পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমরা এই প্রসঙ্গে এই সাহিত্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখতে পাই যেখানে লেখক, পাঠক ও তার চারপাশের জগতের মধ্যেকার যে সম্পর্ক ও এই সম্পর্কের খতিয়ান বা এই সম্পর্ক কীভাবে সাহিত্যে উঠে আসে তা আলোচনা হয়। আমরা জানি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখকের ‘ওয়ার্ল্ড’-এর অর্থ চারপাশের ‘সোসাইটি’ বা তার চারপাশের সামাজিক পরিসরকেই বোঝায়। কিন্তু এই সাহিত্যতত্ত্ব এই জগতকে বৃহৎ অর্থে বোঝে। এখানে

লেখকের জগত মানে গোটা ইকোস্পিয়ার। Barry Comoner's-এর ইকোলজি সম্পর্কে যে কথা বলেছেন এই প্রসঙ্গে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন—

Everything is connected to everithings elese[৩]

আমরা বুঝতে পারি এই সাহিত্যতত্ত্বের পরিধি এবং এখানে আমাদের অস্তিত্ব যে কেবলমাত্র নিজের চারপাশকে নিয়েই সম্পূর্ণ নয়, আমরা আমাদের চারপাশের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে বাঁচতে পারি না। সম্পূর্ণ বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক এই সাহিত্যতত্ত্ব সেই সম্পর্কের কথা বলে ও তাকে বোঝার চেষ্টা করে এবং আমাদের ক্ষুদ্র জগত ভেঙে বৃহৎ জগতের সামনে হাজির করে। এই সাহিত্যতত্ত্ব আজকের সময়ে পরিবেশের এই বিপন্নতার জন্য যতটা আমাদের বদলে যাওয়া ইকোসিস্টেমকে দায়ী করে তার থেকে বেশি দায়ী করে আমাদের নৈতিকতার পতনকে। আসলে আজকের পরিবেশ বিপন্নতার কারণকে গভীরে গিয়ে খোঁজ করে এই সাহিত্যতত্ত্ব। এই সাহিত্যতত্ত্ব মনে করে আমাদের নৈতিক বিচার-প্রক্রিয়ার মধ্যেই আসলে পরিবেশের বিপন্নতার কারণগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে। মানুষের নৈতিক অবস্থানই পরিবেশেকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে ধরা হয়। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে কোনো সাহিত্যকে বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে যে সমস্ত মানদণ্ড ব্যবহার করে তাহল—

> ১) নির্দিষ্ট সময়ে, জনজীবনে, মানুষের কল্পনায় প্রকৃতির ভূমিকা কেমন। ২) প্রকৃতির ধারণা কীভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। ৩) প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে কোন কোন মূল্যবোধকে আরোপ করা হচ্ছে বা অস্বীকার করা হচ্ছে। ৪) মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে কীভাবে দেখানো হচ্ছে। ৫) সাহিত্যে প্রকৃতিকে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।[৪]

আমরা এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে আমরা আলোচনা করতে পারি পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মূল জিজ্ঞাসা বা এই সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনার বৃত্তে কোন কোন বিষয়গুলি মৌলিক আলোচনার দাবী রাখে। আমরা প্রথমেই দেখতে পাই যে, এই সাহিত্যতত্ত্ব দেখতে চায় আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা-চেতনায় ও আমাদের কাজকর্মে প্রকৃতি কীভাবে ধরা পড়ছে? আমাদের চারপাশের যে ভৌত পরিবেশের শৃঙ্খলা আছে তা আমাদের কাজকর্মে কী ভূমিকা গ্রহণ করছে। আমরা কি সেই শৃঙ্খলাকে বজায় রাখতে চাইছি নাকি সেই শৃঙ্খলাকে ভেঙে পরিবেশের ক্ষতির মানসিকতা নিয়ে চলি? প্রকৃতি নিয়ে যে সাহিত্য লেখা হয় যাকে আমরা 'নেচার রাইটিং' বলে থাকি তাকে সাহিত্যের কোন বর্গের

মধ্যে ফেলব বা সাহিত্যের কোন সংরূপের মধ্যে আমরা এই প্রকৃতি বিষয়ক লেখাকে থাকবন্দী করব। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব আমাদের প্রকৃতি পাঠের ঐতিহ্যের ইতিহাসকে বুঝতে চায়। আমাদের চারপাশের পরিবেশ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পরিবেশের পরিবর্তনের কারণকে এই সাহিত্যতত্ত্ব বুঝতে চায়। আমরা জানি যে প্রকৃতির একটি নিজস্ব সত্তা আছে। প্রকৃতি তার বন্যতা ও সৌন্দর্য নিয়ে আপন মহিমায় নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রকৃতির এই ভূমিকাতে মানুষের কোনো ভূমিকা থাকে না। কিন্তু পরিবেশ মানুষ নিজের মতো করে সাজাতে পারে। মানুষের হস্তক্ষেপেই পরিবেশ সেজে ওঠে। বর্তমান সময়ে এই প্রকৃতি মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষ তার পালিত সংস্কৃতি ও রচিত সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃতি নিয়ে নানা চিন্তাভাবনার ছাপ রাখে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব মানুষের জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও বর্তমান সাহিত্যের মধ্যে কীভাবে পরিবেশ সচেতনতার ছাপ রাখছে তা দেখতে চায়।

আমরা জানি যে ইকোক্রিটিসিজিম শব্দটি এসেছে 'ইকো' এবং 'ক্রিটিক' এই দুই শব্দ থেকে। এই দুইটি শব্দ গ্রীক *Oikos* এবং *Kritis* শব্দ থেকে এসেছে। এখানে Oikos শব্দটির অর্থ বলা হচ্ছে প্রকৃতি বা নেচার। Edward Hoaglan এই শব্দটির ব্যাখা করে বলেছেন- আমাদের সুন্দর গৃহ। এখানে প্রকৃতিকেই আমাদের ঘর বা আশ্রয়স্থল হিসেবে বলা হয়েছে। আবার Kritis শব্দটির অর্থ হিসেবে বলা হচ্ছে—

> Who Wants the house kept in good order[৫]

অর্থাৎ এই দুই গ্রীক শব্দ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, এই সাহিত্যতত্ত্বে আমাদের সেই বিরাট প্রকৃতিকেন্দ্রিক আবাসস্থলকে বা সেই ঘরকে আমরা কেমন করে সাজিয়ে রাখছি বা তার রক্ষণাবেক্ষণ করছি তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার একটি তাত্ত্বিক অবস্থান। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান বিষয় প্রকৃতি সম্পর্কিত মানুষের চিন্তা-ভাবনার স্বরূপকে জানা। আমরা জানি প্রকৃতি মানুষের কাছে নানাভাবে হাজির হয়। আমাদের মানসিকতার ও প্রকৃতির প্রতি আমাদের মনোভাব যেমন হয় প্রকৃতি ঠিক তেমন করেই আমাদের সামনে আকার ধারণ করে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব আমাদের কাছে প্রকৃতি কীভাবে ধরা দেয় তার পর্যায়ক্রম তৈরি করে। এই পর্যায়ক্রমের প্রথমেই আসে প্রকৃতি সম্পর্কিত অধিবিদ্যার ধারণা (Metaphysical Concept)। এই ধারণায় প্রকৃতি সবসময় রহস্যময়তায়

মোড়া থাকে। প্রকৃতির যে অপার বিস্ময়, তার যে অসীমতা তা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। অধিবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণায় প্রকৃতি এইভাবেই ধরা দেয়। আবার আর একটি ধারণার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আমাদের সামনে হাজির হয় যেখানে প্রকৃতি তার প্রাকৃতিক জগত নিয়েই হাজির হয়। প্রকৃতিকে নিয়ে এই ধারণার নিরিখে গড়ে উঠেছে বস্তুবাদী ধারণা (Realistic Concept)। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রকৃতিকে নিয়ে নানা সূত্র। এই প্রাকৃতিক সূত্র দিয়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি প্রকৃতির নানা রহস্যময় নিয়মকে ও তার বিজ্ঞানকে। প্রকৃতি সম্পর্কিত এই দুই ধারণায় প্রকৃতি আমাদের মনের কাছে ধরা দেয়। আমাদের মনের চোখ দিয়ে এই প্রকৃতিকে আমরা অনুভব করি। কিন্তু এর বাইরেও প্রকৃতির আরও নানা পরিসর পড়ে থাকে অর্থাৎ বনভূমি, গ্রাম, কোনো পাহাড় বা কোনো নদীর কথা উচ্চারণ করলে তার স্থানগত বা তার চাক্ষুস জগত আমাদের সামনে হাজির হয়, যাকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারি। একে আমরা প্রকৃতিকে নিয়ে স্থানগত ধারণা (Lay or Surface Concept) বলতে পারি। পরিবেশে নিয়ে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এই ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব এই তিন ধারণার মধ্য দিয়ে বুঝতে চায় মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পর্কের নানা সূত্রকে।

আধুনিক সময়ে পরিবেশকে মানুষ তার সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপরীত স্থানে রেখেছে। পরিবেশ ও মানুষের পালিত সংস্কৃতির বিপরীত সম্পর্কের খতিয়ান আজকের সময়ে আমরা দেখতে পাই। এই দুই পরিসরকে এমন করে ভাবা হয় যে কোনও একটি মাত্রাতিরিক্ত বাড়লে অপরটির সমূলে ক্ষতি হবে অর্থাৎ মানুষের সংস্কৃতির প্রসার হলে প্রকৃতির বিস্তার কমবে ও পরিবেশের ক্ষতি হবে। ফলে মানুষের পালিত সংস্কৃতি ও পরিবেশকে বিপরীত অবস্থানে রেখে আধুনিক সময়ে এই দুইয়ের সংরক্ষণ করার কথা ভাবা হয়। কিন্তু পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে এই দুইয়ের কোনো বিরোধকে মানা হয় না। এই সাহিত্যতত্ত্ব মানুষের পালিত সংস্কৃতিকেই পরিবেশ রক্ষার মূলসূত্র হিসেবে ধরা হয়। এখানে বলা হয় পরিবেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে বিভেদ করে কোনভাবেই প্রকৃতিকে রক্ষা করা যাবে না বরং পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে মানুষের সংস্কৃতিকে পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল করে পালন করতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তার মধ্যেই নিজেকে স্থাপিত করে প্রকৃতির উপাদান নিজেকে করতে হবে। আসলে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব মানুষের চিরায়ত সংস্কৃতিতে প্রকৃতিকে যে পূজার

প্রচলন ছিল সেই ইতিহাসকে সামনে এনে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের সংস্কৃতিতে প্রকৃতি রক্ষার মানসিকতা ছিল যা আজকের পরবর্তিত সমাজ কাঠামোয় মানুষ প্রকৃতিকে সংস্কৃতির বিরোধী করছে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য। আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কার ও সংস্কৃতি যা কিনা প্রকৃতির সহায়ক ছিল তাকেই ফিরিয়ে আনতে হবে আর তাহলেই প্রকৃতি আর সংস্কৃতির মধ্যে কোনো বিরোধ থাকবে না। আসলে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে দূরত্ব করার মধ্যে মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতাকেই প্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গে নারীবাদী দার্শনিক ভ্যাল প্লামউড প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বিরোধের প্রসঙ্গে বলেন যে, পাশ্চাত্যে এই ধারণা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। তিনি বলেন পাশ্চাত্যে প্রকৃতিকে মানুষ তার সংস্কৃতির অপর হিসেবে দেখেছে। আমরা জানি এই ধারণা প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের এই দ্বিত্ববাদী ধারণা গ্রীক দার্শনিক প্লেটো থেকে দেকার্ত পর্যন্ত প্রসারিত ও প্রচার লাভ করেছে। এই দ্বিত্বের ধারণার ফলে প্রকৃতি ও মানুষের পালিত সংস্কৃতির মধ্যে কোথাও সমতার কথা বলা থাকে না; এরফলে একে অপরের উপর আধিপত্যের ধারণাই ক্রিয়াশীল থাকে। আমরা জানি যে, খ্রিষ্টীয় ধারণায় মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং নিজেকে সব কিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে। বিশ শতকে আমেরিকায় জন মুইর (১৮৩৮-১৯১৪) এই ধারণা থেকে সরে এসে আমাদের অধিবিদ্যক-চেতনায় প্রকৃতি যেভাবে ধরা দেয় সেই চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকৃতি সংরক্ষণের কথা বলে। মুইর বহুমাত্রিক ঈশ্বরের কথা বললেন যেখানে পরিবেশের সমস্ত কিছুতেই ঈশ্বরের অবস্থান ও প্রকাশ বিদ্যমান থাকে। ফলে পরিবেশের সমস্ত জৈব-অজৈব উপাদানকে রক্ষা করা ও সংরক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য হয়ে পড়ে। এই ভাবনা থেকেই তিনি ‘সিয়েরা ক্লাব’ প্রতিষ্ঠা করেন যা আমেরিকায় পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সামাজিক নিসর্গনীতি পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নানা বিভেদের জন্য সমাজে নানা শ্রেণি, বর্ণ থেকে নানা বর্গের বিভাজন দেখা যায়। আর এই জন্য সমাজে শোষণ আমরা দেখতে পাই। আমরা সামাজিক নিসর্গনীতিতেও এইরকম বর্গ বিভাজন দেখতে পাই। পার্থ চক্রবর্তী এই সামাজিক নিসর্গনীতির যে বিভাজন করেছেন তার ক্রম হল-

সংস্কৃতি (ললিত- কলা, ধর্ম, ভাবাদর্শ)।

রাজনীতি(ক্ষমতা সম্পর্ক, আইন, রাষ্ট্র)

সামাজিক কাঠামো (পরিবার ও জ্ঞাতিত্ব, জাতি ও কৌম)

অর্থনীতি (উৎপাদন সম্পর্ক, বানিজ্য)

নিসর্গনৈতিক কাঠামো (মাটি, জল, জঙ্গল ইত্যাদি)।[৬]

সামাজিক নিসর্গনীতিতে নৈসর্গিক কাঠামোয় অর্থাৎ মাটি, জল ও জঙ্গলের সঙ্গে অপর সমস্ত বর্গের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে বা গবেষণা করে। এবং সেখান থেকে বুঝতে চায় সমাজ কাঠামোয় নিসর্গ নিয়ে যে ধারণা তৈরি হয় সেখানে অপর বিভাগগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এই সাহিত্যতত্ত্ব প্রাথমিক পর্বে নিখাত সাহিত্যকেন্দ্রিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে এই জনপ্রিয় সাহিত্যতত্ত্বটি আন্তঃবিদ্যায়তনিক(Inter-diseplinary) হওয়ার ফলে নানা বিষয় এর বৃহৎ তত্ত্ববিশ্বে স্থান করে নেয়। এই বিস্তৃত পরিসরে একটি নতুন মাত্রা বা তত্ত্বভাবনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে তা হল *‘নিবিড় নিসর্গনীতি’* বা *‘ডিপ ইকোলজি’*। দার্শনিক আরনে নেস এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এই তত্ত্বটির ফলে আমরা জানতে পারি পরিবেশ রক্ষা কেবলমাত্র মানুষের নৈতিক মানদণ্ডের দ্বারা সম্ভব নয়। বরং পরিবেশের সমস্ত উপাদানের উপর সমান গুরুত্ব আরোপের মধ্য দিয়েই রক্ষা করা সম্ভব। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে যে চারটি মৌলিক শর্তের উপর এই তত্ত্বটি দাঁড়িয়ে আছে তাহল—

> ১) প্রতিটি মানুষ এবং না-মানুষ পশুপাখির এক অন্তর্নিহিত মূল্য আছে যা মানুষের ব্যবহারিক মূল্য দ্বারা বিচার্য নয়। ২) জীব জগতের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের দিকে তাকালে এই মূল্য অনুধাবন করা যায়। ৩) একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত জীব জগতের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যকে বিনষ্ট করার কোন অধিকার মানুষের নেই। ৪) মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি এবং জীব জগতের সমৃদ্ধির জন্য মানুষের জনসংখ্যা হ্রাস করা সুসুংগত।[৭]

আমরা বুঝতেই পারি নিবিড় নিসর্গনীতিতে প্রকৃতি মানুষের অন্তর্নিহিত গভীর সত্তার কাছে আবেদন রাখে। এই প্রসঙ্গেই মনে রাখতে হবে এই তত্ত্বের ভিত্তিভূমিতে ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মবাদে পরিবেশকে নিয়ে যে চিন্তাভাবনা ও তাকে সংরক্ষণের যে চিন্তা দেখা যায় তার থেকে ভাবনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই তত্ত্বে আমরা দেখতে পাই পরিবেশের সমস্ত প্রাণকে উপলব্ধি করে প্রভুত্বকামী মানসিকতার বিরোধিতা করে সবার সমান গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। ডিপ ইকোলজিতে পরিবেশের সমস্ত জায়গা বা উপাদানকে মানুষের অবাধ ভোগ ও যাতায়াতের কথা স্বীকার করে না। পরিবেশের এই

সমস্ত পরিসরকে ধর্মীয় ভাবনার দ্বারা যুক্ত করে পবিত্র হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। আর এর ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের হাতে বিপন্ন হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। আমাদের মনে হতে পারে এই তত্ত্ব-ভাবনা বিজ্ঞান-মনস্কতা থেকে দূরে সরে গিয়ে কুসংস্কারের দিকে যাত্রা করছে। কিন্তু আমরা এটাও বলতে পারি যে, মানুষের মনের কাছে এই প্রকৃতি ধরা দেয় কোনো যৌক্তিকতা ছাড়া। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে আমরা দেখতে পাই যে পরিবেশের সীমা ও তার সীমাবদ্ধতার কথা। একটি বিষয় আমাদের আলোচনায় আসে যে, মানুষের পালিত সংস্কৃতির ধারণার সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক কেমন হবে। মানুষ পরিবেশের মধ্যেই তার আচার- সংস্কার ও প্রথা নিয়ে বিরাজ করে। এই সংস্কার, প্রথা কি পরিবেশকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়? এর পালনের ফলে কি পরিবেশ ও প্রকৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ে? আমরা এই সমস্ত জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে দেখছি তার প্রধান কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির অবস্থানকে সমরেখায় দেখে না। তাহলে কীভাবে প্রকৃতি ও সংস্কৃতিকে সমসূত্রে গাঁথা সম্ভব? পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে ডিপ ইকোলজিতে বলে, মানুষ তার পালিত সংস্কৃতির মধ্যেই প্রকৃতিকে রক্ষার বিষয়টি নতুন করে ভাবুক; যেই ভাবনা আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে ধরা ছিল। ডিপ ইকোলজি এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে মানুষকে আবার প্রকৃতির কাছাকাছি আসার ও আনার আহ্বান জানায়। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সম্পর্ক কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। সেই সম্পর্কের সূত্র হল—

> প্রথম ক্ষত্র: অকর্ষিত, জনবসতিহীন এলাকা (মরুভূমি মহাসাগর পতিত অঞ্চল)। দ্বিতীয় ক্ষেত্র: প্রাকৃতিক ভূমি (অরণ্য, হ্রদ, পর্বত, ঝর্ণা)। তৃতীয় ক্ষেত্র: গ্রামজীবন (টিলা, মাঠ, জঙ্গল)। চতুর্থ ক্ষেত্র: দৃষ্টিনন্দন বসতিস্থল (উদ্যান, বাগান, লেন)।[৮]

এখানে মানুষের যে অকর্ষিত এলাকা যা বিশুদ্ধ প্রকৃতি (Wilderness)। এখানে না-মানুষের আবাসস্থল। আবার চতুর্থ ক্ষেত্রটি মানুষের সংস্কৃতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফসল স্বরূপ। এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ আছে কিন্তু আজকের সময়ে বিশুদ্ধ প্রকৃতি বলে প্রায় কিছুই নেই। মানুষের সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রকৃতির মধ্যে পড়েই। প্রথম ক্ষেত্রটিতে মানুষের সংস্কৃতির ফলস্বরূপ বিভিন্ন দূষণ প্রকৃতিকে আক্রান্ত করে। মোটের উপর এই চারটি ক্ষেত্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব এই ধারণা মানতে নারাজ যে সমাজের সব কিছু নির্মিত হচ্ছে সামাজিকভাবে বা ভাষাগতভাবে। প্রকৃতি মানুষের সব কিছুর উপরে অবস্থান করে। প্রকৃতিকে নিয়ে মানুষের নানা

ধারণা বা মতের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সাংস্কৃতিক ধারণা থেকেই। প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে গল্টফেল্টি যথার্থই বলেছেন—

> Despite the broad scope of inquiry and disparate levels of sophistication, an ecological criticism shares the fundamental premise that human culture is connected to the physical world, affecting it and affected by it. Ecocriticism takes as its subject the interconnections between nature and culture. Understanding how nature and culture constantly influence and construct each other is essential to an informed ecocriticism. As a critical stance, it has one foot in literature and the other on land. As a theoretical discourse, it negotiates between the human and the nonhuman.[৯]

আমরা বুঝতেই পারি যে মানুষের সংস্কৃতি ও প্রকৃতি এক অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া আমরা যাকে নেচার রাইটিং বা প্রকৃতি নিয়ে লেখা বলছি তা সেই বর্গকে নিয়েই লেখে যেখানে প্রকৃতি ও মানুষের সংস্কৃতির যৌথ বা পারস্পরিক আদান-প্রদান চলে।

এই সাহিত্যতত্ত্বটির তাত্ত্বিক অবস্থান যেমন প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে তেমন করে এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে প্রাথমিক ভাবে বলা যায় যে—

> Ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment.[১০]

ফলে আমরা বুঝতেই পারি এই তত্ত্বটি সাহিত্য ও মানুষের বাইরে যে ভৌত পরিবেশ আছে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে বুঝতে চেয়েছ। আসলে পরিবেশ ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক যেমন প্রতি মুহূর্তে বদল হচ্ছে তেমন করে এই সাহিত্যতত্ত্বটি নিজের অবস্থান, সংজ্ঞা তৈরি করছে যদিও নিজের মৌলিক অবস্থান অটুট রেখে। এই সাহিত্যতত্ত্বের সদা পরিবর্তনের জন্য লরেন্স বুয়েল (lawrance buell) একে বলেছেন—

> Ecocriticism is an Umbrella term[১১]

আমরা বুঝতেই পারি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সাহিত্যতত্ত্বটি নিজের পরিসরে অনেক বিষয়কে আলোচনার স্থান দিচ্ছে; এর বিরাট ছাতার তলায় মানুষের পালিত আচার-অনুষ্ঠান থেকে তার যাবতীয় নান্দনিক কর্মকাণ্ডকে স্থান দিয়ে নিজেকে প্রতি মুহূর্ত সমৃদ্ধ করে চলেছে। ইকোক্রিটিসিজিম মূলত যে চারটি বিষয় নিয়ে সাম্প্রতিক কালে বেশি করে ভাবিত হচ্ছে সেগুলি হল— নান্দনিক দিক, সামাজিক দিক, বৈজ্ঞানিক দিক ও সাংস্কৃতিক দিক। লরেন্স বুয়েল তাঁর *'The Future Of Environmental*

Criticism' গ্রন্থে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে, এই সাহিত্যতত্ত্ব সব সময় পরিবশভিত্তিক সাহিত্য, মানুষের নানা শিল্পকলা ও তাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করেছে। তিনি পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। এই তত্ত্বের প্রথম অংশকে বা এর সূত্রপাতকে তিনি বলেছেন পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের প্রথম তরঙ্গ এবং এর পরের ভাগকে বলেছেন দ্বিতীয় তরঙ্গ বা সংশোধনবাদী পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব। এই সাহিত্যতত্ত্বের প্রথম তরঙ্গে যে সমস্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব করা হয়েছিল, তা হল প্রকৃতি নিয়ে লেখা সাহিত্য বা প্রকৃতির বন্যতা নিয়ে লেখা সাহিত্য। আর পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের দ্বিতীয় তরঙ্গে তিনি পরিবেশ বিপন্নতার সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন। তিনি এখানে সামাজিক পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের কথা বলছেন। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব আসলে পরিবেশভিত্তিক লেখা থেকে শুরু করে পরিবেশ বিষয়ক সব বিষয়কে সাহিত্যের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করে। ডেভিড মেজেল পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন যে—

> Our Reading of environmental Literature should help us realize that the concerns are not exclusively of the order of 'shall these tree be cut? Or shall this river be dammed?'- important as such questions are-but also of the order of 'What has counted as the environmental, and why may count? Who makes of the conceptual boundaries, and under what authority, and for what reasons? Have those boundaries and that authority been contested, and if so by whom? Withwhat success and by virtue of what strategis of resistance? These are the levels on which I would like to see ecocriticism theorize the environmental[১২]

তিনি পরিবেশ নিয়ে আমাদের সামনে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেন যেখানে তিনি বলতে চান যে, গাছ কেন কাটা হচ্ছে সেই প্রশ্ন তোলা যেমন সমান জরুরি তেমন করে আমাদের ভাবতে হবে কোন ধারণার দ্বারা এই গাছকে কাটা হচ্ছে। তিনি আমাদের বলতে চান যে, পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা বা আইন কীসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে। তিনি বলেন পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে এইসব বিষয়গুলি আসুক। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে 'মানব'কে নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে দেখে। এই সাহিত্যতত্ত্ব মানুষকে বৃত্তের মধ্যে রাখলেও কেন্দ্রে রাখে না। বরং মানুষ আর না-মানুষের সম্পর্ককে নিয়ে বেশি জিজ্ঞাসা এই সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে পড়ে। আমরা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম যে, এই নতুন সাহিত্যতত্ত্বটি কীভাবে আমাদের প্রথাগত সাহিত্যপাঠের ধারণাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। আমরা যেখানে অন্য সাহিত্য সমালোচনায় দেখতে পাই যে, সেখানে লেখক মানুষের

মনের অতলান্তিক পরিসরে গিয়ে ডুব দেন ও সেখান থেকে মানুষ ও তার মনের কারবার নিয়েই সাহিত্য রচিত হয়। আমরা বলতে পারি অন্যান্য সাহিত্যতত্ত্ব মানুষের মনের হদিশ নিয়ে কথা বলে। আর পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব মানুষের মনের হদিশে নামলেও তার মূল লক্ষ্য থাকে মানুষ ও তার চারপাশের পরিবেশের উপর। এই সাহিত্যতত্ত্ব তার বিরাট পরিধিতে মানুষ থেকে শুরু করে পরিবেশের সমস্ত উপাদানকে নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার পরিসরও তৈরি করে। এই সাহিত্যতত্ত্ব কোন একটি বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। মানুষের দর্শন-চিন্তা, তার পালিত ধর্ম-ভাবনা থেকে শুরু করে মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর সমবায়ে এই সাতিত্যতত্ত্বের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে ও এর ফলে এই সাহিত্যতত্ত্বকে একক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগ বলা যায় না। পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনার তত্ত্বটিকে আমরা আন্তঃবিদ্যার সমালোচনার তত্ত্ব হিসেবে দেখতে পাই; যেখানে সাহিত্য, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম থেকে শুরু করে মানুষের পালিত সমস্ত কিছু ভীড় করে এর তত্ত্ববিশ্বে স্থান করে নিয়েছে।

৪.২ মৌখিক আখ্যানের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

কোনো জাতির প্রাণ-ভ্রমরা লুকিয়ে থাকে তার সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে। এবং আরও বিশেষভাবে বললে বলা হয় যে, এই প্রাণ-ভ্রমরা লুকিয়ে থাকে তার লোকসংস্কৃতির মধ্যে। লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত আঙিনায় মানুষের সমস্ত কিছুকে ধরা থাকে। লোকসংস্কৃতি লোকায়ত মানুষের চলমান জীবনযাপনকে ধরে রাখে। আমরা জানি লোকসংস্কৃতি বিচিত্রমুখী ও বিভিন্ন বিষয়ের সমবায়ে গড়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতি নানাভাবে প্রকাশিত হয় বা নানা মাধ্যমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, এই মাধ্যমগুলির মধ্যে অন্যতম হল— ১। বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ২। বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ৩। আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ৪। বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ৫। অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ও ৬। লিখন-অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির বেশিরভাগ অংশই মৌখিকভাবে প্রচলিত। তবুও এদের মধ্যে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিকেই আমরা মৌখিক সাহিত্য বা 'ভার্বাল আর্ট' বলতে পারি। লোকসংস্কৃতির মধ্যে এই মৌখিক সাহিত্য হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। লোকসংস্কৃতিকে ভবিষ্যতের বিচিত্র সম্ভাবনা ও বিস্তারের দিকে চালিত করতে এই মৌখিক সাহিত্য প্রভূতভাবে সাহায্য করে। মৌখিক সাহিত্য ঐতিহ্যবাহিত হয়ে বংশ-পরম্পরায় প্রচলিত থাকে। এই ঐতিহ্যের হাত ধরে যেমন

করে মৌখিক সাহিত্য টিকে থাকে তেমন করে লোকসংস্কৃতির এই অংশকে সমৃদ্ধ করে। এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য মৌখিক সাহিত্য সবসময় যে অপরিবর্তিত থাকে এমন নয়, সময় ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী ঐতিহ্যবাহিত এই সাহিত্য নিজেকে পরিবর্তীত করে নেয়। আসলে ঐতিহ্য তো সেটাই যার একহাত থাকে অতীতের সঙ্গে আর একটি হাত থাকে ভবিষ্যতের দিকে আর এই দুইয়ের মেলবন্ধনের মধ্য দিয়েই তার বিস্তার। মৌখিক সাহিত্যেকে আবার নানা বর্গে ভাগ করা হয়— লোককথা, প্রবাদ, ধাঁধা, গাথা, সংগীত, শিশুদের ঘুমপাড়ানির গান, ছড়া, জাদুমন্ত্র। এই বিভাগগুল ছাড়াও অসংখ্য লোকসাহিত্য আমরা পেতে পারি। এইসব ভাগের মধ্যে আমরা লোককথা নিয়েই আলোচনা করব। আমরা আগেই বলেছি লোকসাহিত্যের বেশিরভাগটাই মৌখিক পরম্পরা এবং এইভাবেই সে পরিবর্তিত ,পরিবর্ধিত হয়ে সচল হয়ে আছে।

লোককথার কবে জন্ম হয়েছে তার ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়। সেই প্রাচীন কাল থেকে, ইতিহাসের কোন অন্ধকারময় সময় থেকে মানুষ গল্প বলতে ও শুনতে ভালোবাসত। আর এই গল্প বলা ও শোনা থেকেই লোককথার জন্ম হয়েছে বলে মনে করা হয়। ভারতবর্ষে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, পালি ভাষায় লিখিত বুদ্ধের জীবনকাহিনি, কথাসরিৎসাগর থেকে শুরু করে মহাভারত সবই মৌখিক পরম্পরা বা মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে। এইসব মৌখিক সাহিত্য পরবর্তী সময়ে লিখিত আকারে প্রচারিত হতে থাকে। লোককথা মূলত গদ্য দ্বারা বাহিত, এবং এই গদ্যনির্ভর আখ্যান লিখিত বা মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে হস্তান্তরিত হয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখে। আবার লোককথাকে বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে লোককথা হল লোকায়ত মানুষের স্মৃতি ও শ্রুতির মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য পরম্পরায় বাহিত গদ্য কাহিনি। আমরা জানি ইংরেজি 'ফোকটেল' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে লোককথাকে ধরা হয়। লোককথা সম্পর্কে বলা যায়—

> পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে বর্নিত জনশ্রুতিমূলক গল্পকে লোককথা বা লোককাহিনি (Folktale) বলা হয়[১৩]

আমরা আগেই বলেছি যে, লোককথা সৃষ্টির কোনো দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে বলা যায়নি। লোকায়ত মানুষ নিজেদের গল্প বলা ও শোনার একান্ত চাহিদা থেকে লোককথা সৃষ্টির মৌলিক কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। মানুষের অরণ্যনির্ভর জীবন থেকে শুরু করে আজকের সময় পর্যন্ত নানা বঞ্চনা ও

অসাম্যের শিকার হতে হয়েছে। মানুষের এই পূরণ না হওয়া ইচ্ছেগুলি তাদের কল্পনার রাজ্যে ইচ্ছেডানায় ভর করে পূরণ হয়েছে। সেই হিসেবে লোককথাকে আমরা মানুষের ইচ্ছে পূরণের আখ্যান বলতে পারি। লোককথার সৃষ্টি ও তার প্রবাহ সম্পর্কে দিব্যজ্যোতি মজুমদার বলেছেন-

> লৌকিক সমাজের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। দুনিয়া জোড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানবিক ও মানসিক সেতু-বন্ধনের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিরল। আঞ্চলিক মানুষ এসব কাহিনি বয়ে চলেছেন সেই কোনো ভুলে যাওয়া কাল থেকে। সন্ধ্যার সূর্যডোবার মুহূর্তে সারাদিনের ক্লান্তিশেষে তারা যখন লোককথা বলতেন তখন নিজের জীবন ও সমসাময়িক পরিবেশের না মেটা আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাপূরণ নানাভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। গ্রামীন সহজ সরল মানুষের অভিজ্ঞতা তো এই ধরনের, তাই লোককথা অঞ্চলিক মানুষের নিজস্ব ভাষায় সৃষ্টি হলেও তার এক আন্তর্জাতিক অনুভব থাকে। সে কারণেই লোকসংস্কৃতির অঙ্গিকগুলির মধ্যে সবচেয়ে লোকপ্রিয় হল লোককথা।[১৪]

লোককথার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ কাহিনি থাকে। এই কাহিনিতে দেবদেবী, জীবজন্তু থেকে শুরু করে নানা বিষয় থাকতে পারে। লোককথার মধ্যে যে কাহিনি থাকে তা মূলত সরল হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে জটিল শাখা-প্রখাশা যুক্ত কাহিনিকে আমরা দেখতে পাই। লোককথার মধ্যে আমরা একটি নির্দিষ্ট মোটিফ দেখতে পাই; এই মোটিফ লোককথার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। লোককথায় যেমন স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখে তার ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখে বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে তেমন করে লোককথার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতীয় বা নির্বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে আমরা দেখতে পাই। যেখান থেকে আমরা একটি লোককথার সঙ্গে নানা দেশের লোককথার মিল খুঁজে পাই। অর্থাৎ, একটি দেশের লোককথার সঙ্গে অন্য দেশের লোককথার বিষয়ের সঙ্গে মিল পাই। একটি লোককথায় প্রত্নপ্রতিমা বা আর্কেটাইপগত বৈশিষ্ট্য আছে, যেখান থেকে আমরা লোককথার মূল, অটুট বিষয়ের সন্ধান করতে পারি। আমরা জানি লোককথার মধ্যে এই প্রত্নপ্রতিমাগত বৈশিষ্ট্য সমাজ-সভ্যতার নানা পরিবর্তনের মধ্যে নিজেকে অপরিবর্তিত রাখে। এই প্রত্নপ্রতিমার হাত ধরেই আমরা বিভিন্ন দেশের লোককথার মধ্যে মিল খুঁজে পাই। আমরা জানি যে প্রতিটি দেশের সভ্যতার যে ক্রমিক বিকাশ বা তার যে স্তর-পরম্পরা তা মোটের উপর এক। ফলে মানুষের চাহিদা, তার সুখ-দুঃখ কোথাও একই সরণি বেয়ে প্রবাহিত হতে দেখি। আর লোককথায় মানুষের প্রতিদিনের যাপনচিত্রকেই তুলে ধরে। তাই লোককথার মধ্যে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্যকে পাই যা দেশকালের সীমা টপকে সমস্ত দেশের মন মানসিকতাকে প্রকাশ করে। আবার একটি লোককথার মধ্যে যতই বিভিন্ন দেশের কথা বলা হয়ে

থাকুক বা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মিল পাওয়া যাক না কেন সেই লোককথার মধ্যে সেখানকার স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে ধরা থাকে। লোককথার মধ্যে লোকায়ত মানুষের প্রতিদিনের নানা সমস্যা, নানা চাহিদার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই হিসেবে লোককথাকে জাতীয় সাহিত্য বলা যেতে পারে। এই বিষয়টিকে আশুতোষ ভট্টাচার্য সুন্দরভাবে ব্যাখা করেছেন—

> প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালীর নিকট ব্যাঘ্র জীবটির যে একটি বিশেষ স্থান আছে, অন্যান্য জাতির তাহা নাই। সেইজন্য নিজের জীবনবোধের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ইহার সম্পর্কিত একটি মনোভাব যে ইহার গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ইহার প্রতিবেশী সমাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইবে। ব্যাঘ্র হিংস্রতম জীব হওয়া সত্ত্বেও বাংলার লোককথায় বাঘই সর্বাপেক্ষা হাস্যাস্পদ ও বুদ্ধিহীন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং যে জাতির ব্যাঘ্র সম্পর্কে এই মনোভাব গঠিত হইতে পারে নাই, সেই জাতির মধ্যে ইহার সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠিবার অনুরূপ অবকাশ রচিত হইতে পারে নাই। সুতরাং অনুরূপ ভাবাপন্ন ব্যাঘ্র সম্পর্কিত লোক-কথাগুলি সেই সকল জাতির মধ্যে গিয়া প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। এই সম্পর্কে বাংলার প্রতিবেশী সাঁওতাল জাতির কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার লোককথায় ব্যাঘ্র বাংলাদেশের অনুরূপ বুদ্ধিহীন ও হ্যাসাস্পদ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে প্রকৃতই হিংস্র প্রকৃতির। লোককথার মধ্যে ব্যক্তি চরিত্রের পরিবর্তে জাতীয় চরিত্রেরই বিকাশ হইয়া থাকে; লোককথার চরিত্র, গোষ্ঠীর প্রতিনিধি কদাচ ব্যক্তির প্রতিনিধি নহে। সেইজন্য বাঙ্গালীর চরিত্রের যাহা জাতীয় গুণ, তাহাই তাহার বাস্তবধর্মী সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।[১৫]

ফলে আমরা বলতে পারি যে লোকথার মধ্যে যেমন সারা বিশ্বের সঙ্গে মিল খুঁজে পেতে পারি তেমন করে এর মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে তার অববয়বের মধ্যে ধারণ করে জাতির সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হয়। লোকথার মধ্যে স্মৃতি ও শ্রুতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। লোককথা যেহেতু মুখে মুখে বংশ-পরম্পরায় প্রবাহিত হয় তাই এখানে লোককথার আশ্রয়স্থল হিসেবে স্মৃতির ভূমিকা প্রধান। লোককথার কথক, যিনি গল্প বলেন, স্মৃতি তার প্রধান অবলম্বন। এরসঙ্গে কথকের গল্পটি বলবার সময়ে শ্রোতার মনে গল্পটিকে বা আখ্যানকে ছবির মতো করে শ্রোতার চোখের সামনে ভাসিয়ে দিতে হবে; না হলে শ্রোতাকে সে আকর্ষণ করতে পারবে না। ফলে লোককথার মধ্যে স্মৃতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন করে শ্রুতি বা সেই আখ্যানকে বলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> গদ্যের ভিতর দিয়া যে কাহিনি প্রকাশ করা হয় ইংরেজিতে তাহাকেই সাধারণভাবে folktale বলা হয়। বাংলায় লোককথা বলিলে এই কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয়, তবে সংক্ষেপে তাহা কেবলমাত্র কথা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।[১৬]

আগেই বলা হয়েছে লোককথার মধ্যে এই স্মৃতির ভূমিকা প্রবল থাকে। কেননা লোককথা আজ পর্যন্ত টিকে আছে সেখানে স্মৃতির বড় ভূমিকা আছে। লোককথাকে মনে রাখার জন্য এর বিষয়গত আকর্ষণ যেমন কাজ করে তেমন করে লোকায়ত মানুষ কিছু কৌশল অবলম্বন করে এই কথাকে মনে রাখার জন্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থে মৌখিক আখ্যানকে মনে রাখার প্রক্রিয়াকে বিশদে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে রাখা বা স্মৃতির প্রসঙ্গে লোকসাহিত্যের সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আসলে লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে মনে রাখার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। অপরপক্ষে মৌখিক সাহিত্যকে বলা হয় পুরোটাই স্মৃতি হাতড়ে। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই মনে রাখার বিষয়ে বলেছেন—

> মৌখিক কথাসাহিত্যে বিভিন্ন উপলক্ষে একই অবস্থা (situation) বর্ণনা করিবার জন্য বিভিন্ন বর্ণনা ব্যবহারের পরিবর্তে পূর্ববর্তী বর্ণনারই পুনারাবৃত্তি করা হইয়া থাকে।[১৭]

আশুতোষ ভট্টাচার্য এরপর কাক ও চড়ুইয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে, নানা কাহিনিতে কাক ও চড়ুইয়ের কথা বলার ধরণ একই। এই একই কথা বলার ধরনের জন্য লোককথাকে মনে রাখতে সুবিধে হয়; ঠিক যেমন করে 'এক যে ছিল রাজা' দিয়ে রূপকথার গল্প শুরু হয়। লিখিত সাহিত্যে এইরকম কোন প্রক্রিয়া থাকে না।

মানুষ যখন থেকে মুখে ভাষা পেয়েছে, সেই ইতিহাসের তারিখ বিহীন সময় থেকে মানুষ গল্প বলে ও শুনে আসছে। গদ্য নির্ভর কাহিনি মুখে মুখে মানুষ বলে আসত। এই গল্প বলা ও শোনা বিশ্বের প্রতিটি দেশে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। এই গল্প বলা ও শোনার মধ্যে কথক ও শ্রোতা দুইজনই আনন্দ পায়। এছাড়া লোককথায় মধ্যে কিছু আকর্ষণীয় বিষয় থাকে যা সবাইকে টানে। লোককথার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য এর প্রবাহ আজও টিকে আছে। সময়ের আঘাতে অনেক কিছু লোপাট হলেও লোককথা আজকেও সমানভাবে টিকে আছে। লোককথা মিশে থাকে লোকায়ত মানুষের জীবনের সঙ্গে, তার আচার-সংস্কার, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, স্বপ্ন ও দুঃখ-আনন্দের সঙ্গে। লোককথার এই বৈশিষ্ট্য ও তার প্রবহমনতাই এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম বলে ধরা হয়—

> যে কাহিনি প্রণেতা তা কেউ জানে না, যা লোকের মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম প্রবাহিত, যার মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবন, পরিবেশ ও স্বপ্ন প্রতিবিম্বিত তাই-ই এক অর্থে লোককথা।[১৮]

লোকায়ত মানুষের প্রতিদিনের যাপনচিত্রকে কথার মধ্য দিয়ে বুনে দেয় এই সমস্ত লোককথায়। আমরা বলেছি যে, লোককথার মধ্যে একই সঙ্গে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে আবার লোককথার চরিত্রগুলির কোনো দেশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। লোককথার চরিত্রগুলি যে কোনও দেশ-কালের হতে পারে। লোককথার রাজা বা রাজপুত্র যে কোনও দেশের হতে পারে। লোককথা দেশকালের গন্ডি টপকে যাওয়ার বড় কারণ হল এই সাহিত্য নমনীয় হয়। অর্থাৎ, কোনো কিছুকে সে স্থির বলে আঁকড়ে ধরে রাখে না। তাই লোককথা সময়, দেশ-কাল প্রভৃতি নানা প্রেক্ষিতে নিজের মূল বক্তব্যকে অটুট রেখে এর বাইরের শরীরে নানা পরিবর্তন করে নেয় আর এই জন্য লোককথার এই বহুবিচিত্র রূপ দেখা যায়।

লোককথার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে যুক্ত। লোককথার কাহিনি বিন্যাস, এর আখ্যানভাগ বলার মধ্যে যে সারল্য থাকে এবং এর মধ্যে যে আকর্ষণ করার গুন আছে তারফলে মানুষের মনে খুব সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে ও মানুষের কাছে এর আপাত সারল্যর জন্য গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এবং আমরা জানি যে, লোককথা লোকায়ত মানুষের কাছে সবথেকে বেশি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু লোককথার মধ্যে ধর্মীয় অনুষঙ্গ প্রবেশ করলে এর মূল সজীবতা হারিয়ে গিয়ে লোককথার চরিত্র না হয়ে অন্য পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। আমরা জানি যে, লোকায়ত সমাজে লোককথাগুলি সৃষ্টির কোনো ধর্মীয় প্রভাব থেকে নয়। লোককথার মধ্যে আমরা যে নীতির প্রচার দেখি তা মানুষ ও তার সমাজ ধারণের জন্য। কিন্ত এই প্রচার যদি একান্তই ধর্মের প্রয়োজনে হয়ে থাকে তাহলে তা লোককথাই থাকে না। আমরা জানি যে বুদ্ধ জাতক প্রথম পর্বে যে নীতির প্রচার করেছিল তা লোককথার আশ্রয়ে কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই জাতকগুলি একেবারেই বৌদ্ধধর্মের প্রচারক হয়ে পড়ে আর এর ফলে লোককথাগুলি তার সজীবতা হারিয়ে ফেলে। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> একটি ধর্মীয় লক্ষ্য ইহার সম্মুখে আনিয়া যেন জোর করিয়া অনেক সময় স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহার ফলেই ইহাদের আবেদনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। লোক-কথা এইভাবে যখন কোন সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সীমার মধ্যে আবধ হইয়া পড়ে, তখন ইহার প্রাণশক্তি বিনিষ্ট হইয়া যায়।... লোক-কথা বিভিন্ন সম্পদায়ের হাতে পড়িয়া যখন কোন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সাধন করিতে যায়, তখনই ইহা লুপ্ত হইয়া যায়। পৃথিবী ক্রমেই যত সম্প্রদায়গত কিংবা ধর্মীয় চিন্তাধারার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, লোক-কথার সেই অনুযায়ী ততই অপব্যবহার হইয়াছে। ধর্মনিরেপেক্ষ ক্ষেত্র

হইতে লোককথার উদ্ভব উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও ইহা জাতির ধর্মীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।[১৭]

আমরা আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের সূত্র ধরে বলতে পারি বাংলার লোককথা ধর্মীয় প্রভাব দ্বারা সর্বদা চালিত হয়নি। মৌখিক আখ্যানগুলির মধ্যে ধর্মীয় অনুষঙ্গ এলেও তাতে কখনই ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রবেশ করেনি। আর এইজন্য বাংলার এই সমস্ত লোককথা তার সজীবতা ও আকর্ষণকে আজও বজায় রেখেছে। দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক লোককথার মধ্যে দেবদেবীর কথা থাকলেও তাতে লোকায়ত ধর্মই প্রধান বিষয় হয়ে ওঠেনি বা ধর্ম প্রচার এই সমস্ত লোককথার মূল বিষয় হয়ে ওঠেনি। বাংলার লোককথা নীতি প্রচারের উদেশ্য বা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি। বাংলার গ্রামীন সমাজ নিজেদের নানা হাসি-কান্না বুনে চলেছে এই সমস্ত লোককথার মধ্যে। কিন্তু আমরা জানি যে বাঙালির জাতীয় চরিত্রের মধ্যে ধর্মের প্রভাব সব সময় কাজ করেছে। ফলে লোককথার মধ্যেও ধর্মের অনুপ্রবেশ স্বাভাবিকভাবেই প্রবেশ করেছে।

বাংলার লোককথার মধ্যে লৌকিকদেবদেবীকেন্দ্রিক লোককথার অন্য মাত্রা আছে। লোককথাকে শিশু সাহিত্য হিসেবে দেখা হয়। যদিও আমরা জানি যে লোককথাকে কোনো ভাবেই শিশু সাহিত্য বলা যায় না বরং পরিণত মন ও মানসিকতার ছাপ লোককথার মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মৌখিক সাহিত্যকে কোন ভাবেই শিশু সাহিত্যের আওতায় ফেলা যায় না। লোকসাহিত্যকে শিশু সাহিত্য বলার একটি বড় কারণ হল শিশু মনের মনোরঞ্জনের জন্য এই সাহিত্য তৈরি হয়। কিন্তু, লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক সাহিত্য শিশু মনের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি হয়নি। লোকায়ত মানুষের নিজের, একান্ত আপন করে যে সমস্ত দেবদেবীকে ভাবে তাকে কেন্দ্র করেই এই সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে শিশু বিষয়টি গৌণ। মানুষ তার পূজিত গ্রাম্য, আঞ্চলিক দেবদেবীকে নিয়ে নানা মাহাত্ম্যসূচক, ভয় মিশ্রিত ও সর্বোপরি দেবদেবীর অলৌকিক কার্যকলাপের আখ্যান প্রজন্মের পর প্রজন্ম সৃষ্টি করে চলেছে। একে আমরা লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক সাহিত্য বলতে পারি।

লোকসাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মধ্যে আমরা নানা বিষয়ের সন্নিবেশ হতে দেখি, কেননা এই সাহিত্য চলমান আর এই চলমানতার জন্য এর মধ্যে গ্রহণ-বর্জনের ক্রিয়া চলতে থাকে।

লোককথাকে তার বিষয়-বৈচিত্র্যের নিরিখে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে দেখি— (ক) রূপকথা (খ) পশুকথা (গ) ব্রতকথা (ঘ) লোকপুরাণ (ঙ) নীতিকথা (চ) ইতিকথা (ছ) কিংবদন্তি

লোককথা গ্রামীন মানুষের সহজ প্রাণের প্রকাশ। সহজ সরল ভাষায় ও সহজভাবে বলে চলে জীবনের নানা অভাব-ভিযোগের কথা। বিদ্যায়তনিক পরিসরে লোককথাকে কেবলমাত্র সহজ প্রাণের সহজ কথা হিসেবে দেখা হয় না। লোককথার আপাত, ছদ্ম আড়ালকে সরিয়ে এর মধ্যে যে গভীর সমাজ-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে নানা গভীর কথা আছে তাকে দেখতে চায়। লোককথাকে বিশ্লেষণ করার কতগুলি তাত্ত্বিক অবস্থান আছে যা দিয়ে লোককথাকে আমরা পাঠ করতে পারি। আমরা লোককথাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার এই তাত্ত্বিক হাতিয়ারগুলির নাম কেবল উল্লেখ করব, এর বিশদ পরিচয় আমাদের এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে অনাবাশ্যক। লোককথা কবে সৃষ্টি হয়েছে সেই ইতিহাস আমরা জানি না। আধুনিক সময়ে লোককথার উৎস নির্ণয়ে কতগুলি তত্ত্ব আমাদের সামনে আসে— ১) ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব ২) ভেঙে যাওয়া পুরাণ তত্ত্ব ৩) সৌরপুরাণ তত্ত্ব ৪) ভারতীয় উদ্ভব তত্ত্ব ৫) ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক তত্ত্ব ৬) বিকিরণবাদ ৭) একক উদ্ভবতত্ত্ব ও বহু উদ্ভবতত্ত্ব। এছাড়া লোককথার শ্রেণিসংগ্রাম, শ্রেণির ধারণা অন্বেষণের জন্য মার্কসীয় তত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোককথাকে বুঝতে টাইপ মোটিফ ইনডেক্স খুবই প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। লোককথার গঠন ও তার কাঠামোকে বিশ্লেষণ করার জন্য কিছু মডেল আমাদের সামনে আছে। এই মডেলের মধ্যে ভি.জে প্রপের ফাংশান ও সিনট্যাগম্যটিক মডেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য লেভিস্ট্রস উল্লেখযোগ্য একটি নাম। লেভিস্ট্রসের 'মিথেম', 'বাইনারী অপোজিসান' ও 'প্যারাডিকম্যাটিক মডেল' লোককথাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠ কর যায়। আমরা জানি লোককথায় লোকায়ত মানুষের মনের গভীরে যে বাসনা বা যে কথা প্রকাশ্যে বলতে পারে না তা এই মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে বুনে দেয়। লোকায়ত মানুষ নানা ভাবে শোষিত হয়ে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। লোককথাগুলিতে এই সমস্ত শোষিত মানুষ নিজেদের যন্ত্রনার ইতিহাসকে বলে চলে। ফলে লোককথাতে শ্রেণি দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে ওঠে। মার্ক্সীয় তত্ত্ব ভাবনায় যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে এই সমস্ত মৌখিক আখ্যানে সেই দ্বন্দ্বের চিত্র আমরা দেখতে পাই। লোককথাকে মার্কসীয় তত্ত্বের দ্বারা পাঠের ফলে এর মধ্যে লোকায়ত মানুষের সমাজ কাঠামোকে নিয়ে নানা চিন্তাভাবনার সূত্র আমরা পেয়ে যাই। লোককথাকে বিচার বিশ্লেষণের জন্য ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ

তত্ত্ব লোককথার মধ্যে মানুষের অবদমিত বাসনার প্রকাশকে বের করে আনে। লোককথায় মানুষ তার অতৃপ্ত বাসনা, মনের গোপন ইচ্ছেগুলি কীভাবে প্রকাশিত করে তাকে এই তত্ত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করে। ইয়ুং মনে করেন লোককথা মানুষের অতৃপ্ত বাসনা ও অবদমিত ইচ্ছার চাপেই সৃষ্টি হয়েছে। ফলে লোককথাকে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

৪.৩ থানকেন্দ্রিক আখ্যানের বিষয় বৈচিত্র

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে, বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গ্রাম্য, আঞ্চলিক দেবদেবীর থান বংশপরম্পরায় পূজিত হয়ে আসছে। এই সমস্ত থান কোনো কোনো জায়গায় নিতান্ত প্রাকৃতিকভাবেই পড়ে থাকে। আবার কোনো কোনো থান বাজার, হাট বা লোক সমাগম হয় এমন জায়গায় অবস্থান করে বলে জাগ্রত ও স্বমহিমায় বিরাজ করে। বাংলার লোকায়ত সমাজের এই সমস্ত দেবদেবী ও তাদের আশ্রয়স্থল দিনের পর দিন টিকে থাকার কারণ হিসেবে যেমন বলা যায় যে বাংলার লোকায়ত মানুষ ধর্মভীরু ও মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা লৌকিক দেবদেবীর উপর নির্ভর করেই অতিবাহিত করতে হয়। এই নির্ভরতা থেকেই প্রতিটি দেবদেবীকে কেন্দ্র করে নানা কাহিনি তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত আখ্যান এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ভয়, ভক্তি ও অলৌকিকতার মোড়কে প্রবাহিত হয়। লোকায়ত সমাজের এই সমস্ত আখ্যান কেবলমাত্র স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে না, এই সমস্ত আখ্যান গ্রাম-অঞ্চলের বেড়া টপকে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে যে দেবদেবীকে নিয়ে আখ্যানটি তৈরি হয়েছে সেই দেবদেবীর মাহাত্মের উপর নির্ভর করে। তিনি যতটা জাগ্রত হয়ে লোকায়ত মানুষের মনে বিরাজ করবে সেই দেবদেবীকে নিয়ে অসংখ্য মৌখিক আখ্যান তৈরি হবে। বাংলার বহু থান ও দেবদেবী এই মৌখিক আখ্যানের মধ্য দিয়ে আজও সমানভাবে পূজিত হয়ে আসছে। কেননা, ওই দেবদেবীর মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক আখ্যান বিভিন্ন এলাকার মানুষ শুনে দেবদেবীর কৃপা ভিক্ষা করতে সেই নির্দিষ্ট থানে উপস্থিত হয়। এর ফলে সেই দেবদেবীর থান যেমন শক্ত ভিত পায় ও দেবদেবী আরও ভক্ত সমাগমের ফলে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলার দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে মৌখিক আখ্যান প্রচলিত তা নানা বিষয়ের সমবায়ে প্রচারিত বা প্রচলিত। এই সমস্ত আখ্যানে কেবলমাত্র দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয় না। আমরা যদি এই সমস্ত আখ্যানের থেকে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক ছদ্ম আড়ালকে সরিয়ে দেই তাহলে এই সমস্ত আখ্যানের

মধ্যে বাংলার সামাজিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও মানুষের প্রতিদিনের যাপনচিত্রকে প্রকাশিত হয়। লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক এই সমস্ত আখ্যানে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনা গভীরভাবে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সময়ে যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নানা সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মসূচি দেখতে পাই কিন্তু লোকায়ত মানুষের এই ধর্মীয় পরিসরে, তাদের মৌখিক সাহিত্যে পরিবেশ রক্ষা করার মানসিকতা গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলার নিম্ন-গাঙ্গেয় অঞ্চলে দেবদেবীকে নিয়ে যে সমস্ত আখ্যান প্রচলিত আছে তাতে নানা বিষয়ের সমাবেশ হতে দেখা যায়। এই সমস্ত আখ্যানগুলিতে বাংলার সমাজ ইতিহাস, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসকে ধারণ করে আছে। আমরা লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আখ্যান পাব তাতে লোকায়ত মানুষের নানা অভিপ্রায় ধরা থাকে। লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে যে সমস্ত আখ্যান প্রচলিত আছে তার মধ্যে অধিকাংশ কিংবদন্তি। এছাড়াও লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া আখ্যানে লোকপুরাণ থেকে শুরু করে নানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ফলে কিংবদন্তির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে প্রথমেই বুঝে নিতে হয়। কিংবদন্তি বলতে আমরা কী বুঝি? অভিধানের দিকে তাকালে কিংবদন্তির সম্পর্কে বলা আছে—

> জনরব, জনশ্রুতি, লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কথা[২০]

কিংবদন্তিকে আমরা জাতির ঐতিহ্য, আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। কিংবদন্তি তাই বলে সব রকমের কথা বা শ্রুতির মধ্য দিয়ে নির্মিত হয় না। কিংবদন্তি হতে গেলে তার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ঘটনাটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঘটতে হবে। এই প্রসঙ্গে Stith Thomson যথাযথ বলেছেন—

> this form of tale purports to be an account of an extra ordinary happening believed to have acutual occurred. It may recount a Legend of somoe thing which happended in ancient times at a particular place- A Legend which has attached itself to that locality, but which will probably also be told with equal conviction of many other place, even in remot parts of the world.[২১]

আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে কিংবদন্তিতে অতীত যেমন থাকে তেমন বর্তমান সমান ভাবে যুক্ত থাকে। কিংবদন্তি আসলে লৌকিক অলৌকিকের সঙ্গে সত্য মিথ্যার মিশেলে কাল্পনিক কাহিনি যা কিনা

লোককথার রূপ পেয়েছে। কিংবদন্তি সম্পর্কে বরুণ কুমার চক্রবর্তীর মতামত এইক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক—

> বিশেষ অঞ্চলে সংঘটিত কোনো ঘটনা অথবা কোনো চরিত্রকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র আখ্যান যখন সেই অঞ্চলে মানুষ প্রজন্ম পরম্পরায় মনে রাখে এবং বিশ্বাস করে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার উত্তরাধিকারত্ব রেখে যায়, লোককথার লক্ষণাক্রান্ত, ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট মূলতঃ আচারাদির সঙ্গে অসম্পৃক্ত এবং ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভে অঙ্কিত বিষয়কেই আমরা কিংবদন্তি বলে অবিহিত করতে পারি।[২২]

কিংবদন্তি অনেক প্রকারের হতে পারে পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর *লোকসংস্কৃতি সীমানা ও স্বরূপ* গ্রন্থে কিংবদন্তির বিভাজন করেছেন তা মোটামুটি এইরকম—(ক) ধর্মীয় (খ) ধর্ম নিরপেক্ষ এবং (গ) আঞ্চলিক (ঘ) বৃহৎ সংস্কৃতিক বলয়। এছাড়াও আমরা এই বর্গকে আরও কতগুলি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি যেমন কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া কিংবদন্তি। কোনো স্থান ও ঘটনাকে কেন্দ্রকে করে তৈরি হওয়া কিংবদন্তি। সব মিলিয়ে কিংবদন্তিকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি— (ক) ব্যক্তি নির্ভর, (খ) স্থান নির্ভর এবং (গ) বস্তু নির্ভর। লৌকিক দেবদেবীর আখ্যানকে কিংবদন্তি বা মিথ যার আওতায় পড়ুক না কেন এই আখ্যানের বিরাট কলেবরে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে থেকে বিভিন্ন বিষয়কে ধারণ করে আছে। কিংবদন্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শীলা বসাক তাঁর *বাংলার কিংবদন্তি* গ্রন্থে যে বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ—

১) নির্দিষ্ট কোনও স্থান, নির্দিষ্ট কোনও সময় বা কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিংবদন্তির উদ্ভব।

২) বীরগণ কিংবদন্তির নায়ক। এরা অলৌকিক বা অতিলৌকিক চরিত্র রূপে অত্ম প্রকাশ করে থাকে।

৩) অতীত এবং বর্তমান কিংবদন্তির মূল উপজীব্য যা প্রজন্ম পরম্পরায় বিশ্বাস করে।

৪) কিংবদন্তিতে আছে সত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিচিত্র জনশ্রুতি, সমাজ জীবনের প্রতিবিম্ব, মানসিকতার বাস্তব ছায়া এবং লোক কল্পনা প্রভৃতি।

৫) লোক সমাজের সামাজিক প্রয়োজনে, ধর্মীয় তাগিদে, এমনকি আনাবিল আনন্দ লাভের কামনায় কিংবদন্তি সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬) কিংবদন্তির মূল উদ্দেশ্য লোককথার মাধ্যমে গল্পরস বিতরন।

৭) পাশাপাশি দুটি ভাবের সহাবস্থান কিংবদন্তিতে পরিস্ফুটিত হয়।

৮) মৌখিক ঐতিহ্য কিংবদন্তির মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা এর গতিশীলতাকে নিরূপন করে।

৯) কিংবদন্তি বিশেষ কোন কল্পনা প্রবন মনের সৃষ্টি নয়। একটি সাধারণ মনের সৃষ্টি।

১০) কিংবদন্তি বাস্তব ও কল্পিত ঘটনার সংমিশ্রণে গঠিত খণ্ড খণ্ড অবয়ব।

১১) কিংবদন্তি ইতিহাসের মতো।

১২) কিংবদন্তির বহিরঙ্গে বহু পরিবর্তন ঘটে এবং কালে কালে তার অবয়বে কল্পনার রং লাগে।

১৩) কিংবদন্তি আকারে ক্ষুদ্র।

১৪) কিংবদন্তির একটি নিজস্ব গঠন আছে।

১৫) কিংবদন্তি যাকে ঘিরে সৃষ্টি হয় সেই ঘটনাস্থল, ব্যক্তি বা বস্তুকে স্বচক্ষে দেখা।

১৬) কিংবদন্তি লোকায়ত জীবনের যথার্থ ইতিহাস বা ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ।

১৭) কিংবদন্তিতে অলৌকিকতা বা অতিরঞ্জনের প্রভাব ক্রিয়াশীল।

১৮) কিংবদন্তিতে গল্প শোনার আগ্রহে বিবৃত হয় না, বরং কৌতূহল নিরসন হয়।

১৯) কিংবদন্তিতে লোকবিশ্বাস ও সংস্কার লুকিয়ে থাকে।

২০) কিংবদন্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক হয়।

২১) কিংবদন্তির কাহিনি বা ঘটনা সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন এগুলিকে লোকে বিশ্বাস করে।

কিংবদন্তির যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমরা পেলাম বাংলার লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া আখ্যানগুলিও একই রকম কথা বলে। লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক আখ্যানগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে, আখ্যানগুলি কোনো না কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করেছে। এই সমস্ত আখ্যানগুলিতে মানুষের আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া

আখ্যানগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে, এর কাহিনির মধ্যে অলৌকিক বা অতিলৌকিক ঘটনার প্রাধান্য বেশি। লোকায়ত মানুষের প্রতিদিনের জীবনের যাবতীয় বিশ্বাস-সংস্কার এই কাহিনিগুলির মধ্যেই ধরা থাকে। আমরা আখ্যানগুলি যতই অতিলৌকিক হোক না কেন বা এর কাহিনি যতই অতিরঞ্জিত হোক না কেন লোকায়ত মানুষ এগুলিকে অবিশ্বাস করে না। বরং পরম বিশ্বাসে এগুলি শোনে ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা প্রবাহিত করে। এই আখ্যানগুলির মধ্যে বাংলার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস ধরা আছে। ফলে বাংলার ইতিহাস পাঠে এই সমস্ত আখ্যান ইতিহাসের বিকল্প উপাদান হতে পারে। আমরা এবার লৌকিক দেবদেবীর থানকে ঘিরে তৈরি হওয়া আখ্যানের ধরন-ধারণ সম্পর্কে জেনে নেব—

(ক) থানের উৎপত্তি সম্পর্কিত আখ্যান— আমরা এই মৌখিক আখ্যনগুলিতে সবার প্রথমে দেখতে পাই থানের উৎপত্তি সম্পর্কিত কাহিনি। অর্থাৎ থানটি কীভাবে তৈরি হল এবং সেই তৈরির ইতিহাসে কোনো দৈব নির্দেশ, জমিদারের হস্তক্ষেপ আছে কিনা? আমরা দেখতে পাই এই সমস্ত আখ্যানগুলি ইতিহাসের বিরাট কালপর্বকে নিজের আখ্যান বস্তুর মধ্যে ধারণ করে। আখ্যানগুলিতে থান উৎপত্তি সংক্রান্ত নানা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। যেখানে কোনো জমিদার দেবদেবীর স্বপ্ন পেয়ে থান তৈরি করেন। এই দেবদেবী স্বপ্ন দিয়ে ওই ব্যক্তিকে বলেন তাঁর অবস্থানের জায়গা ও সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করার কথা। আমরা এই সমস্ত আখ্যানগুলিতে দেখতে পাই যে, ওই জমিদার বা ব্রাহ্মণ স্বপ্ন পেয়ে দেবদেবীর উল্লেখিত স্থানে গিয়ে কোনো পাথর খুঁজে পান যা ওই দেবদেবীর বিগ্রহ স্বরূপ। এরপরে সেই দেবদেবীর থান সেখানে তৈরি হয় এবং সেই দেবদেবীর পূজার প্রচলন হয়। এই সমস্ত আখ্যানে আমরা দেখতে পাই বাংলার রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক সমাজ বাস্তবতাকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, এই সমস্ত আখ্যানগুলিতে মানুষের কল্পনা ও বাড়িয়ে বলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আসলে লোকায়ত সমাজে এই সমস্ত দেবদেবীর প্রভাব অপরিসীম আর সেই কারণে লোকায়ত মানুষ দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য জমিয়ে গল্পের আসর বসাতো। এখানে বক্তা স্মৃতিকে ভর করে কাহিনি বলে যেতেন। এবং শ্রোতা ও বক্তা কেউই সংক্ষেপের পাশ দিয়ে যেতেন না। ফলে পূর্বপুরুষদের মুখে শোনা কাহিনিতে বক্তার নিজস্ব কল্পনা ও নানা বিষয়ের সংযোজন করত। আমরা তাই লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে প্রচলিত আখ্যানগুলিতে বাস্তবতার অভাব দেখতে পাই। লৌকিক

দেবদেবীর উৎপত্তি সংক্রান্ত আখ্যানে যেমন জমিদার, পুরোহিত জড়িয়ে আছেন। তেমন করে দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আখ্যানে মঙ্গলকাব্যের ধনপতি সদাগরের ভূমিকা প্রবলভাবে আছে। আমরা সবাই জানি যে চৈতন্যদেব নীলাচলে গিয়েছিলেন এই আদিগঙ্গার প্রবাহ দিয়ে। চৈতন্যদেবের এই গঙ্গার প্রবাহ দিয়ে যাওয়ার কারণে অনেক কিংবদন্তি গড়ে ওঠে এবং চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রবাহে অনেক লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরি হয় যার কাহিনি আজও লোকায়ত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে। আমরা দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক আখ্যানে দেখতে পাই যে, চৈতন্যদেব গঙ্গার দুই পাড়ে দেবদেবীর পুজো করেন। তিনি যে যে স্থানে পুজো করেন সেখানে সেই দেবদেবীর থান তৈরি হয়েছে। বর্তমানে সেই সমস্ত থানে চৈতন্যদেবের স্মৃতি নিয়ে অসংখ্য আখ্যান তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত আখ্যান প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয়েছে; তাতে নানা কাহিনির সংযোজন হয়েছে। এই সংযোজন লোকায়ত মানুষের পূজিত দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিস্তারের পথ প্রসারিত করেছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এই সমস্ত আখ্যানগুলিতে ইতিহাসের বিস্তৃত কালপর্বকে নিজের গর্ভে ধারণ করে আছে। চৈতন্যদেবের দ্বারা এই সমস্ত থান তৈরি হওয়া ও দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা চৈতন্যদেবের হাতেই কিনা তা তর্ক সাপেক্ষ। লোকায়ত মানুষ এই সমস্ত সত্যতার যাচাই করে না। নিজের পূজিত দেবদেবীর জন্য তারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ঘটনা বা কাহিনির অনুপ্রবেশ হামেশাই করে থাকে। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা দক্ষিণ বারাশতের উল্লেখ করতে পারি। আমরা বারাশতের স্টেশনের কাছে বারা ঠাকুরের থান পাব। এই থান উৎপত্তির আখ্যানে বলা হয়েছে যে, শ্রীমন্ত সওদাগর পিতার খোঁজে সিংহল যাত্রার সময় এখানে একশত বারামূর্তি পুজো করে। এখান থেকেই এই স্থানের নাম হয় বারাশত। এবং এই স্টেশনের পাশে সেই প্রাচীন থানটি আছে। এছাড়া আমরা আরও একটি থানের উৎপত্তি ও তাকে কেন্দ্র করে আখ্যানের উল্লেখ করব। আমরা দক্ষিণবঙ্গের চক্রতীর্থ বলে স্থানের নাম চৈতন্য ভাগবত পাঠের মধ্য দিয়ে জানতে পারি। সেখানে চৈতন্যদেব নীলাচলে যাওয়ার সময় এখানে পথ হারিয়ে ফেলেন ও বিষ্ণু তাঁর চক্র দ্বারা সেই পথ নির্দেশ করেন। সেখান থেকেই এই স্থানের নাম হয় চক্রতীর্থ। এই কাহিনি ও চৈতন্যদেবের অবস্থানের মধ্য দিয়ে এখানে শৈবতীর্থ তৈরি হয়েছে। এই শিবের তীর্থ হওয়ার কারণ হিসেবে আমরা আখ্যান থেকে জানতে পারি এখানে চৈতন্যদেব গঙ্গার

জলে শিবের লিঙ্গ পান ও এখানেই তিনি তার প্রতিষ্ঠা ও পুজো করেন। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, চৈতন্যদেব বাংলার লৌকিক দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

লৌকিক দেবদেবীর থান ও তার উৎপত্তি নিয়ে নানা রকমের আখ্যান প্রচলিত আছে। লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরি হওয়া নিয়ে যে সমস্ত আখ্যান প্রচলিত আছে তাতে থান তৈরি হওয়ার কারণগুলি হল—

১) কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তির দ্বারা থান তৈরি ও পূজার প্রচলন।

২) কোনো দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ পাওয়া ও তার ফলে থান তৈরি হয় এবং তাকে কেন্দ্র করে আখ্যান তৈরি হয়।

৩) লোকায়ত মানুষের কোন কিছু প্রাপ্তি ও সেই পাওয়াতে দৈবঅনুগ্রহ আছে বলে ধরে নেওয়া। এরপর সেই ব্যক্তির দ্বারা থান প্রতিষ্ঠা করা।

৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে দৈব-সহায়তায় রক্ষা পাওয়া ও থানের নির্মাণ।

৫) পতিত জমি বা বনজঙ্গলের মধ্যে থেকে কোনো পাথর বা শিলাখণ্ড পাওয়া ও তাকে দেবতা মনে করে সেখানেই থান তৈরি হয়। জঙ্গল কাটার সময় থান তৈরি হলে তাকে জঙ্গলকাটির থান বলে।

৬) মানুষের সন্তান না হওয়া ও দেবদেবীর কাছে মানত করা ও সন্তান লাভ। এই সন্তান লাভের ফলে ওই ব্যক্তি থান তৈরি করে। এই সন্তান লাভ ও থান তৈরি নিয়ে লোকায়ত সমাজে অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে।

৭) বাংলায় শিবের থান তৈরি হওয়ার পিছনে অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনি হল যে, কোনো দুগ্ধবতী গাভী দুধ মানুষকে না দিয়ে কোন পরিত্যক্ত মাঠের নির্দিষ্ট জায়গায় আপনা থেকেই দুধ দিচ্ছে। পরে মানুষ জানতে পারে সেখানে শিবলিঙ্গ আছে। মানুষ সেই শিবলিঙ্গকে তুলে সেখানেই থান তৈরি করে।

৮) জমির শস্য পাহারা দেওয়ার জন্য জমির বাঁধের কাছাকাছি নির্দিষ্ট দেবতার থান তৈরি করা হয়। এবং এই থানকে নিয়ে বহু আখ্যান প্রচলিত আছে।

৯) লোকায়ত সমাজে বিভিন্ন মারণ রোগ থেকে দেবদেবীর আশীর্বাদে সুস্থ হয়। গ্রামের মানুষ এই দৈবী অনুগ্রহে শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভরে লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরি করে।

১০) জীবন ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবী। লোকায়ত মানুষের জীবিকার অনেকাংশে নির্ভর করে এই সমস্ত দেবদেবীর উপর। লোকায়ত সমাজ তাদের জীবিকার জন্য থান তৈরি করে।

(খ) বিগ্রহ-সংক্রান্ত আখ্যান— দক্ষিণবঙ্গের আদিগঙ্গার দুই পাড় বরাবর যে সমস্ত থান পাওয়া যায় তার বেশিরভাগ থানেই দেবদেবীর বিগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা এই সমস্ত থানে দেবদেবীর মাটির মূর্তি বেশি দেখতে পাই। কিন্তু বেশিরভাগ থানে দেবদেবীর মূর্তি নেই, পাথরের বিগ্রহ আছে এবং লোকায়ত মানুষ সেই পাথরকেই পুজো করে। এছাড়াও থানে মাটির ঢিবি, পাথর থেকে শুরু করে গাছকে লোকায়ত মানুষ নির্দিষ্ট দেবদেবী মনে করে পুজো করে। এই সমস্ত বিগ্রহ, মূর্তির উত্থান ও তার প্রতিষ্ঠা নিয়ে বাংলার লোকসমাজে প্রচুর আখ্যান প্রচলিত আছে। আমরা উদাহরণ হিসেবে বোড়ালের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের উল্লেখ করতে পারি—

> এই খনন কালে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। স্তুপ মধ্য হইতে ধুপ ধূনার দিব্য গন্ধ বাহির হয় ও দেবী কতিপয় ভক্তকে ও খননকারী ধাড়ঙ্গকে সাক্ষাত দর্শন দেয়।[২৩]

দেবদেবীর বিগ্রহ নিয়ে এমন অসংখ্য আখ্যান বাংলায় প্রচলিত আছে। আমরা উদাহরণ হিসেবে আর একটি মন্দিরের উল্লেখ করব। ময়দার পাতালভেদী কালী মন্দিরে বিগ্রহ সম্পর্কে এমন একটি আখ্যান হল—

> এক সময়ে এই জায়গা দিয়ে আদি গঙ্গা প্রবাহিত হত। যেস্থানে মন্দিরটি আজ অবস্থিত সুদুর অতীতে এই স্থানটি জঙ্গলে ভর্তি ছিল। আর এর পাশেই আদি গঙ্গা বয়ে চলত। একদিন ঐ গঙ্গা দিয়ে এক মাঝি নৌকা নিয়ে যাওয়ার সময় শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছিল। ঐ সময় ওই সময় জঙ্গল থেকে এক বালিকা বলে উঠল ‘ ওরে মাঝি ফিরে গা’। মাঝি বলল ‘ সাধ থাকে তো ফিরে চা’। মাঝি আবার গান গায় কিন্তু সেই বালিকাকে আর দেখা যায় না। তারপর রাত্রে স্বপ্নে একটি পাতালভেদী শিলা পান ও সেখান থেকে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।[২৪]

লৌকিক দেবদেবীর বিগ্রহ সংক্রান্ত একটি প্রচলিত কাহিনি হলো-

এক রাখাল এই জঙ্গলে ভর্তি জায়গায় গরু চরাত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গাভীগুলির মধ্যে একটি গাভীর দুধ পাওয়া যেত না। একদিন গাভীর মালিক সন্দেহ করে ওই গাভীটিকে অনুসরণ করে ও দেখে যে জঙ্গলের একটি জায়গায় গাভীটির বাঁট থেকে আপনা হতেই দুধ বের হচ্ছে। তখন গাভীর মালিক স্বপ্ন পান ও ঐ জায়গাটি খুঁড়ে একটি শিলাখণ্ড পায় ও তিনি ওই মন্দির তৈরী করেন।[২৫]

আমরা লৌকিক দেবদেবীর বিগ্রহ নিয়ে এমন অনেক আখ্যান পাওয়া যায়। এখানে বলে রাখা দরকার যে, লোকায়ত মানুষ এই সমস্ত থানকে দেবীর একান্নপীঠের একটি পীঠ বলে চালিয়ে দেয়। এখানেও লোকায়ত মানুষের নিজের থান ও দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে বলে মনে হয়।

দেবদেবীর বিগ্রহ সংক্রান্ত আখ্যানের মধ্যে একটি পরিচিত আখ্যান হল দেবদেবীর বিগ্রহ কথা বলে। অর্থাৎ আমরা এমন বহু কাহিনি পাব যেখানে সেবায়ত বা পূজারির সঙ্গে রাত্রে দেবদেবী কথা বলছে বা দেবদেবী ইশিরা বা ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে ভক্তকে বার্তা প্রেরণ করছে। এছাড়াও আমরা বহু আখ্যানে দেখতে পাই দেবদেবী মানুষের শরীর ধারণ করে মানুষের সঙ্গে কথা বলছে বা রাত্রে নিজের বাহনের উপর চড়ে গ্রাম পাহারায় বেরিয়েছে। এই রকম আখ্যান বাংলার প্রতিটি থানেই প্রচলিত আছে।

লৌকিক দেবেদেবীকে নিয়ে প্রচলিত আখ্যানের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ও জনপ্রিয় আখ্যান হল দেবীর শাঁখা পরার ইচ্ছে হওয়া। দেবী শঙ্খ পরিধানের জন্য কোনো পুরোহিত, জমিদার বা সেবায়তের কন্যার রূপ ধারণ করে ছলনা করে। দেবী দূর্গার শঙ্খ পরিধানের আখ্যান আমরা সবাই জানি। কিন্তু লোকায়ত সমাজে এই পৌরাণিক কাহিনিকে পূর্ননির্মাণ করেছেন। এই সমস্ত গ্রামীন মানুষ নিজের মতো করে পৌরাণিক আখ্যাণগুলিকে নিজের দেবদেবীর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সেই কাহিনিকে লোকায়ত স্তরে এনেছেন—

আমার আপন জ্যাঠাবাবু, ভুতনাথ পাকড়াশী উনি দুপুরে ঘুমতেন। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা এক শাঁখারি এসে বলে আপনার মেয়ে একজোড়া শাঁখা পরেছে, কিন্তু টাকা দেয়নি। সে আমায় বলল যে আমার বাবা ওখানে আছে আর বলল যে লক্ষী ঝাপিতে এক টাকা আছে দিয়ে দিতে। জ্যাঠামশাই বলল কিন্তু আমার তো কোনো মেয়ে নেই। শাঁখারি বলল বাঃ! আমায় যে বলল আপনার নাম আর কোথায় টাকা আছে তাও বলে দিল, আপনি দেখুন না লক্ষীঝাপিতে। তখন জ্যাঠাবাবু গিয়ে দেখে যে সত্যি এক টাকা আছে। তারপর জ্যাঠাবাবু বলল কোথায় তোর থেকে শাঁখা পরেছে? শাঁখারি তখন বলল যে এই পুকুরের কাছে বসে পরেছে। আর ওই পুব দিকে চলে গেছে। তখন জ্যাঠাবাবু থানে গিয়ে দেখে যে মায়ের হাতে সত্যি শাঁখা পরা।[২৬]

দেবদেবীর বিগ্রহ সংক্রান্ত আর একটি আখ্যান হল, দেবদেবীর মাঠ থেকে শাক চুরি করে নিয়ে আসার কাহিনি। আমরা একই থানে এই রকম ঘটনা ঘটতে দেখি—

> গ্রামের একদিকে মুসলমানরা কড়াই চাষ করত। মুসলমানরা দেখে যে প্রতিদিন কে শাক চুরি করে নিয়ে যায়। একদিন দুপুরবেলা দেখে যে কে একজন লালপেড়ে শাড়ী পরে একটি বউ ঘোমটা দিয়ে শাক তুলছে। তখন মুসলমানেরা তাড়া করেছে। তখন তো এখানে দোকান হয়নি, চারদিকে মাঠ ও সরু রাস্তা। বউটি সেই রাস্তা দিয়ে দৌড় দিয়ে এসে ওই থানের কাছে এসে মিলিয়ে গেছে। তখন সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করল, কিন্তু কোথাও পেল না। তখন সবাই থানের মধ্যে গেল, গিয়ে দেখে বেদীর উপরে কড়াই শাক ছড়ানো আর সেই শাড়ি পরা সেই মেয়ে। সেখান থেকে মায়ের পুজোতে ওই কড়াই শাক দিয়ে যায়।[২৭]

আমরা দেখতে পাই লৌকিক দেবদেবী বিশেষত দেবী কোনো ব্যক্তির ক্ষেত থেকে শাক চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় এবং সেই ব্যক্তি দেবীর পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে দেখে দেবী ঠিক থানটির কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়। এবং দেবীর মূর্তির একটি হাতে শাকের গুচ্ছ ও দৌড়ে আসার জন্য দেবীর বস্ত্র ছেঁড়া। আমরা এই সমস্ত আখ্যানের মধ্যে এইরকম ক্রম দেখতে পাই।

(গ) দেবদেবীর পূজা সংক্রান্ত আখ্যান— বাংলার লৌকিক দেবদেবীর পূজা নিয়েও প্রচুর আখ্যান প্রচলিত আছে। আমরা জানি যে, এই সমস্ত দেবদেবীর পূজার দিন ও সময় নির্দিষ্ট আছে। সাধারণত এই সমস্ত দেবদেবীর পুজোর দিন শনি ও মঙ্গলবারের মধ্যে হয়ে থাকে। দেবদেবীর পূজা সংক্রান্ত আখ্যানে যে সমস্ত বিষয়গুলি উঠে আসে—

১) পূজায় বলিদান বন্ধ হওয়া নিয়ে আখ্যান তৈরি হয়।

২) পূজা নিয়ে প্রচলিত আখ্যানে আমরা দেখতে পাই পূজার দিনে বা পূজার সময়ে কোন ফুল ফুটবে এবং এটা ঐতিহ্য পরম্পরায় ঘটে আসছে। এই ফুল ফোটার মধ্য দিয়ে দেবদেবী পূজো শুরুর সংকেত পাঠায় বলে লোকায়ত মানুষ বিশ্বাস করে।

৩) পুজোর দিনে ফুল ফোতার মতো কোন নির্দিষ্ট প্রাণী বা পাথরের আবির্ভাব হয়।

৪) পুজোর দায়িত্বে কোন পুরোহিত থাকবে সেই নিয়ে বিবাদ ও সমাধান নিয়ে আখ্যান।

৫) পুজোর সময়ে ত্রুটির ফলে অলৌকিক ঘটনা ঘটে ও সেই নিয়ে আখ্যান তৈরি হয়।

লোকায়ত সমাজে লৌকিক দেবদেবীর পুজো নিয়ে আখ্যানের বিষয় মোটের উপর এমনই হয়ে থাকে। এই সমস্ত আখ্যানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য আখ্যান হল, পুজোর দিনে নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফুল ফোটা। এবং সেই ফুল দিয়েই দেবদেবীর পুজোর আরম্ভ হয়। এই ফুল ফোটার কারণ হিসেবে

লোকায়ত সমাজ মনে করে ঐ ফুল দেবদেবী ভালোবাসে। আবার কোনো কোনো থানে দেখতে পাই যে, পূজার দিনে নির্দিষ্ট সময়ে কোনো প্রাণীর দেখা দেওয়া। আমরা মগরাহাটের দ্বীপচণ্ডীর থানে প্রচলিত আখ্যানে দেখতে পাই যে, থানটি যে গাছের তলায় আছে বাৎসরিক পুজোর দিনে সেই গাছে দুইটি সাদা ইঁদুর দেখা দেয়। এই ঘটনার কার্য-কারণ কী তা লোকায়ত সমাজ জানে না। আসলে লোকায়ত সমাজের কাছে এই ঘটনা জাদু-বিশ্বাসের মতো কাজ করে। গ্রামীন মানুষ মনে করে এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে শুভ কিছু ঘটবে। আমরা জানি যে, লৌকিক দেবদেবীর বর্তমানে থান বা মন্দির যতই সুদৃশ্য হোক না কেন এবং বিগ্রহে যতই আধুনিকতার প্রলেপ পড়ুক লোকায়ত, সমাজ সবার আগে আদি থান ও আদি বিগ্রহকে পুজো করে। এই প্রথা বা এই রীতির যদি ব্যতিক্রম হয় তাহলে মানুষকে দেবদেবীর কোপে পড়তে হয়। আমরা এমন অনেক আখ্যান পাই যেখানে আদি বিগ্রহে পূজা না করে নতুন বিগ্রহ পূজা করার ফলে পুরোহিত থেকে শুরু করে কারোর না কারোর উপর দেবদেবীর কোপ পড়েছে। এবং সেই পূজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত আখ্যানের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের তাদের ঐতিহ্য বা মূলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির মানসিকতা প্রকাশ পায়। আমরা জানি এই সমস্ত দেবদেবীরা স্বভাবতই রাগী হয়। এদের প্রতি মানুষের কোনো শ্রদ্ধা ও ভক্তির ত্রুটি হলে নেমে আসে অভিশাপ। ফলে মানুষ এদের নিয়ে সর্বদা সচেতন থাকে। এই কারণে লৌকিক দেবদেবী ও তাদের কোপ নিয়ে অসংখ্য আখ্যান তৈরি হয়েছে। বর্তমান সময়ে দেবদেবীর থানে আদিম ও কৌম্য সমাজে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ছিল তা অনেক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। কিছু বছর আগে পর্যন্ত যে সমস্ত প্রথা ছিল এই সমস্ত দেবদেবীর পূজার অনিবার্য শর্ত, আজকের সময়ে এসে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই প্রথা বন্ধ হওয়া নিয়েও অনেক আখ্যান পাই। আমরা জানি এক সময় এই সমস্ত থানে বলি প্রথা ছিল অনিবার্য। কিন্তু বর্তমানে তা আর হয় না। এই বলি বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট কারণ জানা যায় না। কিন্তু এই বলি বন্ধ হওয়া নিয়ে অনেক কাহিনি লোকসমাজে প্রচলিত আছে।

(ঘ) দেবদেবীর কৃপা বা কোপ সংক্রান্ত আখ্যান— লোকায়ত সমাজ তাদের পূজিত দেবদেবীর উপর জীবনের সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে। গ্রামীন সমাজ তাদের খারাপ ও ভালো সমস্ত কিছুর দায়িত্ব এই সমস্ত দেবদেবীর উপর দিয়ে দিন অতিবাহিত করে। এই সমস্ত মানুষের নিত্য সহায় যেহেতু এই দেবদেবী ফলে এই সমস্ত মানুষের উপর এই দেবদেবীর যেমন কৃপাদৃষ্টি পড়ে তেমন

আবার এরা দেবদেবীর রোষানলে পড়ে। দেবদেবীর কৃপা ও রোষের যে ধরণ আখ্যানে ধরা পড়েছে, তাহল—

১) কোনো ভক্ত দেবদেবীর কৃপায় আর্থিক স্বাছন্দ্য লাভ করেছে যেমন কোনো ব্যবসা বা চাকরি লাভ করেছে আর সেই নিয়ে আখ্যান তৈরি হয়েছে।

২) দেবদেবীর কৃপায় রোগ মুক্তি হয়েছে। এছাড়া এই সমস্ত দেবদেবীর কৃপায় মানুষ সন্তান লাভ করেছে এমন বহু কাহিনি গ্রামীন সমাজে প্রচলিত।

৩) দেবদেবী মানুষের রূপ ধারণ করে কারোর গাড়ী বা নৌকায় চেপে যাতায়াত করছে এমন ঘটনা আমরা লোকায়ত সমাজে প্রচুর দেখতে পাই। আর এই দেবদেবী যানবাহন থেকে চলে যাওয়ার সময় সেই ব্যক্তিকে কৃপা করে সম্পত্তি বা আর্শীবাদ করেছে, আর ফলে সেই ব্যক্তির জীবন পাল্টে গিয়েছে।

৪) দেবদেবীর কৃপায় কারোর হারিয়ে যাওয়া বস্তু বা প্রাণী খুঁজে পাওয়া আর এই ঘটনা নিয়ে আখ্যান তৈরি হয়।

৫) মঙ্গলকাব্যে আমরা যেমন দেখতে পাই যে, কোনো ব্যক্তি দেবদেবীর বশ্যতা স্বীকার না করার ফলে সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে ও শেষে দেবীর পূজার প্রচলন করে তেমনি আমরা এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, গ্রামীন কোনো ব্যক্তি এই দেবদেবীকে মানছেন না বা ভক্তি করে না। এই ব্যক্তি দেবদেবীর কোপে পড়ে ও শেষে সেই ব্যক্তি দেবদেবীর বশ্যতা স্বীকার করে।

৬) বাংলার ধর্ম-সমন্বয়ের জন্য এই সমস্ত দেবদেবীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। হিন্দু-মুসলমানের দ্বারা যৌথভাবে পূজা করা নিয়ে অনেক আখ্যান এই দেবদেবীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে। আমরা দেখেছি যে এক ধর্ম বিশ্বাসের মানুষ অন্য ধর্মের দেবদেবীকে অসম্মান করে ও সেখান থেকে ধর্মের সংঘাত তৈরি হয়। কিন্তু এই লৌকিক দেবদেবী যৌথভাবে হিন্দু ও মুসলমানের দ্বরা পূজিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর অন্যথা হলে দেখা যায় যে দেবদেবীর রোষে তাদের পড়তে হয় ও শেষে সবাই একত্র হয় পূজা করে। বাংলার লোকায়ত সমাজে এই ধর্মের সংঘাত ও দেবদেবীর হস্তক্ষেপে তার সমন্বয় নিয়ে বহু আখ্যান প্রচলিত আছে।

৭) আমরা দেখেছি যে, লৌকিক দেবদেবীর থান সব সময় বড় বৃক্ষের নীচে অবস্থিত হয়। এই গাছগুলিকেও মানুষ দেবদেবী জ্ঞানে পুজো করে। কোনো মানুষ যদি এই বৃক্ষের ক্ষতি করে তাহলে সেই ব্যক্তির উপর দেবদেবীর রোষ পড়ে ও তার সমূহ বিপদ ঘটে। লোকায়ত সমাজে দেবদেবীর থানের পাশে অবস্থিত বৃক্ষের ক্ষতিকে নিয়ে প্রচুর কাহিনি প্রচলিত আছে।

৮) গ্রামীন সমাজে 'ভর' হওয়া একটি অলৌকিক ঘটনার মধ্যে পড়ে। কোন ব্যক্তির উপর ভর পড়াকে সেই ব্যক্তির উপর দৈব-আশীর্বাদ আছে বলেই ধরা হয় আর এই নিয়ে গ্রামীন সমাজে অসংখ্য আখ্যান প্রচলিত আছে।

আমরা জানি যে লোকায়ত সমাজ কোনো কিছু প্রাপ্তিকে দেবদেবীর অনুগ্রহ বলে মনে করে। আবার কোন ক্ষতি হলে দেবদেবীর কোপ বলে মনে করে। ফলে এদের জীবনের সমস্ত উত্থান-পতনের সঙ্গে দেবদেবীর প্রভাব যুক্ত থাকে বলে মনে করে। আমরা দৈব-অনুগ্রহ নিয়ে একটি কাহিনির উল্লেখ করব—

> আমাদের এই থানের পাশেই আটেশ্বরের থান আছে। সবাই বলে কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে ওই থানে গিয়ে মানত করলে তা নাকি পাওয়া যায়। আমার নিজের একবার পয়সা হারিয়ে গিয়েছিল। আমি বাবা আটেশ্বরের কাছে গিয়ে মানত করলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম যে বাবা বলছে তুই তো টাকা নিয়ে আসিসনি ব্যাঙ্ক থেকে, তুই চিন্তা করিস না ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখ তোর টাকা ঠিক আছে। আমি গিয়ে দেখি সত্যি ম্যানেজার আমার টাকা সরিয়ে রেখেছে। আমি তখন আটেশ্বরের কাছে এসে গাঁজা ও কিছু উপকরণ দিয়ে পুজো করলাম।[২৮]

লৌকিক দেবদেবীর কৃপায় মানুষের হারিয়ে যাওয়া বহু জিনিস ফিরে পাওয়ার আখ্যান প্রচলিত আছে। তেমন একটি আখ্যান হলো-

> একবার আমার নাতনির কানের মাকড়ি চলে যায়। সে গিয়ে আটেশ্বরের কাছে মানত করে। তারপর সে নিজেই বলল যে কলতলার ড্রেনে মাকড়ি পড়ে আছে। আমরা সবাই বললাম তুই কী করে জানলি? ও তখন বলে কে যেন মাথায় পাগড়ি পরা লোক এসে বলল তুই এত খোঁজাখুঁজি করছিস আর ড্রেনে পড়ে আছে দেখছিস না? পেলে পূজা দিস ভাল করে আমার নাতনি বলল কার পূজা দেব? তখন সেই লোকটা বলছে যার কাছে মানসিক করেছিস তাকে দিবি।

> আর একটি ঘটনা হল আমার জ্যাঠামশাই, তিনি অপুত্রক ছিলেন আর খুব দাপুটে ছিলেন। তিনি মদ খেতেন। তখন এই আটেশ্বরের থান একেবারে ভেঙে পড়েছিল। জ্যাঠামশাই একদিন বলছে তোর এত

টাকা আছে আমায় দিতে পারিস না? আমি তোর ঘর ভালো করে তৈরি করে দেব। সেই দিন রাত্রে উনি স্বপ্ন দেখলেন যে কেউ যেন বলছে তুই টাকা চেয়েছিস আমি দেব। সাত ঘোড়া রুপোর টাকা আছে। তোকে তার আগে আমায় দুটো নারকেল দিতে হবে। মানে দুটো ছেলেকে চাইছেন। জ্যাঠামশাই বললেন না ওটা হবে না, তার উপর আমার কোন সন্তান নেই। তখন সেই লোকটা বলল আছে তুই একবার হ্যাঁ বল না। তখন উনি রাগ করে বললেন তুই যা এখান থেকে, তোর কোন টাকার দরকার নেই। কিন্তু সে যায় না। জ্যাঠামশাই তখন রেগে মারতে যায়। তারপর সেই লোকটি বলে তুই আমায় দিলি না তো। তবে একটা কাজ কর বাড়ির পিছন দিকে একটি থলে পাবি সেই দিয়ে কিছু না কর আমার থানটা তৈরী করে দে। কত টাকা উনি দিয়েছিলেন তা আমরা জানি না। সেই টাকা দিয়ে এই থানটি তৈরী করা হয়।[২৯]

এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে লৌকিক দেবদেবীর কৃপা লোকায়ত সমাজের সমস্ত কিছুর উপর বর্ষিত হয়। আমরা আগেই বলেছি যে, গ্রামীন মানুষ বিশ্বাস করে যে তাদের সমস্ত কিছুর উপর দেবদেবীর কৃপা আছে বলে মনে করে। তাই আমরা দেখতে পাই যে এই সমস্ত মানুষের কোনো কিছু বিপদ হলে দেবদেবীর কাছেই দরবার করে। আর এই সমস্ত দেবদেবীর দ্বারাই তার সমাধান করতে চায়। আমরা আগেই বলেছি এই সমস্ত দেবদেবী স্বভাবের দিক থেকে প্রচণ্ডভাবে রাগী হয়ে থাকে। এই কারণে গ্রামীন সমাজ এই সমস্ত দেবদেবীকে খুব ভক্তিভরে পুজো করে। কেননা এদের প্রতি মানুষের কোনো অন্যায় হলে নেমে আসে দেবদেবীর কোপ। আমরা এই কোপ বিষয়ক একটি আখ্যানের উল্লেখ করব। বারুইপুরের দক্ষিণরায়ের থান নিয়ে যে কাহিনি প্রচলিত আছে তার উল্লেখ করব—

...এমনই ভাবে বনের ভিতর বাবার মহিমা কতদিন প্রচারিত ছিল কেউ জানে না। কাঠ কাটতে কাটতে একদিন বন প্রায় শেষ হয়ে গেল। দু-একজন করে মানুষ এল, বাড়ি তৈরি হল, রাস্তা তৈরি হল, ধীরে ধীরে গড়ে উঠল গ্রাম। নদী পার হয়ে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার জন্য আস্তে আরম্ভ করল এখানে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এই অঞ্চলের কথা বারুইপুরের জমিদার শ্রীমান মদনমোহন চৌধুরী শোনা মাত্রই নিজ অধিকার ভেবে জমিদারি ঘোষণা করে দিলেন এবং খাজনা আদায়ের জন্য দলবল সঙ্গে নিয়ে তিনি ভ্রমণের ছলে সেখানে যাত্রা করলেন। আসলে তিনি জানতেন না, স্বয়ং বাবা দক্ষিণেশ্বর সেখানে বনপতি হয়ে অবস্থান করছেন ঝাউগাছের তলায়। না জেনে জমিদার সেই ঝাউগাছের গোড়ায় প্রস্রাব করলেন। হঠাৎ কোথা থেকে রাশি রাশি বিষাক্ত ভিমরুল এসে জমিদার ও তার দলবলকে ঘিরে ফেলল। জমিদার এই উৎপাতের কারণ কী তা অনুধাবন করতে লাগলেন। তখন তাঁর মনে হয় এ নিশ্চয়ই কোনো দৈব বিপাকে পড়েছেন তিনি। এমত অবস্থায় জমিদার কাতরে বলেন—'আমি মূঢ় মতি, আমি কোন দোষ করলে ক্ষমা কর'। জমিদার স্তবে বাবা দক্ষিণেশ্বর তুষ্ট হন এবং তাঁকে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এমন সময় আকাশবানী হয়— 'সুন্দরবনে থাকি আমি দক্ষিণেশ্বর/ রক্ষা করি

বনপুরি হয়ে বনেশ্বর’। এই ঝাউগাছ তলে আমার বহুকাল অধিষ্ঠান। চারিদিকে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়। কিন্তু এসব ভয়কে উপেক্ষা করে যে সমস্ত জাঙ্গুলিয়ারা এসে আমার সেবা করে, আমার পূজা দেয়, তারা যেভাবে ডাকে আমি তাতেই খুশি হই এবং তারা বিপদে পড়লে তাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। আর যারা অহংকারে আমাকে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দেয় তারা কেউই আমার রোষের থেকে রক্ষা পায় না। আর তুই- ‘ঝাউগাছ তলে আমার থান ছিল/ তুই সজ্ঞানে সেখানে প্রস্রাব করলি?’ সেই কারণেই তুই কষ্ট পেলি। যদি নিস্তার পেতে চাস তাহলে এখানেই আমার পূজার প্রচার কর এবং আমার থাকার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। নীতি মধ্যাহ্নে আমার ভোগ হবে এবং সন্ধ্যায় আরতি। প্রতিদিন নিয়ম নীতি মেনে আমার ভোগের ব্যবস্থা করা হবে। মঙ্গল ও শনিবারে বিশেষ পূজা এবং হোম ও বলি দিয়ে আমার পূজা করবি। আর সমস্ত কাজের জন্য আমার প্রকৃত ভক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রী উর্ধ্বচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করবি এবং বাবা আরো বলে আমার প্রিয় ভক্ত পূজাভোগ দিয়ে নিত্য আমার গুনগান করলে তারা বংশানুক্রমে সুখে শান্তিতে থাকবে। বাবার আদেশ শিরোধার্য করে জমিদার মদন চৌধুরী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে— ‘অপরাধ ক্ষমা কর হে কৃপাময়, আমি একজন মূঢ় ব্যক্তি তাই অজ্ঞানতার কারণে আজ দিবশেষে এই ভুল করলাম। হে প্রভু প্রসন্ন হও আমার প্রতি, তব আজ্ঞা যেন যথার্থভাবে পালন করতে পারি। এরপর জমিদার সেই দিন থেকেই বন কেটে মন্দির তৈরির কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ঝাউ তলেই তৈরি হল বাবার মন্দির। বাবার কৃপাপুত্র উর্ধ্বব বাবার প্রতিষ্ঠা করলেন। আজ থেকে প্রায় ৪৫০ বছর আগে মাঘ মাসের প্রথম দিনে বাবার মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। সেই থেকে প্রচারিত হল বাবার মহিমা।[৩০]

ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে দেবদেবীর কোপ ও সেখান থেকে থান নির্মানের ইতিহাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় এই থান ও দক্ষিণরায়কে নিয়ে আরও কাহিনি আছে। যেখানে এই দেবতার কোপে জমিদারের চরম অবস্থা খারাপ হয়েছে। এছাড়া লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে গ্রামীন সমাজে কোপ-সংক্রান্ত যে আখ্যানটি প্রচলিত আছে তাতে কোনো দেবদেবীর কোপে গ্রামের পর গ্রামে কলেরা, বমি শুরু হয় যাকে মড়ক লাগা বা ‘দেবদেবীর দয়া’ বলা হয়। আর এই কারণে শীতলা ও বিবিমায়ের প্রতি গ্রামীন সমাজে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সব থেকে বেশি। লোকায়ত সমাজে পাড়ায় পাড়ায় এমন বহু আখ্যান প্রচলিত আছে।

(ঙ) থান সম্পর্কিত আখ্যান— আমরা লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আখ্যান পেয়েছি তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল থানকে ঘিরে তৈরি হওয়া আখ্যান। লৌকিক দেবদেবীর থানকে নিয়ে যে সমস্ত আখ্যান প্রচলিত আছে তাহল—

১) থানে অপরিষ্কার করে রাখার জন্য অভিশাপ সংক্রান্ত কাহিনি।

২) কাঁচা মাটির থানকে পাকা করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ। আবার থানকে পাকা করতে না দেওয়ার জন্য দেবদেবী নির্দেশ দেয়।

৩) লৌকিক দেবদেবীর থানে রাত্রিকালীন নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটে যা নিয়ে লোকায়ত সমাজে বহু লোমহর্ষক কাহিনি তৈরি হয়।

৪) থানের এলাকা নিয়ে মানুষের মধ্যে নানা বিবাদ তৈরি হয়। এই বিবাদ মেটাতে কখনও কখনও দেবদেবীর অবির্ভাব হয়। থানের জমি সংক্রান্ত বিবাদ ও দৈব সহয়তায় এর সমাধান নিয়ে অনেক আখ্যান তৈরি হয়েছে।

৫) আমরা দেখেছি যে, অনেক থান দিনের পর দিন যত্নের অভাবে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। লোকায়ত সমাজে এই থানের অবনতি নিয়ে অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে।

৬) থানের সঙ্গে বৃক্ষ ও পুকুরের সম্পর্ক অনিবার্য। থানের সঙ্গে এই বৃক্ষ ও পুকুরের সম্পর্ক নিয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে।

৪:৪ নির্বাচিত থানকেন্দ্রিক আখ্যানের পরিবেশবাদী বিশ্লেষণ

বাংলার লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আখ্যান প্রচলিত আছে তা নানা বিষয়ের সমবায়ে তৈরি হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি এই সমস্ত আখ্যানের মধ্যে লোকায়ত মানুষের মনের হদিশ পাওয়া যায়। এই আখ্যানগুলির আপাত সারল্য বা ছদ্ম আড়ালকে সরিয়ে দিলে বাংলার সামজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার সমাজ ইতিহাস নির্মানে এই আখ্যানগুলি যেমন বিশ্বস্ত উপাদান, তেমনি এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে লোকায়ত সমাজের পরিবেশ ভাবনার ধরন-ধারণকে পাওয়া যায়। আমরা জানি লোকায়ত মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক আজন্ম কালের। লোকায়ত মানুষ তার যাপনচিত্রে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই লৌকিক দেবদেবীকে পূজাচার ও আখ্যানের মধ্যে মানুষের পরিবেশ ভাবনা প্রকাশিত হয়। আমরা জানি এই লৌকিক দেবদেবী উর্বরতা শক্তির প্রতীক। লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক আখ্যানে আমরা এই উর্বরতাকেন্দ্রিক বহু কাহিনি পাব যেখানে মানুষ তার সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির থেকে সহায়তা ভিক্ষা করছে এবং পরিবেশকে রক্ষা করার বিষয়ে সচেতনার প্রচার করছে। লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে লোকায়ত মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণের চিন্তাকে প্রকাশ করে চলেছে আবহমান কাল থেকে।

(ক) থান ও পরিবেশের সংরক্ষণ— আমরা জানি লৌকিক দেবদেবীর থান রাস্তার ধারে, মাঠের পাশে বা ঝোপঝাড় থেকে শুরু করে গ্রামের মাঝে বা কোন লোকালয়ের মধ্যে থাকে। থান মানুষের ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতি পালনের পরিসর। এই থানগুলির অবস্থানের জন্য থান ও তার আশপাশে কংক্রিটের জঙ্গল হতে দেখা যায় না। কেননা থানের জমিকে দেবত্তোর জমি বলা হয় ও তা নিষ্কর থাকে। আজকের সময়ে যখন সব দিকে ইঁটকাঠের ইমারত গড়ে উঠছে সেখানে এই সমস্ত থানগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাকা মন্দিরে পর্যবসিত হয় না। এবং এর চারপাশের সবুজকে উৎখাত করতে দেয় না। থানগুলি থাকার জন্য এর চারপাশের জীববৈচিত্র্যের কোন ঘাটতি হয় না। এই থানের জন্য এই এলাকার বাস্তুতন্ত্র ঠিক থাকে। এই থানের চারপাশে অনেক বৃক্ষ দেখা যায় এবং এই বৃক্ষের সঙ্গে থানের নিকট সম্পর্ক। লোকায়ত মানুষ এই সমস্ত গাছে দেবত্ব আরোপ করে ও গাছে দেবতার আশ্রয় আছে বলে কল্পনা করে এই সমস্ত গাছের কোনো ক্ষতি করে না। এছাড়া আমরা বাংলার দেবদেবীকেন্দ্রিক এমন অনেক আখ্যান পাব যেখানে দেবদেবী মানুষকে স্বপ্নাদেশ দিচ্ছেন যেন এই থানের গাছ কাটা না হয়। আমরা জানি যে থানের চারপাশে যে জমি বা থানকে মানুষ ব্যক্তিগত মালিকানা বলে মনে করে না। থান ওই গ্রামের বা অঞ্চলের সবার হয় তাই ওই অঞ্চল বা গ্রামের সবাই এই থান ও তার চারপাশের পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেয়। আমরা পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, এই সাহিত্যতত্ত্ব কেবল সাহিত্য ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলে না, মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরিবেশ ভাবনা কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তার খতিয়ানকে দেখে। ঠিক একইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের পালিত ধর্মীয় পরিসরে পরিবেশ রক্ষা সরাসরি প্রকাশিত না হলেও তার ধর্ম ভাবনায় পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি লুকিয়ে থাকে। আমরা বৃক্ষ ও তার তলায় লৌকিক দেবদেবীর আস্থানা প্রতিটি গ্রামে দেখতে পাই। আমরা আখ্যানে দেখতে পাই যে, যে বৃক্ষের তলায় যে থানটি আছে সেই বৃক্ষ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে থানটিকে রক্ষা করে। আর সেই জন্য দেবদেবীর স্পষ্ট নির্দেশ থাকে কোনভাবেই সেই বৃক্ষকে যেন কাটা না হয়। এছাড়া আমরা দেখতে পাই এই সমস্ত বৃক্ষে নানা প্রজাতির জীব বসবাস করে। লোকায়ত মানুষ মনে করে এই জীবের সঙ্গে থান ও দেবদেবীর গভীর সম্পর্ক আছে। লোকায়ত ভাবনায় সমস্ত জীব বিভিন্ন

সময়ে থান ও দেবদেবীকে রক্ষা করে। ফলে এদের ভূমিকা পাহারাদারের মতোই হয়। আমরা আখ্যানে দেখেছি যে, এদের ক্ষতি করতে গেলে মানুষের সমূহ বিপদ হয়। এইরকম একটি আখ্যান হল—

> একবার প্রবল ঝড়ে মন্দিরের পাশে যে প্রাচীন বটগাছ ছিল তা পড়ে যায় ও মন্দির একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু মজার বিষয় বটগাছের ডাল ভেঙে গাছের নীচে যে মানুষ ও গরু ছিল তাদের কারুর গায়ে পড়েনি। তারপর ঐ বটগাছটিকে বিক্রি করে ও গ্রামের মানুষের সবার সাহায্য নিয়ে নতুন করে থান করা হয়। ওই বটগাছে একবার একটি বড় মৌচাক হয়েছিল তো একজন গ্রামের মানুষ নোংরা কাপড়ে ওই মৌচাক কাটতে গেল, তখন মৌচাকের মধ্য থেকে এক বিরাট সাপ তাড়া করে এল। তারপর সে পরিষ্কার কাপড় পরে এসে তা কেটে নিয়ে যায়।[৩১]

ফলে আমরা দেখতে পাই যে এই সমস্ত বৃক্ষে ও তার উপর বসবাসকারী সমস্ত জীবের উপর মানুষ দেবত্ব বা কোনো অলৌকিক গুণ আরোপ করে। যেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এই বৃক্ষ ও তার প্রানীকে কেউ ক্ষতি করতে চাইলে মানুষের বিপদ হয়। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে আমরা দেখতে পাই মানুষ তার চারপাশের পরিবেশকে কীভাবে দেখছে বা কোন মানদণ্ডের দ্বারা সে তার চারপাশের জীব ও জড় জগতকে বিচার করছে। কেননা মানুষের এই বিচারের মধ্য দিয়েই পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান যথাযথ হয়। লৌকিক সমাজে থানের অবস্থানের কারণে সেই এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্ন হওয়ার থেকে রক্ষা পায়।

(খ) দেবদেবীর পুকুরকেন্দ্রিক আখ্যানে প্রকাশিত পরিবেশ ভাবনা— আমরা প্রতিটি থানের পাশে পুকুর বা দিঘি থাকতে দেখি। দেবদেবীর থানের পাশে এই পুকুর বা দিঘি থাকা অনিবার্য। লোকায়ত সমাজ এই থানের পাশে পুকুরকে ‘দেবদেবীর পুকুর’ বলে থাকে। লোকায়ত সমাজ এই পুকুরের জলকে পবিত্র বলে মনে করে পান করে। ফলে মানুষ এই পুকুরের জলে নিত্যদিনের কাজ করে না। অর্থাৎ, এই পুকুরে মানুষ নোংরা ফেলে না, কাপড় পরিষ্কার করে না বা গবাদি পশুর স্নান করায় না। এর ফলে এই পুকুরের ফ্লোরা ও ফোনা বা পুকুরের বাস্তুতন্ত্র অটুট থাকে। মানুষ এই পুকুরে সাপ্তাহিক বা বাৎসরিক পুজোর দিনে স্নান করে, পবিত্র হয়ে থানে পুজো দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই পুকুরের জল নিয়ে দেবীর চরণামৃত করা হয় ও সেই জল পান করে মানুষ নানা রোগ থেকে মুক্তি পান। লোকায়ত সমাজে এই পুকুর নিয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত আছে। তারা দেখেছেন যে এই পুকুরে দেবদেবী স্নান করেন। পুকুর নিয়ে এই সমস্ত আখ্যানের ফলে আমরা দেখতে পাই যে, এই পুকুরকে মানুষ সমানভাবে শ্রদ্ধা করে ও কেউ এই পুকুরকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে

ভাবে না। আজকের সময়ে যখন সমস্ত পুকুর বা জলাশয় ভর্তি করে মানুষ বসতি স্থাপন করছে এবং তারফলে পুরনো পুকুর (Mother Pond) আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আর এর ফলে পুকুরে বসবাসকারী নানা প্রজাতির অস্বিত্ব আজকের সময়ে বিপদের মুখে পড়েছে। সর্বোপরি এই পুকুরের অস্তিত্ব লোপাটের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য চরমভাবে বিঘ্ন হয়ে পড়ছে। এই সময়ে দেবদেবীকেন্দ্রিক পুকুর সভ্যতার পরিবেশ বিপন্নকারী মানসিকতার মধ্যে ধরা না দিয়ে বরং পরিবেশ বান্ধব হয়ে দেখা দেয়। আমরা দেবদেবীর পুকুর নিয় লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনা কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা করব। আমরা প্রথমেই বড়াশির শৈব তীর্থের যে শিবের থান আছে সেখানে একটি পুকুর আছে ও তাকে নিয়ে যে আখ্যান প্রচলিত আছে তার উল্লেখ করব—

> বাবার নামে যে পুকুর তাকে পরশমনি পুকুর বলা হত। শোনা যায় বাবার যে সাপ আছে সে ওই পুকুর দিয়ে চলাচল করত। একবার ওই পুকুরে সাপের মাথার মনি পড়ে যায়। সেখান থেকে বাবার পুকুরকে পরশমনি পুকুর বলা হয়। শোনা যায় যে কিছু এখানে তখন খাওয়ার জলের প্রচুর সমস্যা ছিল। তখন কিছু মানুষ একটি ছোট গর্ত করে বাবার কাছে প্রার্থনা করে যেন ওই গর্ত ভরে যায়। সকালে সবাই দেখে যে সত্যি সেই গর্ত জলে ভরে গেছে। তখনকার সময়ে ওই পুকুরে নানা রকম জিনিস মানুষে পেত। বাবার কাছে কেউ কিছু পার্থনা করলে পুকুরে সেই জিনিস ভেসে উঠত। আবার কাজ সারা হয়ে গেলে তা জলে ফিরিয়ে দিত।[৩২]

আমরা দেখতে পেলাম যে এই পুকুরে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। পুকুরের মধ্যে এই অলৌকিকতা আরোপের মধ্য দিয়ে লোকায়ত সমাজের পরিবেশে রক্ষার যে চিন্তা তা পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের পালিত আচার-সংস্কৃতিতে যে পরিবেশ চিন্তা প্রকাশিত হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল দেবদেবীর পুকুর। গ্রামীন মানুষ এই দেবদেবীর পুকুরকে নিছক কোনো পরিবেশের পরিসর ভাবে না। মানুষ এই পুকুরের মধ্যে দেবদেবীর অধিষ্ঠান আছে বলেই মনে করে। আর এইজন্য তারা পুকুরের কোনো ক্ষতি করে না। আমরা দেখেছি যে, এই সমস্ত দেবদেবীর পুকুর নিয়ে লোকায়ত সমাজে এমন অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে যেখানে আমরা দেখতে পাই যে এই পুকুর কোনো নিছক জড় নয়। এই পুকুর দেবদেবীর দেহাংশ দিয়ে তৈরি হয়েছে। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি আখ্যানের উল্লেখ করব—

> সবাই মিলে ওই জায়গা খুঁড়তে গিয়ে দেখে যে পুকুর দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। কোনমতেই পুকুর কাটা গেল না। রাতে আমার এক পূর্ব পুরুষকে মা স্বপ্ন দেয় আমি এইখানে আছি। সেখান থেকে এইখানে বিবিমা ও রক্তান গাজীর থান প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই পাড়ার নাম হয় রক্তাখাঁ পাড়া।[৩৩]

আমরা আখ্যানটির মধ্যে দেখতে পাই যে, এই পুকুরটিকে ওই নির্দিষ্ট দেবতার শরীরের অংশ বলে বিবেচনা করে মানুষ পুকুটির কোনো ক্ষতি করে না বরং মানুষ তার রক্ষাণাবেক্ষণ করে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে বলা হয় পরিবেশ হল মানুষের বৃহৎ ঘর। এবং মানুষ সেই ঘরকে কীভাবে সজ্জিত রাখছে বা তার শৃঙ্খলাকে কীভাবে সাজিয়ে রাখতে তা পাঠ করা। আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ তার চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন পরিসরকে দৈবী মহিমায়, অলৌকিকতায় মুড়ে আসলে তার চারপাশের পরিবেশকে রক্ষা করার কথাই প্রকাশ করে চলেছে। জয়নগরের রক্তাখাঁ পাড়ায় পঞ্চানন্দের থানকেন্দ্রিক পুকুরকে কেন্দ্র করে উল্লেখিত আখ্যানে স্পষ্টত দেখা যায় যে, লোকায়ত মানুষ এই পুকুরকে কোনো জড় পরিসর বলে মনে করে না। লোকায়ত সমাজ এই পুকুরকে দেবদেবীর শরীরের অংশ বলে মনে করে। ফলে মানুষ এই পুকুরের কোনো ক্ষতি করে না। এইসবের মধ্য দিয়ে আসলে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ সংরক্ষণের মানসিকতা প্রকাশিত হয়।

লোকায়ত মানুষ বিশ্বাস করে থানের পাশে যে পুকুর আছে সেখানে দেবদেবীর অধিষ্ঠান আছে। আর এই সমস্ত দরিদ্র মানুষরা সব সময় দেবদেবীর আশীর্বাদে নিজের সমস্যার সমাধান করতে চায়। এই জন্য মানুষ দেবদেবীর কাছে মানত করে বা প্রার্থনা করে যেন তার জীবনের সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যায়। দেবদেবীর পুকুর নিয়ে এই একই ধারণা আমরা দেখতে পাই। লোকায়ত মানুষ বিশ্বাস করে এই পুকুরে ধনসম্পত্তি আছে ও এই সম্পত্তির সঙ্গে দেবদেবীর যোগ নিবিড়। আমরা এমন অনেক আখ্যান পাব যেখানে পুকুর থেকে সম্পত্তি উঠে আসছে। মানুষ ভক্তিভরে ওই দেবদেবীর পুকুরে কিছু চাইলে তা তাদের হাতে উঠে আসত। এবং মানুষের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সেই জিনিস আবার তারা পুকুরেই ফিরিয়ে দিত। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি সেই জিনিস ফিরিয়ে না দেয় তাহলে পুকুর থেকে জিনিস ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। আবার যদি কোনো ব্যক্তি অপবিত্র বা নোংরা কাপড় পরে পুকুরের কাছে গিয়ে বস্তু চায় তাহলে তার হাতে কিছু আসে না। এবং অশুচি অবস্থায় স্নান বা প্রার্থনা করলে পুকুর অপবিত্র হয়ে বিভিন্ন জিনিস ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। পুকুর সম্পর্কে এই অতিলৌকিক ঘটনা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা তর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা এই সমস্ত আখ্যানের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে, লোকায়ত মানুষ পুকুরকে কোনো প্রাকৃতিক বা নিছক পরিবেশের পরিসর করে ভাবছে না। তারা এই পুকুরকে জীবন্ত বলে মনে করে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিক কথার মধ্যেই পড়ে যে,

পরিবেশের সমস্ত উপাদানের সমান মূল্য আছে। আর আমরা সবাই পরিবেশের সমস্ত কিছুর সঙ্গে যুক্ত। আমরা কেউ এককভাবে বাস করতে পারি না। দেবদেবীর পুকুর নিয়ে মানুষের মনোভাবের মধ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পর্কে সেই ধারণার প্রকাশ দেখতে পাই। যেখানে মানুষ পুকুরের মধ্যে দৈবী-মহিমা আরোপ করে তার রক্ষানাবেক্ষণ করছে। লোকায়ত মানুষ পরিবেশ সচেতনতার জন্য সচারাচর কোনো আন্দোলন বা কর্মসূচি গ্রহণ করে না। কিন্তু এই সমস্ত মানুষের ঐতিহ্যগত ধর্ম ভাবনায় বা তার বিশ্বাসে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি ধরা আছে। আমরা লৌকিক দেবদেবীর পুকুর নিয়ে একটি পরিচিত আখ্যানের উল্লেখ করব যেখানে পুকুরে ধন সম্পত্তি থাকা ও দেবতা তার পাহারা দেয়—

> এখানে আগে জঙ্গল ছিল। ক্রমে জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে ওঠে। থান গড়ে ওঠে। শীতলা থান ছিল। আর এই খনেশ্বরীর মন্দির। এখানের পুকুর খুব পবিত্র ছিল। দেবতারা এই পুকুরের জল ব্যবহার করত বলে প্রবাদ প্রচলিত আছে। আমাদের এক ঠাকুরদাদা সন্ন্যাসীচরণ নস্কর দেবভক্ত মানুষ ছিলেন, তিনি ঐ পুকুরের কাছে গিয়ে কাঁদলে টাকা-পয়সা পেতেন, গ্রামের অনেকে দেখেছে যে এই পুকুরে দুটি বিশাল শাল মাছ ছিল, তিনি ওই শাল মাছে চড়ে সারা পুকুর ঘুরে বেড়াত। আর কেউ এই পুকুরে নামার সাহস পেত না।[৩৪]

আমরা জানি লৌকিক ধর্মে মানুষ প্রকৃতির রহস্য বুঝতে না পেরে তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভরে পুজো করেছে। এই পুজোর মধ্য দিয়ে মানুষ পরিবেশের সমস্ত উপাদানের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে ও এর মধ্যেদিয়ে মানুষ পরিবেশে রক্ষা করে চলেছে। লোকায়ত মানুষের পরিবেশের সমস্ত উপাদানকে শ্রদ্ধা করা ও তাকে বিস্তারের পথে নিয়ে যাওয়ার যে ঐতিহ্যগত ধারণা তা আজকেও সমানভাবে টিকে আছে, এই সমস্ত আখ্যান তার প্রমাণ দেয়। দেবদেবীর পুকুর নিয়ে দেবব্রত নস্কর তাঁর *'লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি'* বইতে কয়েকটি আখ্যানের উল্লেখ করেছেন যা এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বারুইপুরের সীতাকুণ্ডুতে সীতেমা নামে লৌকিক দেবী পূজিত হন। এই দেবীর থানের পাশে একটি পুকুর আছে। এই পুকুরকে 'সীতেমা'র পুকুর বলা হয়। এই পুকুরকে নিয়ে অনেকগুলি আখ্যান প্রচলিত আছে। *'লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি'* বইতে এই আখ্যানগুলিকে উল্লেখ করেছেন—

> প্রথমত: সীতে মা'র পুকুর থেকে পূর্বে বিবাহদি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাসনপত্র পাওয়া যেত। কেবল পান ও সুপারি দিয়ে মায়ের নিকট প্রার্থনা করলে তা পাওয়া সম্ভব হত। অনুষ্ঠান শেষ হলে সেগুলি ভা মতো পরিষ্কার করে পুকুরে ফেরত দিতে হত। এখন আর সেই মাহাত্ম্য নেই। কারণ কোন এক ব্যক্তি বাসনপত্র নিয়ে ভালমতো পরিশজকার না করে ফেরত দিয়েছিলেন। এই অনাচারে পুকুরে বাসন দেওয়ার মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: দেবী সীতে মা এই পুকুরের মাঝে এয়োতি লীলা দেখিয়েছিলেন। দেবী এক শাঁখারির নিকট হতে শাঁখা পরে তাঁর এক ভক্তের নিকট হতে শাঁখার দাম আদায় নিতে বলেছিলেন। সীতে মা শাঁখা পরেছেন কিনা তা প্রমাণ নিতে তাঁর ভক্ত ওই পুকুরের নিকট এলে তিনি পুকুরের মাঝখান থেকে শাঁখাপরা হাত তুলে দেখিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত: সীতে মা'র থানের ঠিক উত্তর পশ্চিমে গুপ্তভাবে দেবীর জিওন কুণ্ডু ও মরণকুণ্ডু নামে প্রবাদ পুকুর আছে। ...দেওয়ান গাজীর সঙ্গে সীতে মা'র কোন এক সময়ে লড়াই হয়েছিল। সেই লড়াইয়ে সীতে মায়ের সৈন্য মরলে তাদের দেবীর 'জীবনকুণ্ডুর' জল ছিটিয়ে বাঁচিয়ে তোলা হয়, এবং গাজির যে সমস্ত সৈন্য মারা যায়, তাদের গায়ে দেবীর 'মরণকুণ্ডুর' জল ছিটিয়ে বাঁচার ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হয়।[৩৫]

আমরা এই সমস্ত আখ্যানের বিষয় বস্তুর মধ্যে যে বিষয়টি বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর পুকুরে অলৌকিক ক্ষমতা ও দেবদেবীর মহিমা যুক্ত করে মানুষ আসলে ওই পুকুরের রক্ষা করে। যদিও লোকায়ত মানুষ এই বিষয়টিকে সরাসরি প্রকাশ করে না। কিন্তু আমরা এই সমস্ত আখ্যানের বিষয়বস্তুকে তলিয়ে দেখলে মানুষের সেই ধারণাই স্পষ্ট হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, লোকায়ত মানুষ দেবদেবীর পুকুরকে নিছক কোনো পরিসর বলে ভাবে না। আমরা এমন অনেক পুকুর পাই যেখানে মানুষ এই পুকুরকে দেবদেবীর শরীরের অংশ বলে মনে করে। আর মনে করার জন্য এই পুকুরকে পবিত্র বলে পুজো করে। দক্ষিণবঙ্গের মগরাহাটে আমরা এমন একটি বিবি মায়ের পুকুরের সন্ধান পাই যেখানে মানুষ বিশ্বাস করে এই পুকুর বিবিমায়ের দাইয়ের শরীর থেকে তৈরি হয়েছে। লোকায়ত সমাজে এই পকুরের উৎপত্তি নিয়ে নিম্ন লিখিত আখ্যানটি প্রচলিত আছে—

মাইবিবি খাঁড়ি হাটে থাকাকালীন এক সময় স্থানীয় এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধে। সেই বিবাদ এমন চরমে পৌঁছয়, যাতে বিবিমা বাধ্য হয়ে একশত দাইকে সঙ্গে নিয়ে খাঁড়ি থেকে উত্তরদিকের আকাশ পথে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। এই প্রস্তুতির খবর ওই সম্প্রদায়ের কাছে যাওয়ার পর মাইবিবি আকাশ পথে দ্রুত পাড়ি দেন। মাইবিবির শত্রুপক্ষও পিছু নেয় দ্রুতগতিতে। এরপর খাঁড়ির উত্তরে উভয়ের মধ্যে শুরু হয় তুমুল সংগ্রাম। ...যুদ্ধস্থলের কিছু দূরে বিবিমার সঙ্গে আসা এক দাইয়ের মৃত্যু হয়। আকাশ থেকে পতিত হওয়া দাইয়ের মৃতদেহ যেখানে পড়ে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে একটি পুকুর সৃষ্টি হয়।... সেই অদ্ভুত জলাশয়টির চারিদিকে নীল আর মাঝের অংশটি লাল জলে রূপান্তরিত হয়।[৩৬]

দেবীর সহচরীর দেহ থেকে এই পুকুরের সৃষ্টির জন্য এখানে মানুষ কোনো সাংসারিক কাজকর্ম করে না। এই পুকুরের জলকে মানুষ পানের জন্য ব্যবহার করে। পুকুরটি গ্রামের সব মানুষের প্রতিদিনের জন্য ব্যবহৃত না হওয়ার জন্য পুকুরের বাস্তুতন্ত্র অটুট থাকে। আমরা দেখেছি যে, পুকুরটির চারপাশে গাছে ভরা, পশ্চিম দিকে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ ও পূর্বদিকে বট গাছ পুকুরটিকে ছায়া শীতল করে রেখেছে। পুকুরের পাশে গাছে নানা পাখির সমাগম হয় যারা স্বচ্ছন্দে বসবাস করে। এই পুকুরটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে অজস্র মৌখিক আখ্যান যার মধ্য দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। মানুষ কোনভাবেই এই পুকুরে আবর্জনা বা ময়লা ফেলে না, পুকুরে কোন গবাদি পশুর স্নান করায় না। এছাড়া পুকুরে মানুষ কোনোভাবেই জামা কাপড় সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে না। ফলে এই পুকুরের মধ্য দিয়ে এলাকার বাস্তুতন্ত্রের যে শৃঙ্খল তা অটুট থাকে। আজকের সময়ে পুকুরকে ভর্তি করে তার জায়গায় মানুষ বহুতল নির্মাণ করছে। আর ফল হিসেবে পরিবেশের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। লৌকিক দেবদেবীর থানের পাশে যে পুকুর থাকে মানুষ সেই পুকুরকে চেষ্টা করলেও সংস্কার বা মাটি দিয়ে ভর্তি করতে পারে না। আমরা এমন অনেক দেবী পুকুর পাব যেখানে মানুষ পুকুর সংস্কার বা বন্ধ করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়েছে। পুকুরকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত আখ্যানের মধ্য দিয়ে গ্রামীন সমাজের পরিবেশ রক্ষার মানসিকতা প্রকাশ পায়। দেবদেবীর পুকুরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই যে, দেবদেবী পুকুরে অবস্থানের কারণে একটি ছোট জলাশয় বড় পুকুরে পরিণত হচ্ছে ও পুকুরের চারপাশে ঝোপঝাড় থেকে শুরু করে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও পাখির ভীড় জমছে। দক্ষিণবঙ্গের জাগ্রত লৌকিক দেবী বিবিমায়ের পুকুর নিয়ে একটি আখ্যানে দেখা যায় যে, বিবিমায়ের স্পর্শে বা বিবিমায়ের অবস্থানের জন্য একটি ছোট পুকুর কীভাবে বড় আকার ধারণ করছে—

> মাইবিবি যুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সময় দৈব আদেশ মতো কাছাকাছি একটি জলাশয়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। বিবিমা যে জলাশয়ের মধ্যে আশ্রয় নেন সেটি আগে একটি ছোট পুকুর ছিলও। বিবিমার স্পর্শে সেই পুকুরটি একটি বিশাল জলাশয়ে পরিণত হয়।[৩৭]

লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পুকুরে নানা বিষয়ের সমাবেশ দেখা যায়। এই পুকুরকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে ভয় ও ভক্তি একই সঙ্গে কাজ করে। দেবদেবীর পুকুরকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক কাহিনি লোকায়ত মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। ফলে দেবদেবীর অনেক পুকুরে দিন দুপুরে

মানুষ কাছে আসে না। এর ফলে এই পুকুরের চারপাশে সবুজের সজ্জা দেখতে পাওয়া যায়। আমরা যেমন লৌকিক দেবদেবীর থানকে কেন্দ্র করে সবুজের সমারোহ দেখতে পাই ঠিক একইভাবে এই দেবদেবীর পুকুরে অসংখ্য গাছ দেখতে পাওয়া যায়। থান ও থানের পাশে পুকুরের অবস্থানের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

(গ) লৌকিক দেবদেবীর থান পাকা মন্দিরে পর্যবসিত না করতে চাওয়াকেন্দ্রিক আখ্যানে প্রতিফলিত পরিবেশ চেতনা— লৌকিক দেবদেবীর থান মাটির দেওয়াল, উপরে খড় বা টালির ছাদ যুক্ত হয়ে থাকে। দক্ষিণবঙ্গে যে সমস্ত থান দেখি তার অধিকাংশ মাটির এবং এই থানগুলি এইভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে আছে। এই থানগুলিতে সারা বছর কোন সংস্কার করা হয় না, কেবলমাত্র বাৎসরিক পুজোর দিনে এই থানকে মেরামত করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত থানকে কোনোভাবেই পাকা করা হয় না। এখানেই আমাদের প্রশ্ন আসে যে, মানুষের অর্থনৈতিক ও জীবনযাপনের উন্নতি আসা সত্ত্বেও এই সমস্ত থানকে পাকা ছাদযুক্ত করে স্থায়ী করা হচ্ছে না কেন? আমরা লোকায়ত সমাজে এই সমস্ত থানকে পাকা না করা নিয়ে বহু আখ্যান পাব যেখান থেকে আমরা জানতে পারি কেন এই সমস্ত দেবদেবীর থানকে পাকা করা হচ্ছে না বা কেনই তারা দিনের পর দিন উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝেই থাকছে। আমরা জানি যে এই সমস্ত দেবদেবী মানষের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন থেকেই উঠে এসেছে। ফলে এদের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নিবিড়। এই সমস্ত দেবতার পূজা-পদ্ধতি থেকে শুরু করে তাদের নানা বৈশিষ্ট্য সেই আদিম, কৌম ও অরণ্যচারী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকে বহন করে। বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার কবলে পড়ে যখন সমস্ত কিছু যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নগরের পাকা ইমারতের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে। তখন এই সমস্ত দেবতারা পরিবেশের উন্মুক্ত আকাশের মাঝে নিজের আশ্রয় খুঁজে নেওয়ার মধ্যে নগর সভ্যতার প্রসারের বিরুদ্ধাচরণ করছে। আমরা আখ্যানের মধ্যে দেখতে পাই যে এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবী খোলা আকাশের নীচে, ঝড়-বৃষ্টি ও রোদের মধ্যে থাকতে ভালোবাসেন। এই দেবতারা কোন বদ্ধতার মধ্যে থাকতে চান না। লোকায়ত মানুষ যদি এই থানকে পাকা করতে চায় দেবদেবী স্বপ্ন বা নানা অঘটনের মধ্য দিয়ে তা করতে দেন না। আমরা উদাহরণ হিসেবে জয়নগরের পালপাড়ার পঞ্চানন্দের থান পাকা করা নিয়ে যে আখ্যান আছে তার উল্লেখ করব—

> আমরা আগেকার মানুষদের কাছ থেকে শুনেছি যে এই তেঁতুল গাছে বড়রা কেউ উঠলে গাছ থেকে পড়ে যেত। তারা বলত যে তাদের ভয় লাগে আর গা হাত পা কাঁপে। কিন্তু বাচ্চারা গাছে উঠলে তাদের কিছু হয় না। আমরা লোকের মুখে শুনেছি যে আগে বাবা এই থানের কাছে হাওয়া খেতে আসত। কয়াল পাড়ায় বাবা ভোগ ক্ষেত আর এই পাল পাড়ার থানে রাতে বাবা হাওয়া খেতে আসত। বাবা এই তেঁতুল গাছের তলায় থাকে, কেউ কোনদীন বাবার মাথার উপর চালা দিতে পারেনি। আমাদের গ্রামের অনেকে বাবার মাথায় চালা করে দিয়েছিল কিন্তু সকালে গিয়ে দেখে সেই চাল উড়ে যায়। বাবা তাদের স্বপ্ন দেয় আমি এইখানে হাওয়া খেতে আসি আমাকে তোরা ঘেরার চেষ্টা করছিস? সেখান থেকে কেউ আর বাবার মাথার উপর চাল তৈরি করে না।[৩৮]

লোকায়ত মানুষ যেমন প্রকৃতির সঙ্গে লগ্ন হয়ে দিন অতিবাহিত করতে ভালোবাসে, এই সমস্ত মানুষের পূজিত দেবদেবীও প্রকৃতির মাঝে থাকতে পছন্দ করে। আমরা বিভিন্ন আখ্যানের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই যে, এই সমস্ত দেবদেবী কোনোভাবেই মন্দিরে থাকতে ভালোবাসেন না। আসলে এরা কোন ঘোরাটোপের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ করতে চান না। অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন থেকে উঠে আসা এই সমস্ত দেবদেবী বর্তমান সময়েও একই রকমভাবে থাকতে ভালোবাসেন। এবং এই দেবতাদের এই খোলা পরিবেশের মাঝে থাকার ঘটনাকে নিয়ে তৈরি হওয়া আখ্যানের মধ্যে আসলে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনা প্রকাশিত হয়। লোকায়ত মানুষ নিজেরাও উন্মুক্ত পরিবেশে থাকতে ভালোবাসেন ও পরিবেশের মাঝে নিজেরাও অবাধ বিচরণ করে আর সেই মানসিকতাকে এদের পূজিত দেবদেবীর মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। আধুনিক সভ্যতায় মানুষ যখন নানা কাজকর্মের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। তখন দেবদেবী কেন্দ্রিক এই সমস্ত আখ্যানে আমরা দেখতে পাই মানুষ ধর্মের মোড়কে, নানা বিধি-নিষেধের মাধ্যমে পরিবেশের শৃঙ্খলাকে বাঁচিয়ে রাখছে ও তার চারপাশের পরিবেশকে বিপন্নতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখছে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বে আমরা দেখি যে মানুষের সাহিত্য সংস্কৃতিতে পরিবেশ কীভাবে আকার ধারণ করছে বা পরিবেশ সম্পর্কিত ধারণা কীভাবে মানুষের মধ্যে বাহিত হচ্ছে। এই সমস্ত মৌখিক সাহিত্যে পরিবেশ রক্ষার যে ধারণা প্রকাশিত হচ্ছে তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্মৃতি ও শ্রুতির মাধ্যমে প্রবাহিত হয় ও লোকায়ত মানুষ তাদের আদিম, কৌম ও অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন যাপনে মানুষ যে প্রকৃতির সঙ্গে লগ্ন ছিল তার স্মৃতিকে বহন করে চলছে ও প্রকৃতি মানুষ ও তাদের পূজিত দেবতার মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ককে টিকিয়ে রাখছে।

দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি থানকে কেন্দ্র করে বহু কাহিনি প্রচলিত আছে যেখানে গ্রামীন মানুষ দেবদেবীর থান পাকা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো এক অলৌকিক কারণে সেই থানকে তারা

কোনভাবেই পাকা করতে পারেনি। গ্রামের কেউ যদি জোর করে বৃক্ষের তলায় বা খোলা আকাশের নীচে অবস্থিত এই দেবদেবীকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করতে চায় তাহলে নেমে আসে দৈব অভিশাপ। মানুষ তাই এই সমস্ত দেবদেবীকে খোলা আকাশের নিচেই পুজো করে—

> চণ্ডীদেবী আছেন বটবৃক্ষের তলায় খোলা আকাশের নীচে। বহুবার মন্দির করার চেষ্টা হয়, কিন্তু চণ্ডীদেবী কিছুতেই মন্দিরের মধ্যে থাকতে রাজি নন, তাই আজও খোলা আকাশের নীচেই বিরাজমান।[৩৯]

লৌকিক দেবদেবীর আকাশের নীচে থাকার মনোভাবের মধ্য দিয়ে আসলে প্রকৃতির সঙ্গে চিরকালীন সম্পর্ককে ধরে রাখতে চায়। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই যে, লৌকিক দেবদেবীর থান পাকা করলেও সব থানের দক্ষিণদিক সব সময় খোলা রাখা হয়। দক্ষিণবঙ্গের বহু থানে এমন আখ্যান পাওয়া যায় যেখানে মানুষ বিশ্বাস করে রাতে থানের খোলা দরজা দিয়ে দেবদেবী উন্মুক্ত পরিবেশের মাঝে দাঁড়ায় বা খোলা আকাশের নীচে গিয়ে গায়ে বাতাস লাগায়। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না থানের দরজা সব সময় খোলা রাখা ও দেবদেবীর রাতে বাতাস খেতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকার মানসিকতা ধরা থাকে যা কিনা দেবদেবীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে। আমরা জানি যে, লৌকিক দেবদেবীর থান তৈরিতে প্রাথমিক পর্বে একেবারেই প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহৃত হত। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেবদেবীর আবাসস্থল কাঠ খড়, গাছের পাতা দিয়েই তৈরি হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই কাঠ খড়ের বদলে ইঁট পাথরের ব্যবহার হতে দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের বহু থান এখনও নাগরিক সভ্যতার উপাদানকে গ্রহণ না করে প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা নির্মিত থানেই থাকতে ভালোবাসে। আমরা দক্ষিণবঙ্গের দেবদেবীর মূর্তি নির্মার্ণেও প্রকৃতির উপাদান ব্যবহৃত হতে দেখি। আসলে এই সমস্ত অরণ্যকেন্দ্রিক দেবদেবী যতই নাগরিক সভ্যতার মধ্যে বাস করুক না কেন তারা কোনো মতেই নিজের আদি বৈশিষ্ট্যকে ভুলে যায় না। দেবদেবীর মূর্তিও কাঠের দ্বারা তৈরি হতে দেখা যায়। আজকের সময়ে যখন সিমেন্ট বা পাথরের মূর্তি তৈরি করার হিড়িক পড়েছে সেখানে লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি কাঠের দ্বারা তৈরি ও সেখানে দৈব-আদেশ অবধারিত ভাবে এই সমস্ত দেবদেবীর প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের কথাই বলে—

> একদিন রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে জানতে পারেন চণ্ডীদেবীর প্রতিষ্ঠার কথা। পরের দিন তিনি দেবীর আদেশ মতো মন্দিরের পাশের পুকুর থেকে একটি প্রয়োজনীয় নিমকাঠ পান। সেই কাঠ দিয়ে স্বপ্নে দেখা দেবী মূর্তি তৈরি করান।[৪০]

জল-জঙ্গল ঘেরা দক্ষিণবঙ্গের জীবন ও জীবিকার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই সমস্ত দেবদেবীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক খুবই নিবিড়। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে এদের মূল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। মানুষ প্রকৃতির যেমন পুজো করেছে তেমনি এই সমস্ত দেবদেবীর মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখার মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে। আর সেইজন্য দেবদেবীর থান ও মূর্তি তৈরিতে প্রাকৃতিক উপাদানকে সমসময় দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবীর থান বা আবাসস্থল বেশিরভাগই পরিবেশের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দেখা যায়। আর যদিও সেই থান ঘেরাটোপের মধ্যে ধরা দেয় তার মধ্যেও আবশ্যিকভাবে প্রকৃতির উপাদান থাকবে বা সেই থান কোনো বৃক্ষের তলায়, কোনো বড় পুকুরের ধারে তৈরি হবে। এইজন্য লৌকিক দেবদেবীর থানকে পুকুর পাড়ে, ঝোপঝাড়ে, গাছের তলায়, ধানক্ষেতে বা জঙ্গলের মধ্যে দেখা যায়। লৌকিক দেবদেবীর থান উন্মুক্ত প্রকৃতিক পরিবেশের মাঝখানে অবস্থানের কারণের মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের আধুনিক যন্ত্র-নির্ভর নাগরিক সভ্যতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আদি আরণ্যকেন্দ্রিক জীবনের দিকে যাত্রার কথা বলে চলে। মানুষের ধর্মাচারণের সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পর্ক গভীরভাবে যুক্ত। লৌকিক ধর্মাচারের ঐতিহ্যের মধ্যে পরিবেশকে রক্ষা বড় স্থান অধিকার করে আছে। লৌকিক দেবদেবীর থান ও তাদের অবস্থানের ধরনের মধ্যে মানুষের সেই পরিবেশ সচেতনার দিক প্রকাশিত হয়।

(ঘ) থানকেন্দ্রিক আখ্যানে মানুষ না-মানুষের সম্পর্ক ও পরিবেশ ভাবনা— আমরা জানি পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্যে মানুষ ও তার চারপাশের যে ভৌত পরিবেশ আছে তাদের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করে। এছাড়া এই সাহিত্যতত্ত্বে মানুষের সঙ্গে অন্য জীবকুলের সম্পর্কের খতিয়ান দেখতে ও বুঝতে চায়। আসলে মানুষ কেবল আধিপত্যের মানসিকতা নিয়ে অন্য জীবদের দেখছে কিনা নাকি, অন্য জীবদের প্রতি সমমর্যাদা নিয়ে দেখছে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে এই সমস্ত কিছুকে পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বিচার-বিশ্লেষণ করে। আমরা উদাহারণ হিসাবে বলতে পারি যে, থানের পাশে যে বৃক্ষ থাকে তাতে নানা প্রজাতির পাখি বাসা তৈরি করা ছাড়াও সেই বৃক্ষে মৌমাছি বাসা তৈরি করে। আমরা এই পাখি ও নানা পতঙ্গের বাসা বাঁধা নিয়ে তৈরি হওয়া

আখ্যানে দেখতে পাই মানুষ এই সমস্তকে নিজের ব্যাবসায়িক কাজে ব্যবহার করে না। এই বৃক্ষের সমস্ত প্রাণী বা পতঙ্গ স্বচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করে। ফলে থানের পরিবেশে বসবাসকারী প্রানীর সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়। সর্প-ভীতি দক্ষিণবঙ্গের জলজঙ্গলের মানুষের কাছে নিত্য দিনের সমস্যা। মানুষ সাপের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকে পুজো করে থাকে। কিন্তু আমরা জানি যে, মানুষের নিজের ব্যবসায়িক চিন্তায় বা অর্থের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির সাপকে নির্বিচারে পাচার করে। এছাড়া সাপকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে তার চরম ক্ষতি করতে চায়। আর এই কারণে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ আজকে বিপন্নতার মুখোমুখি হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর থানে সর্পকেন্দ্রিক আখ্যানগুলিতে সাপকে মানুষ ভক্তি সহকারে পুজো করে । বর্তমান সময়ে তক্ষক সাপ বিপন্ন কেবলমাত্র মানুষের কিছু স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। কিন্তু আমাদের ধর্মীয় পরিসরে এই সাপের আলাদা মর্যাদা আছে। আমরা দেখতে পাই যে, লৌকিক দেবদেবীর থানে এই সাপের অবাধ বিচরণ ও মানুষ তার ক্ষতি করে না। এবং তাকে পরম যত্নে ধর্মীয় চিন্তার মোড়কে রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই যে থানের সঙ্গে জড়িত উদ্ভিদ ও প্রানীর প্রতি মানুষের যে মানসিকতা তাতে আসলে পরিবেশের সমস্ত প্রাণকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথাই উচ্চারিত হয় । আজকের সময়ে যখন সবাই নিজের আধিপত্য নিয়েই চিন্তিত; সেখানে এই সমস্ত থানকেন্দ্রিক আখ্যান ও লোকায়ত মানুষের পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য অটুট থাকে। আমরা লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক আখ্যানে সর্বপ্রাণবাদের বিষয় দেখতে পাই। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি আদিম সময় থেকেই মানুষ বিশ্বাস করত যে, আকাশ, বৃষ্টি, ঝড়, গাছ, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বন থেকে শুরু করে প্রকৃতির সমস্ত উপাদান নিছক কোনো জড় বিষয় নয়। আদিম মানুষ ভাবত প্রকৃতির সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনো না কোনো অলৌকিক শক্তি কাজ করছে। এই সমস্ত শক্তির উপরেই মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। ফলে মানুষ প্রকৃতির সমস্ত বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। মানুষের এই ভাবনা থেকেই সর্বপ্রাণবাদের ধারণা জন্ম নিয়েছে। পল্লব সেনগুপ্ত মানুষের মনে সর্বপ্রাণবাদের ধারণা জন্ম নেওয়ার তিনটি প্রকরণের কথা উল্লেখ করেছেন—

১। জড়বস্তু এবং নিসর্গীয় ব্যাপারগুলির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সজীব শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস।

২। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের জীবিত ও মৃত অবস্থায় একটি/একাধিক সত্ত্বা কিংবা আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস।

৩। অনির্দেশ্য- কিছুর মধ্যে অবলীন-থাকা কতকগুলি অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস। এই ত্রিবিধ-প্রত্যয়ের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে সর্বপ্রাণবাদ।[৪১]

লৌকিক দেবদেবীর থানে প্রতিটি জড় ও জীবকে কেন পুজো করা হয় তার যুক্তি উপরের উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যায়। লোকায়ত মানুষ প্রথমে প্রকৃতির সমস্ত বিষয়কে অলৌকিক জাদুশক্তি হিসেবে পুজো করেছে। এরপর মানুষের মধ্যে ধর্মের উন্মেষ ঘটলে এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে দেবত্ব আরোপ করেছে। লৌকিক দেবদেবীর থানে ও এই সমস্ত দেবদেবীকে তৈরি হওয়া আখ্যানে আমরা দেখতে পাই যে, বৃক্ষ, পাথর, নুড়ি, কাঠ, মাটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপাদানকে মানুষ পুজো করছে। লৌকিক দেবদেবীর থানে এই 'না-মানুষ'দের পুজোর মধ্য দিয়ে পরিবেশের সমস্ত কিছুকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্যকে রক্ষার মানসিকতা প্রকাশ পায়। লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে এই ধারণার অজস্র উদাহরণ দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি থানেই দেখতে পাওয়া যায়। আমরা এই বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে দ্বীপচণ্ডী থানে কয়েকটি আখ্যানের উল্লেখ করব; খোলা আকাশের নীচে, হোগল বনের মধ্যে এই দেবী আজও সমানভাবে পূজিত হয়ে আসছে। এই দেবী ও তার চার পাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে যে আখ্যান গড়ে উঠেছে তার মধ্যে মানুষের পরিবেশে সমস্ত প্রাণের প্রতি সমান গুরুত্বের কথা উচ্চারিত হয়েছে—

আমরা সারা বছর এখানে কাজ-কাম করে খাই। আমরা জানি এখানে অনেক বিষধর সাপ, পোকা-মাকড় আছে- কিন্তু মায়ের-দয়ায় আমাদের কিছু হয় না।[৪২]

আমরা জানি যে, দক্ষিণবঙ্গের মানুষের বড় সমস্যা হল সাপ ও বিষাক্ত পোকা-মাকড়। মানুষের কাছে এই জীব চরম শত্রু হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। এবং মানুষ সুযোগ পেলেই নির্বিচারে এদের মেরে ফেলে। কিন্তু লৌকিক দেবদেবীর থানের চারপাশে সাপকে মানুষ শত্রু বলে মনে করে না। সাপের মতো চরম ক্ষতিকারক প্রাণী দেবদেবীর কথা মতো চলে; মানুষ এই বিশ্বাস থেকে এই সমস্ত প্রানীদের কোনো ক্ষতি করে না। লোকায়ত মানুষ পাথরের মধ্যেও প্রাণ আরোপ করে তাকে পুজো করছে। আমরা দ্বীপচণ্ডীর থানেও এমন একটি আখ্যান পাই—

প্রায় মাঝামাঝি অংশে দুটো প্রাচীন দেবদারু আর বকুল গাছের নীচে রয়েছে প্রাচীন দুটি কালো পাথর। ...স্থানীয় মানুষ ওই কালো পাথর দুটিকে এই দ্বীপের রক্ষক দেবী হিসাবে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি সহযোগে পুজো করেন। ...দুটি পাথরের মধ্যে একটি মাঝে মধ্যেই কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বেশ কিছু দিন পরে আবার তাকে আগের জায়গায় দেখা যায়।[৪৩]

এইরকম মৌখিক আখ্যান দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত থানে প্রচলিত। লোকায়ত মানুষ কেবল থানের পাথরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেনি। এই সমস্ত পাথরের মধ্যে নানা অলৌকিক ঘটনার আরোপ করে তাকে জীবন্ত বলে পুজো করেছে। এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের পরিবেশের সমস্ত উপাদানের প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতাই প্রকাশ করছে।

(ঙ) দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী: পরিবেশ রক্ষক— মানুষ প্রকৃতির কাছে অসহায়। প্রকৃতির প্রচণ্ড তাণ্ডবে মানুষের চারপাশের পরিবেশ সমূলে বিপন্ন হয়ে পড়ে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন ঘটনা বারবার ফিরে ফিরে এসেছে এবং বর্তমান সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দক্ষিণবঙ্গের নিত্য সঙ্গী। আমরা জনি এই সমস্ত লৌকিক দেবতা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। লোকায়ত মানুষ তার পূজাচার ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও তার প্রাণকে রক্ষা করে চলে। কিন্তু এই প্রকৃতির তাণ্ডবে মানুষের তৈরি করা পরিবেশ বারবার নষ্ট দেখা যায়। আখ্যানে লৌকিক দেবদেবী নিজেই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষের বসতভূমি ও তার পরিবেশকে রক্ষা করতে হাজির হয়। আসলে আমরা আগেই বলেছি যে, লোকায়ত সমাজ তাদের সমস্ত কিছু অসহয়তা এই সমস্ত দেবদবীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিরাপদে থাকতে চায়। নিজের অসহায়ত্বকে মানুষ তার পূজিত দেবতার কাছে জানিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে চায়। ফলে লৌকিক দেবদেবীর আখ্যানে দেখা যায় প্রকৃতির নানা পরিসরের সঙ্গে দেবদেবী নিজেই যুদ্ধ করছে যাতে লোকায়ত সমাজের পরিবেশ ঠিক থাকে। আমরা উদাহরণ হিসেবে দুইটি কাহিনির উল্লেখ করব যেখানে এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবী মানুষের পরিবেশ রক্ষাকর্তা হিসেবে হাজির হয়েছে। এই বিষয়ক প্রথম কাহিনি হল—

> বাবা ঠাকুরদার মুখ থেকে শুনেছি, বর্ষাকালে কোটালের সময় নদীর বাঁধকে কাঁচা মাটি দিয়ে তৈরি করা হত। অনেক সময় হাওয়ায় নদীর জল এত ফুলে উঠত যে বাঁধকে কোনমতে রক্ষা করা যাবে না। দিনের সময় সবাই মিলে কোনরকমে বাঁধ বাঁচানো গেলেও রাত্রে কোনভাবেই বাঁধ রক্ষা সম্ভব ছিল না। গ্রামের সবাই মিলে এসে বাবা আটেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে- বাবা যদি কোন ভাবে বাঁধ রক্ষা করা যায় তো আমরা সবাই রেহাই পেয়ে যাব। এই অঞ্চলে তখন লোক বসতি খুবই কম ছিল। গভীর রাত্রে শোনা যায় বাঁধে কে যেন দুমদাম আওয়াজ করছে অথচ কাউকে দেখা যায় না। সকালে সবাই গিয়ে দেখে যে বাঁধটা ঠিক আছে ভেঙে যায়নি।[৪৪]

এরপর আমরা সাগরদিঘির বিশালাক্ষীর থানে যে কাহিনিটি প্রচলিত আছে তার উল্লেখ করব—

প্রতি রাতে মা বিশালাক্ষী নদীর সাথে যুদ্ধ করতে যেত। মা গঙ্গার সাথে ওনার বিরোধ কেননা গঙ্গা যেহেতু গ্রামে ঢুকে আসছে তাই তিনি গঙ্গার সাথে যুদ্ধ করতে যেত। থানে যে আশাবাড়ি আছে সেই নিয়েই মা যুদ্ধ করতে যেত। মায়ের নাকের নথ মাঝে মাঝেই পাওয়া যেত না। সেই রাতেই মা আমার ঠাকুরদাকে স্বপ্ন দেয় যে, 'আমি ওইখানে নাকের নথ ফেলে এসেছি তুই নিয়ে আয়।' ঠাকুরদা সকালে গিয়ে দেখে যে সেইখানেই নথ পড়ে আছে। আবার কোন কোন সময়ে দেখা যায় মার কাপড়ে কাদা মাখা। রাত্রে ঠাকুরদা স্বপ্ন পায় যে আমি কাল রাতে গঙ্গার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম তাই আমার কাপড়ে কাদা লেগে গেছে। তুই আমায় নতুন শাড়ি কিনে দে।[৪৫]

আমরা এই দুইটি আখ্যানের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই যে লোকায়ত মানুষ পরিবেশকে রক্ষা করার হাতিয়ার হিসেবে নিজের পূজিত দেবদেবীকে রক্ষক হিসেবে হাজির করছে। আমরা জানি দক্ষিণবঙ্গের বহু দ্বীপ চারদিকে নদী দিয়ে ঘেরা। এখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে নদী যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তেমন করে নদী এখানকার মানুষের প্রতিদিনের সমস্যা। এখানকার দুর্বল নদী-বাঁধ ভেঙে বছরের নানা সময়ে জল ঢুকে গ্রামের জনজীবন ও তার পরিবেশকে নষ্ট করে। মানুষ এই সমস্যার সমাধান সব সময় করতে পারে না। মানুষ যখন এই প্রকৃতির সঙ্গে পেরে ওঠে না তখন তাদের পূজিত দেবদেবীর কাছে আশ্রয় নেয়। তারা আশা করে তাদের এই সমস্যাকে সমাধান করবে তাদের পূজিত দেবদেবী। আমরা আখ্যানে দেখতে পাই যে, দেবী নিজেই গঙ্গার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে যাতে এই নদী গ্রামকে দখল করতে না পারে। আর এই জন্য আখ্যানে আমরা দেখতে পাই দেবীর শাড়ি ছেঁড়া। এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, লোকায়ত মানুষ কেবল পরিবেশ নিয়ে ভাবিত নয়, তাদের পূজিত দেবদেবী তার চারপাশের পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেয়। নদী যদি এই গ্রামে প্রবেশ করে তাহলে গ্রামগুলির সুস্থ, স্বাভাবিক ছায়ানিবিড় ও প্রকৃতি লগ্ন গ্রাম-পরিবেশকে নষ্ট করে। আখ্যানে মানুষ এই দেবদেবীকে পরিবেশের রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখেছেন। একইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, রায়দিঘিতে আটেশ্বরের থান নিয়ে যে কাহিনি প্রচলিত তাতে লোকায়ত মানুষের সেই একই কামনা যাতে গ্রামে নদীর জল প্রবেশ না করে। আমরা আখ্যানে দেখতে পাই যে, মানুষ যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কোনভাবেই নদীবাঁধের কাছে যেতে পারছে না সেখানে এই লৌকিক দেবতা সারা রাত নিজে বাঁধ পাহারা দিচ্ছে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনাই প্রকাশিত হয়। আমরা উপরের দুইটি আখ্যানের মধ্যে দেখতে পাই যে, লোকায়ত মানুষ পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি কেবলমাত্র তার পালিত সংস্কৃতির মধ্যেই ধরে রাখে না। লোকায়ত মানুষ নিজেদের পূজিত দেবদেবীকে সরাসরি পরিবেশকে বাঁচানোর লড়াইতে নামিয়েছে। এ যেন

লোকায়ত মানুষের মতো কোমর বেঁধে নদীর বাঁধ মেরামতে হাত লাগিয়েছে এই সমস্ত দেবদেবী। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই দুই আখ্যানে মানুষের পরিবেশ নিয়ে যে চিন্তার ছাপ আমরা পাই তা আধুনিক, উন্নয়নশীল চিন্তার থেকে অন্য দিকে ধাবিত হচ্ছে। আধুনিক সময়ে যেখানে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে নদীবাঁধকে পাকা করে দেওয়া হচ্ছে, নদীর প্রবাহকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর এরফলে পরিবেশের স্বাভাবিক ছন্দকে নষ্ট করা হচ্ছে। সেই দিক থেকে এই সমস্ত লোকায়ত মানুষ পরিবেশের ক্ষতি করে নিজের সমস্যার সমাধান করতে চাইছে না। আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতায় মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে পরিবেশকে বিপন্ন করে তোলে। সেখানে এই সমস্ত লোকায়ত মানুষ তার ঐতিহ্য পরম্পরায় পাওয়া পরিবেশ ভাবনার মধ্য দিয়ে পরিবেশের সমস্যার সমাধান করে।

(চ) লৌকিক দেবদেবীর উর্বরতাকেন্দ্রিক আখ্যান ও পরিবেশ ভাবনা— আমরা বাংলায় যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবীকে পাই ও তাদের নিয়ে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান লোকায়ত সমাজে পালিত হয় তাতে মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক বিশ্বাস প্রবলভাবে যুক্ত আছে। এই সমস্ত দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার অনুষঙ্গ নানাভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলার লৌকিক দেবদেবী ও তাদের কেন্দ্র করে মানুষ যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন করে তার মধ্যে মানুষের প্রজননকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস ও উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতা ধরা পড়েছে। আমরা এই আখ্যানগুলির মধ্যেও মানুষের সেই চিন্তাভাবনার প্রকাশ হতে দেখব। লোকায়ত মানুষের ধর্ম ভাবনায় ও তাদের পালিত আচার-অনুষ্ঠানে এই যে উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস তাতে আসলে পরিবেশকে রক্ষা করার ভাবনা প্রতিফলিত হয়। আদিম, কৌম সমাজ থেকে বৈদিক যুগ হয়ে বর্তমান পর্যন্ত লোকায়ত মানুষ আকাশ ও পৃথিবীর যৌথ মিলনের ফলে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্বাসে অটুট আছে। মানুষের ভাবনায় পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি তত্ত্বে মানুষ প্রকৃতির পরম উপাসক ও প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এই যে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে পৃথিবীকে শস্যবতী করে তুলেছে এই ধারণার মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষ প্রকৃতির কাছেই নতজানু হয়েছে, প্রকৃতির দানেই যে মানুষ পুষ্ট ও বেঁচে আছে এবং সেই কৃতজ্ঞতাকে সে তার পালিত আচার-সংস্কৃতির মধ্যে বয়ান করে চলে। লোকবিজ্ঞানে লোকায়ত মানুষ যুক্তির মধ্য দিয়ে চলে না। এই বিজ্ঞান ভাবনায় মানুষ দেবদেবীর অনুপ্রবেশ করিয়েছে। লোকায়ত মানুষ তাই শস্য না হলে উৎপাদনকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস ও উর্বরতাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা নিয়ে লৌকিক দেবদেবীকে পুজো

করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় লৌকিক দেবদেবী মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে জন্মলাভ করেছে। লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে মানুষের এই চিন্তাভাবনা তার মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাহিত হয়ে চলেছে। আমরা দেখতে পাই যে, লৌকিক দেবদেবীর উৎপত্তির সঙ্গে আদিম কৌম সমাজের প্রজননকেন্দ্রিক, উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতা যুক্ত আছে। লোকায়ত সমাজের অতীত সময়ের জীবনযাপনের মধ্যে মৌলিক চাহিদার মধ্যে প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লোকায়ত মানুষের এই প্রজননকেন্দ্রিক মানসিকতার সঙ্গে উর্বরতাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা যুক্ত হয়ে লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছে বলেই মনে করা হয়। ফলে এই সমস্ত দেবদেবীর মূল ভীতই হল প্রজননকেন্দ্রিক মানসিকতার চাপ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত দেবদেবী যখন আর্য সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে তার মূল বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক খানি সরে আসে। উচ্চ সংস্কৃতির প্রলেপের ফলে এই সমস্ত দেবদেবীর আদিম বৈশিষ্ট্য চাপা পড়ে যায়। ফলে আমরা এদের মূল স্বরূপ জানতে পারি না। কিন্তু লোকায়ত সমাজে এই দেবদেবীর পূজাচার ও এদের নিয়ে তৈরি হওয়া আখ্যানে আমরা আদিম কৌম সমাজের সেই প্রাচীন কালের প্রজনন ও উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতাই দেখতে পাই—

> আমাদের দেশে লক্ষ্মীর পৃথক মূর্তি পূজা খুব সুপ্রচলিত নয়। বিষ্ণু-নারায়ণের শক্তি হিসেবেই তাঁহার যাহা কিছু প্রতিপত্তি; অন্তত প্রাচীন বাঙলায় তাহাই ছিল। সাহিত্য ও শিল্পে নারায়ণের শক্তিরূপিনী এই পৌরাণিক লক্ষ্মীই বন্দিতা হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের লোকধর্মে লক্ষ্মীর আর একটি পরিচয় আমরা জানি এবং তাহার পূজা বাঙালী সমাজে নারীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। এই লক্ষ্মী কৃষি সমাজের মানস-কল্পনার সৃষ্টি; শস্য-প্রাচুয্যের এবং সমৃদ্ধির তিনি দেবী। এই লক্ষীর পূজা ঘট লক্ষ্মী বা ধাণ্যশীর্ষ পূর্ণ চিত্রাঙ্কিত ঘতের পূজা এবং এই পূজাব্রতের সে-সব ব্রতকথা এবং যে-সব পৌরাণিক কাহিনি জড়িত তাহা একত্র বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, লক্ষ্মীর এই লৌকিক মানস-কল্পনাই ক্রমশ পৌরাণিক লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, স্তরে স্তরে নানা স্ববিরোধী ধ্যান ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৌম সমাজের ঘট লক্ষ্মীর বা শস্যলক্ষ্মীর বা আদিমতম পূজা বা কল্পনা তাহা বিলুপ্ত হয় নাই।[৪৬]

আমরা বুঝতেই পারি যে, আমাদের লৌকিক দেবদেবীর মূল চিহ্নের মধ্যে পড়ে মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা। আর এই মানসিকতার মধ্যে আসলে লোকায়ত সমাজের আদিম, প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবন ভাবনাকেই প্রকাশিত হয়।

আমরা জানি যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃ প্রধান। মানুষ এই পর্বে নারীকে প্রধান হিসেবে মানার বড় কারণই হল নারীর মধ্যেকার শক্তির সঙ্গে বা নারীর উৎপাদন শক্তির সঙ্গে প্রকৃতির মিল খুঁজে পাওয়া। আমরা আবার জানি যে, কৃষিকাজ নারীর আবিষ্কার। এইজন্য নারীকে উর্বরতার সঙ্গে তুলনা করা হয়; ভূমির উর্বরতা ও কৃষির জন্য নারীকে ঘিরে নানা জাদু বিশ্বাসের জন্ম হতে দেখা যায়। পৃথিবীর নানা দেশে জমিতে ফসল না হলে ঋতুমতি নারীর জমির উপর হেঁটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ভূমির উর্বরতাকে বাড়ানোর জাদুবিশ্বাস কাজ করে লোকায়ত সমাজে। বাংলার ব্রতগুলি দেখলে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। যেখানে বাংলার নারীদের পালিত ব্রতাচারগুলিতে মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসকিতাই প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, হরপ্পায় পাওয়া একটি শীলমোহরে একটি দেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। এই দেবীর গর্ভ থেকে উদ্ভিদের জন্ম হচ্ছে। ফলে নারীর সঙ্গে যেমন প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক তেমনি এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীকে পুজো করে লোকায়ত মানুষ আসলে তাদের পরিবেশ চেতনারই পরিচয় দিয়ে থাকে। এছাড়া লোকায়ত মানুষ লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যে আচার-সংস্কৃতি পালন করে তাতে তাদের উর্বরতাকেন্দ্রিক স্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস কাজ করে বলে মনে করা হয়-

> জাদুবিশ্বাসমূলক যে সকল অনুষ্ঠান ভূমির উর্বরতা বাড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রচীন ম্লাউষের চিন্তায় সেগুলিকে মেয়েদের বিশেষ ব্যপার বলে গণ্য করা হত। পৃথিবীর ফলোৎপাদিকা শক্তিকে মেয়েদের সন্তান উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার রীতি পৃথিবীর সবর্ত্র বিদ্যমান।[৪৭]

নৃতত্ত্বের ভাষায় একে ফার্টিলিটি ম্যজিক বা উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস বলে। আমরা লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে যে সমস্ত মৌখিক আখ্যান পাই সেখানেও মানুষের এই উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাসকেই দেখতে পাই। আসলে মানুষ এই সমস্ত দেবদেবীর পুজোর মধ্য দিয়ে তাদের সেই আজন্ম লালিত প্রকৃতি চেতনার প্রকাশ করে চলেছে। মানুষ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে দৈব মহিমা প্রদান করে তার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় উপাদানকে পেতে চেয়েছে যা আজকের বিজ্ঞান-নির্ভর মানসিকতার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত চলন। আসলে আমরা যে লৌকিক দেবদেবীর আখ্যান পাই তাতে বর্তমানের বিজ্ঞান-নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থাকে এড়িয়ে চলে ও এরফলে পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক থাকে। আমরা লৌকিক দেবদেবীর যে সমস্ত উর্বরতাকেন্দ্রিক আখ্যান পাই যেখানে মানুষ বিশ্বাস করে যে, তাদের এই সমস্ত বিশ্বাসের ফলে তাদের জীবনযাপনের উপাদান পাওয়া যাবে। লোকায়ত

সমাজের উৎপাদনের কলাকৌশল এখনও নিম্ন মানের। ফলে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান পেতে এই সমস্ত জাদুবিশ্বাস তাদের প্রধান হাতিয়ার। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> ধরুন আমি বৃষ্টি ঘটাতে চাই। যদি আমি বৈজ্ঞানিক হই আমি খুঁজব বৃষ্টির কারণগুলি কী, এবং চেষ্টা করব সেই কারণগুলির বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে বৃষ্টি আনবার। যদি আমি ধর্মে বিশ্বাস করি আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করব, হে ঠাকুর জল দাও। কিন্তু যদি আমি ম্যাজিক মানি, আমি একটি ভাঁড় ফুটো করে তাতে জল ভরে একটি গাছের মাথায় টাঙিয়ে দেব। ওই যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়বে, আমি বিশ্বাস করব, ওটা বৃষ্টির অনুকরণ, যা করার ফলে বাস্তবে বৃষ্টি হবে। অথবা আমি ড্রাম বাজিয়ে মেঘের ডাকের নকল করব। অথবা আমি দলবল জুটিয়ে বৃষ্টির নাচ নাচব। অথবা আমি ব্যাঙের বিয়ে দেব, কেননা বৃষ্টির আগে ব্যাঙ ডাকে। এগুলি হচ্ছে অনুকরণমূলক জাদুবিশ্বাসের উদাহরণ, কৃষিগত অজস্র আচার-অনুষ্ঠানের মূলে যা বর্তমান। এই বিশ্বাসই আদিম মানুষের চোখে নারীর সঙ্গে পৃথিবীর অভিন্নতা এনে দিয়েছে, মানবিক ফলপ্রসূতার ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করে প্রকৃতির ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি করয়ার চেষ্টা হয়েছে। আরও এক ধরণের যাদু বিশ্বাস আছে যাকে বলা হয় সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস।[৪৮]

লৌকিক দেবদেবী ও তাদের কেন্দ্র করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আমরা একই ভাবে দেখতে পাই লোকায়ত মানুষের নানা জাদুবিশ্বাস। আমরা উর্বরতাকেন্দ্রিক আখ্যানের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই যে মানুষ প্রকৃতি থেকে উপাদান নিচ্ছে কিন্তু তা বর্তমান সময়ের মতো করে নয়। প্রকৃতি থেকে নানা উপাদান নেওয়ার জন্য লোকায়ত মানুষ বিজ্ঞানের থেকে তার উর্বরতাকেন্দ্রিক বিশ্বাসকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। আমরা জানি আজকের সময় থেকে আদিম সময় পর্যন্ত মানুষ চেয়েছে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হোক বা প্রচুর ফসল হোক। আমরা জানি এই ফসলের উৎপাদন বেশি হওয়ার জন্য বিজ্ঞান নানা আবিষ্কার করেছে। এই আবিষ্কারের জন্য ও বেশি উৎপাদনের জন্য মানুষ পরিবেশকেই বিপন্ন করে তুলেছে। কিন্তু গ্রামীন মানুষ নিজের আজন্মের লালিত বিশ্বাসের কাছে গিয়েই প্রার্থনা করে। বিজ্ঞান ও লোকায়ত মানুষের উৎপাদন নিয়ে যে মানসিকতার ফারাক তা বিনয় ঘোষ সুন্দর করে বুঝিয়েছেন—

> আদিম ও আধুনিক সকল মানুষই প্রচুর ফসল কামনা করে, কারণ বাঁচার আগ্রহ সকলেরই সমান। বৈজ্ঞানিকরা ফসলের প্রাচুর্যের জন্য চাষের যন্ত্রপাতির উন্নতি করেছে, নানারকমের রাসায়নিক সার তৈরি করেছেন এবং এগুলি প্রয়োগ করে সফলও হয়েছেন। কিন্তু যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ করে প্রচুর ফসলের সম্ভাবনা যখন দেখা দিল, তখন অতিবৃষ্টি বন্যা ও সাইক্লোন সমস্ত ফসল ধ্বংস হয়ে গেল। ...কাজেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাতেও প্রচুর ফসলের গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। কিন্তু চিন্তার রাজ্যে যখন প্রাচুর্যের কামনা জাগে, তখন ম্যাজিক বা ঐন্দ্রজালিক উৎসব-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না।[৪৯]

মানুষের এই বিশ্বাসের কারণেই মানুষ কৃষি থেকে ফসলের জন্য নানা ঐন্দ্রজালিক আচার-অনুষ্ঠান করে আসছে সেই সুদূর অতীত থেকে। মানুষের এই কামনার জন্যই বৃষ্টি নিয়ে নানা আচার-আচরণ

করতে দেখি। পরবর্তী সময়ে মানুষের মনে যখন ধর্মের বোধ জাগল তখন এই সমস্ত আচরণ ধর্মের হাত ধরে শক্ত ভিত্তি পায়। আমরা জানি যে, এই দেবদেবীর উদ্ভব মানুষের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপনের সময় থেকে। ফলে এই সমস্ত দেবদেবীর পূজাচার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুতেই সেই আদিম অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপনের ছবি ফুটে ওঠে। আজকের সময়ে মানুষ বিজ্ঞানের হাত ধরেই বৃষ্টি থেকে শুরু করে ফসল সমস্ত কিছু পেতে চায়। কিন্তু লোকায়ত মানুষ, যাদের জীবনের সমস্ত কিছু নির্ভর করে লৌকিক দেবদেবীর আনুকূল্যের উপর। এই লোকায়ত মানুষ জীবনে বাঁচার উপাদান পেতে বিজ্ঞানের থেকে দেবদেবীর উপর আস্থা বেশি করে। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গের এক লৌকিক দেবতার প্রতি মানুষের কামনার ধরণকে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে—

> হুতোম দেও পূজার উদেদেশ্য চাষের জন্য বৃষ্টির প্রার্থনা। উত্তরবঙ্গের মানুষ জানত অনাবৃষ্টি হলে চাষের ক্ষতি হবে, এবং চাষ না হলে মানুষ অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হবে। অনাহারে মৃত্যু থেকে বাঁচতে তারা বৃষ্টির দেবতা হুতোমের শরণাপন্ন হত।[৫০]

প্রকৃতির কাছ থেকে আনুকূল্য ও প্রকৃতির সহায়তা পাওয়ার জন্য দেবদেবীর শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়টি কেবল উত্তরবঙ্গের মানুষের ক্ষেত্রে বলা যায় না। আমরা দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর ক্ষেত্রেও একই বিষয় দেখতে পাই। আসলে লোকায়ত মানুষের জীবন একান্তই প্রকৃতি নির্ভর। তাই মানুষ নিজের সুখদুঃখ সমস্ত কিছু এই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেবদেবীর কাছে সবার আগে জানায়। মানুষের এই চিন্তাভাবনার জন্য প্রকৃতিকে রক্ষা করা এদের মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের একটি মৌলিক বা প্রধান জিজ্ঞাসা হল মানুষের পালিত আচার-সংস্কৃতি ও তার বর্তমান সাহিত্যে কীভাবে পরিবেশ ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছে তা অনুসন্ধান করা। আমরা এবার লৌকিক দেবদেবী নির্ভর উর্বরতাকেন্দ্রিক আখ্যানে কীভাবে পরিবেশ ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছে তা দেখার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, কেবলমাত্র মৌখিক আখ্যানগুলিতেই এই পরিবেশ ভাবনা প্রকাশ পায় না, এই সমস্ত দেবদেবীর মৌলিক চিহ্ন হল তারা নিজেরাই পরিবেশ রক্ষক। লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে যে আচার-অনুষ্ঠান লোকায়ত মানুষ পালন করে তার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃতিকে তুষ্ট করার মানসিকতা প্রকাশ পায়। লৌকিক দেবদেবীর থানে পশু পাখির বলির প্রথা সেই আদিম কাল থেকেই চলে আসছে। দেবদেবীর থানে পশু-পাখির বলি দেওয়ার মধ্যে মানুষ তাদের পূজিত দেবদেবীকে তুষ্ট করে। দেবদেবীর থানে বলি দানের মধ্যে লোকায়ত মানুষের যে

মানসিকতার প্রকাশ করে তাতে উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতা ধরা আছে। এই প্রসঙ্গে পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন—

> বৃষ্টি কামনায় কোনো প্রাণীকে ‘বলি’ দেওয়ার কথাটাও এই সূত্রে বিচার্য। রক্তপাত ঘটিয়ে বৃষ্টির অধিদেবতাকে তুষ্ট করার এই ধর্মীয় কল্পনা আসলে কিন্তু জাদুবিশ্বাসেরই একটা বিবর্তিত রূপ। ...এই ‘রক্তপাত’ ঘটিয়ে ধরিত্রীকে ‘সিক্ত’ করার ফলে বৃষ্টি নেমে মাটিকে আরও বেশি করে ভিজিয়ে দেবে- এই জাদুর প্রতীতিই ছিলও প্রাথমিক; তারপর বৃষ্টির দেবতার তুষ্টিসাধনের কল্পনা গড়ে উঠেছে। শুধু পশুপাখি ‘বলি’ দিয়ে বা হত্যা করেই নয়, নিজের বা নিজের সন্তানদের গা-চিরে মাটিতে রক্ত ফেলারও প্রথা আছে বর্ষা নামানোর জন্য।[৫১]

দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর থানে বলি দান ও বুকের রক্ত দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার আচার-সংস্কৃতি আজও সমানভাবে প্রচলিত আছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রায়দিঘি থানার কঙ্কণদিঘিতে যে সমস্ত ভূমিজ আদিবাসীরা আছে মাঘ মাসে মনসার থানে এমন পুজো করে থাকে। পুরুলিয়া থেকে আসা আদিবাসীরা এখানে লৌকিক দেবী মনসার থানে পুজোতে যে উপকরণ ব্যবহার করে তার মধ্য দিয়ে এদের উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আনার মানসিকতা প্রকাশ পায়। এই আদিবাসীদের মনসার থানে যে পুজো হয় তার উপকরণ হিসেবে দেখা যায়—

> একালে পূজার নোইবেদ্য আলো চাল, ঘি, মধু, মিষ্টি, কলা, ফল, ধান, দূর্বা, প্রদীপ, বেল, তুলসী এবং অবশ্যই কালো মোরগ বলি। না দিতে পারলে পূজারী নিজের বুকে তিনটি বেল কাঁটা ফুঁড়ে তিন ফোঁটা রক্ত বের করে নিবেদন করেন।[৫২]

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল যে, এই দেবীর পুজোর সমস্ত নৈবেদ্য আবশ্যিক নয়। এখানে আবশ্যিক কালো মোরগের বলি আর নাহলে পূজারীর বুকের রক্ত। ফলে বোঝা যায় যে, এই দেবী একান্তভাবেই আদিবাসী সমাজের। আদিবাসী সমাজ বৃষ্টি আনার জন্য যে জাদুবিশ্বাস তা পরবর্তী সময়ে দেবদেবীর আশ্রয়ে বিস্তার লাভ করে বর্তমান সময়েও প্রচলিত আছে। দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত লৌকিক দেবদেবীদের ঘিরে অজস্র উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস ও আখ্যান প্রচলিত আছে। এখানে তাজা রক্ত হল জীবনের প্রতীক, জীবনের কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণ করার প্রতীক। লোকায়ত মানুষের কাছে বড় চাহিদাই হল খাদ্য ও সন্তান। ফলে এদের পূজিত দেবদেবীকে তাজা রক্ত দিয়ে সেই মানসিকতাকে পূরণ করতে চেয়েছে।

লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে উর্বরতাকেন্দ্রিক ও প্রজননকেন্দ্রিক আখ্যান সব থেকে বেশি প্রচলিত লোকায়ত শিবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শিবলিঙ্গে পূজা দেওয়ার মধ্যে নারীর প্রজনন কেন্দ্রিক চাহিদার কথাই ধরা পড়ে। এছাড়া মানুষ সন্তান কামনাকে কেন্দ্রে রেখে শিবলিঙ্গ পুজো করে

থাকে। বাংলার লোকায়ত সমাজে শিবকে প্রজনন শক্তির দেবতা হিসেবে দেখা হয়। শিবলিঙ্গে জল দেওয়া ও লোকায়ত শিবের থানে হত্যা দিয়ে বা মানত করার মধ্যে যাতে সন্তান লাভের কামনাকে প্রকাশ করে। লোকায়ত সমাজে শিবকে কেন্দ্র করে এমন অজস্র মৌখিক আখ্যান পাওয়া যায়। মানুষের এই যে প্রজননকেন্দ্রিক মানসিকতা বা উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতা তা কেবল নিজের সন্তান কামনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষের এই ইচ্ছা ক্রমশ প্রসারিত হয় পরিবেশের দিকে; সেখানে পৃথিবীও যাতে শস্যবতী ও উর্বর হয় তার কথাও বলা হয়। ফলে এই সমস্ত দেবদেবীর কাছে মানুষ কেবলমাত্র নিজের উর্বরতার ক্ষমতাকে বজায় রাখার কথা বলে না এই চিন্তা বৃহৎ পরিসর লাভ করে পরিবেশের সংরক্ষণের কথা বলে। আজকের আধুনিক সময়ে যখন কোন ভূমির বন্ধ্যা দশা ঘোচাবার জন্য নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই ভূমির উপর মানুষ আধিপত্য বিস্তার করছে, সেখানে লোকায়ত মানুষ তা না করে এই সমস্ত দেবদেবীর কাছে আবেদন জানিয়ে নানা জাদু বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ভূমির উর্বরতকে বজায় রাখার কথা বলছে আর এর মধ্যে মানুষের পরিবেশের ভারসাম্যকে বজায় রাখার মানসিকতা প্রকাশ পায়—

> শিবলিঙ্গ পূজার অন্তরালে ধরিত্রী ও পর্বত পূজার আদিম ধারাটি নিহিত আছে। ধরিত্রী মহামাতৃকার প্রতীক। ধরিত্রীর জঠর ভেদ করে পর্বত উপরে উত্থিত হয়। ধরণি জলমগ্ন হলে আদি মানুষেরা পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। পর্বতে বসবাসের বিপদ ধস-ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতি থেকে বাঁচতে আদি নৃগোষ্টীর কোনও এক শাখা ধরিত্রী ভেদকারী পর্বতের পূজা করেছে এরূপ ভাবা যায়। ‘ভয়’ থেকে ‘ভক্তি’ লোকসংস্কৃতির এই প্রতিষ্টিত সত্য উল্লিখিত অনুমানের বাস্তব সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। ধরিত্রীর জঠর ভেদ করে যেমন পর্বত উত্থিত হইয়েছে, তেমনি বৃক্ষও সৃষ্টি হয়েছে। বৃক্ষকে শিবরূপে কল্পনা করার লোকসংস্কৃতিগত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। বাংলায় নিম, বট অশ্বত্থ, পাকুড় বেল প্রভৃতি বৃক্ষকে শিবজ্ঞানে পূজা করার প্রচলন আছে।[৫৩]

ফলে আমরা বুঝতেই পারি যে, লোকায়ত মানুষ শিবলিঙ্গ পূজার মাধ্যমে প্রকৃতির উপাসনা করছে। পরিবেশবাদী সাহিত্যে কেবলমাত্র সাহিত্যের মাধ্যমে পরিবেশের অনুষঙ্গ অনুসন্ধান করা হয় না। মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরিবেশ ভাবনার স্বরূপকে দেখা বা অনুসন্ধান এই সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিক কাজ। আমরা শিবলিঙ্গে পূজার মধ্য দিয়ে মানুষের সেই আদি পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে লোকায়ত দেবতা পঞ্চানন্দের নাম সবার আগে আসে। পঞ্চানন্দের থানের অবস্থানের মধ্য দিয়েই এই দেবতার সঙ্গে যে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তা বোঝা যায়। বাংলার গ্রাম অঞ্চলে এই দেবতার থান সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় পরিবেশের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে—

> বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, শেওড়া, বকুল, নিম প্রভৃতি বৃক্ষতলে দেবতার থান বা মন্দির নির্মিত হয়।[৫৪]

লোকায়ত সমাজে পঞ্চানন্দ হলো বন্ধ্যাত্ব মোচনের দেবতা। লোকায়ত সমাজে পঞ্চানন্দের থানে দেখতে পাওয়া যায় মহিলারা থানের গায়ে ইঁটের টুকরো বেঁধে নিজের সন্তান কামনা করে। এছাড়া পঞ্চাননের গায়ের লাল রং একে প্রজনন শক্তির দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কেননা লাল রং রক্তের সঙ্গে তুলনীয়। আর আমরা জানি যে, রক্তের সঙ্গে উর্বরতার সম্পর্ক আছে। পঞ্চানন্দের গায়ের বর্ণ লাল হওয়ার মধ্যে মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার ছাপ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলার লোকায়ত সমাজে মনসাকে পুজো করার প্রধান কারণ হল সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কিন্তু এই সর্পভীতি ছাড়াও মনসা পুজোর মধ্যে মানুষের প্রজনন কেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস ও উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতার ছাপ প্রবলভাবে আছে। আমারা জানি সারা পৃথিবীতে সাপকে প্রজনন শক্তির প্রতীক কামনা করে প্রাচীনকাল থেকে পুজো হয়ে আসছে। লোকায়ত সমাজে মনসা পুজো সম্পর্কে নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন—

> সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব। এ- তথ্য নিঃসন্দেহে পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোনও না কোনও রূপে সর্প পূজার প্রচলন ছিলই। বাঙলা দেশে যে-সব মনসা দেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের, ক্রোটাসীন একটি মানব শিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক।[৫৫]

বাংলার লোকায়ত সমাজে মনসার এই মূর্তি প্রমাণ করে এই দেবীর সঙ্গে প্রজননকেন্দ্রিক জাদু-বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে উর্বরতা ও কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ধরা আছে। এই দেবীর সঙ্গে যে মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক বা কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ছাপ আছে তা মনসার পূজাচারের মধ্যে দেখা যায়। আমরা দক্ষিণবঙে মনসার পুজোতে দেখতে পাই যে, এই দেবীর পুজোর চার-পাঁচ দিন আগে গ্রামের মেয়েরা কিছু মুগ ও কলাইয়ের বীজ মাটির পাত্রে বপন করে। এবং পুজোর দিন ওই অঙ্কুর যুক্ত পাত্রগুলি দেবীর মূর্তির পাশে রাখে এবং সেগুলি থেকে অঙ্কুর বের হয়। মনসাকে কেন্দ্র করে এই পূজাচারের মধ্য দিয়ে মানুষের ফসল উৎপাদন বা শস্য পাওয়ার মানসিকতাকে আমরা দেখতে পাই। আদিম কৃষিভিত্তিক, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের শস্য পাওয়ার মানসিকতা এই মনাসার পূজাচারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় মানুষ যখন প্রযুক্তির সাহায্যে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের সাহায্যে সবুজ বিপ্লব আনছে। কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশকের প্রয়োগ ভূমি ও তার চারপাশের পরিবেশকে কীভাবে ক্ষতি করে তা বর্তমান পরিবেশের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। আমরা

লোকায়ত সমাজে দেখতে পাই যে, কৃষি ও ভূমির উর্বরতার জন্য নানা জাদুবিশ্বাসের উপর ভর করে চলছেন। আমরা এই লৌকিক দেবদেবীর আখ্যানে ও তাকে কেন্দ্র করে যে মানসিকতা প্রকাশ করে তাতে পরিবেশ সংরক্ষণের ভাবনা প্রকাশ পায়। ফলে আমরা মনসার পূজাচার ও তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া আখ্যানে আসলে আমরা লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনাকে প্রকাশিত হতে দেখি। মনসার পুজোতে এই শস্য ব্যবহার করা ও এই দেবীর কোলে মানব শিশু রাখার মধ্য দিয়ে মানুষ সেই মানসিকতার প্রকাশ করছে—

> এই আচারটির মধ্যে সর্প দেবী মনসার উৎপাদিকা শক্তির আরাধানার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সর্প কেবল যৌন প্রতীক তা নয়, ভূমি উর্বরতা বৃদ্ধির সঙ্গে এর যোগও রয়েছে। আমাদের মনে হয় একই বিশ্বাসের প্রকাশ এ অনুষ্ঠানে পাওয়া যায়। মুগ ও কলাইয়ের বীজ বপনের মধ্যে এবং এর চারাগুলি ‘হালা বিয়া’র একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার সেই ইঙ্গিত রয়েছে। এই আচারটি উদযাপিত করে অংশগ্রহণকারী নারী মাত্রই যে তাদের বিবাহিত জীবনে সুখের হোক এ কামনা জানায় তা নয়, যে দু’টি বালিকা বর ও কনের ভূমিকা করে তারাও ভবিষ্যৎ জীবনে দেবীর আনুকুল্য লাভ করে যাতে সন্তানের জননী সুখে বাস করতে পারে সে কামনাও জানায় বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।[৫৬]

আমরা আবার দেখতে পাই যে, মানুষ লৌকিক দেবদেবীকে সরাসরি পুজো করছে ফসল পাহারা দেওয়া ও ফসল বৃদ্ধির জন্য। লোকায়ত সমাজে ক্ষেত্রপালের থান সাধারণত হয়ে থাকে কোনো ক্ষেত বা রাস্তার ধারে। মানুষ বিশ্বাস করে এরফলে ওই খেতের ফসল কেউ হাত দিতে পারবে না। এই যে বিষয় নিয়ে লোকায়ত সমাজে অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে। যেখানে ক্ষেত্রপাল রাত্রে গ্রামের সীমানায় শব্দ করে গ্রাম পাহারা দিচ্ছেন। লৌকিক দেবতা আটেশ্বরকে নিয়েও এমন বহু আখ্যান প্রচলিত আছে যেখানে এই দেবতার থান তৈরি করা হয় ফসলযুক্ত খেতের পাশে। লোকায়ত মানুষ বিশ্বাস করে এই দেবতা তাদের ফসলের রক্ষক। লোকায়ত মানুষের লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে ফসলের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে আসলে তাদের আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে স্মরণ করে। যেখানে তারা মনে করে তাদের শস্য থেকে শুরু করে পরিবেশের নানা উপাদান এইসব দেবদেবীর মাধ্যমে লাভ করা যাবে। মানুষের এই দৈব নির্ভরতার মধ্যে তার আজন্মের পরিবেশ সংরক্ষণের ভাবনা প্রকাশ পায়।

বর্তমান সময়ে মানষ মুনাফার জন্য সব কিছু করতে পারে। আজকের সময় পরিবেশ বিপন্নতার কারণই হল মানুষের ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া লোভ। মানুষ পরিবেশের সমস্ত উপাদানের উপর নিজের অধিকার কায়েম করে সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করতে চায়। মানুষ এই মানসিকতার জন্য পরিবেশের অন্য কোনো প্রাণের প্রতি সম গুরুত্ব আরোপ করে না। মানুষের এই মানসিকতার জন্য

পরিবেশের অন্য প্রাণ আজ বিপন্ন বা বিলুপ্তির পথে। আজকে আমরা যে বিশ্বপরিবেশ বিপন্নতার যুগে বাস করছি। যেখানে আমাদের কারণেই আমাদের চারপাশের পরিবেশের যে বাস্তুতান্ত্রিক শৃঙ্খল তা সমূলে লোপাট হতে চলেছে। পরিবেশের সমস্ত উপাদান আমাদের দরকার মেটানোর জন্য জন্মগ্রহণ করেনি একথা আমরা মানতে চাই না। আমরা দুই হাতে কেবল তাদের থেকে নিয়েই চলেছি। আর এর ফলে আমাদের পরিবেশের নানা রোষের মধ্যে পড়তে হয়। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য বা আমাদের জীবিকার জন্য যে সমস্ত উপাদান দরকার তাকে আমরা যে কোনও মূল্যে পেতে চাই। নদী, নালা, পুকুর থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় আমরা কেবল মুনাফাভিত্তিক মানসিকতার দ্বারাই চালিত হয়ে অন্য প্রাণকে নিঃশেষ করে চলেছি। আর এর ফলে পুকুর থেকে শুরু করে জলাশয়, নদীর বাস্তুতন্ত্র চরমভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। কিন্তু লোকায়ত সমাজে আমরা অন্য চিত্র দেখতে পাই। আমরা লোকায়ত সমাজে এমন কিছু দেবদেবীর পুজো হতে দেখব যাদের মধ্য দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। মানুষ নিজের জীবিকার জন্য এখানে কেবল শোষণ করে না। বরং তারা জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়ার জন্য এই সমস্ত দেবদেবীর উপর নির্ভর করে। আমরা এই প্রসঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের একটি লৌকিক দেবতা মাকাল ঠাকুরের উল্লেখ করব। সুন্দরবন অঞ্চলের ধীবর সম্প্রদায়, যারা নদী, খাল, বিল থেকে শুরু করে নানা জলাশয়ে বিভিন্ন সময়ে মাছ ধরে তাদের উপাস্য দেবতা হলেন মাকাল ঠাকুর। আমরা দেখতে পাই যে, কোন পুকুর বা খাল-বিল সেঁচে মাছ ধরবার আগে পুকুরের পাড়ে বা জলাশয়ের ধারে মাকাল ঠাকুরের অস্থায়ী মূর্তি তৈরি করে পূজা করা হয়। লোকায়ত সমাজে এমন বিশ্বাস যে এই পূজা করলে তাদের কাঙ্খিত মাছ ধরা পড়বে। সুন্দরবন অঞ্চলে ফসল বৃদ্ধি বা পাওয়ার কামনায় বেনাকি ঠাকুরের পূজাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে—

> প্রকৃত তাৎপর্যে বেনাকি শস্য দেবতা। মূলত দেবতার মুণ্ডমূর্তি ও শস্যগুচ্ছ প্রতীকে পূজানুষ্ঠান হয়। বেনাকি দেবতার কৃপায় ভাল ফসল লাভ ও চর্মরোগ আরোগ্য হয়। খেতের ফসল ঘরে তোলার প্রাক্কালে ক্ষেতেই পূজানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[৫৭]

আমরা এই দুই দেবতার উল্লেখের মধ্য দিয়ে বলতে চাইছি যে, লোকায়ত সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করছে নানা জাদুকেন্দ্রিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। সেখানে মানুষ কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে পুকুর বা জমির বাস্তুতন্ত্রকে বিঘ্নিত করে পরিবেশের ক্ষতি করছে না। আমরা ফলে বলতেই পারি যে, লৌকিক দেবদেবী ও তাদেরকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আখ্যান ও পূজাচার গড়ে

উঠেছে ও সেখানে মানুষের যে প্রজননকেন্দ্রিক ও উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতা ধরা পড়েছে আসলে তাতে তাদের পরিবেশভাবনা ও সংরক্ষণের মানসিকতা হয়ে ধরা দেয়।

(ছ) বৃক্ষ পূজাকেন্দ্রিক আখ্যানে পরিবেশ ভাবনা— প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ইতিহাস পারস্পরিক লালন-পালনের ইতিহাস। মানুষ যখন পৃথিবীর বুকে ভীরু পদচারণা শুরু করেছে, যখন সে বুঝেই উঠতে পারেনি এই চরাচরের নানা রহস্যময় প্রাণ সৃষ্টির কার্যকলাপ। মেঘ-বৃষ্টি আসলে সৃষ্টির বার্তা আনে; কিন্তু মানুষ তার রুদ্র রূপ দেখে ভয়ে মুখ লুকিয়েছে। প্রকৃতির নানা তাণ্ডবলীলায় তার অস্তিত্ব যখন লোপাটের মুখে পড়েছে; আবার এই প্রকৃতি তাকে দিয়েছে জীবনযাপনের আশ্রয় ও বেঁচে থাকার সহায়ক উপাদান, বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খানিক মানুষের পূর্বপুরুষ পূজার মত করেই যেন শ্রদ্ধায় নুয়ে আছে। আদিম, দলবদ্ধ মানুষ ভাবত যে, তাদের কোনো দলপতি মারা গেলেও সে আড়ালে থেকে তাদের নানাবিধ বিপদ থেকে রক্ষা করছে; এই মানসিকতার জন্য প্রচলিত হয়েছে পূর্বপুরুষের পূজা। মানুষের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্ক এই আত্মিক বোধের সরণি বেয়ে আজও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃক্ষপূজা প্রচলিত। এছাড়া মানুষের প্রতিদিন যাপিত জীবনযাপনের জন্য নির্ভর করতে হয় বৃক্ষের কাছে। মানুষের আশ্রয় থেকে শুরু করে তার জীবনযাপনের নানা পরিসরে এই বৃক্ষ তাকে সহায়ক উপাদান যোগান দেয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের তৈরি হয়েছে বৃক্ষ নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতা থেকেই এসেছে বৃক্ষ পূজা। প্রকৃতিপূজা বা বৃক্ষপূজা আসলে মানুষের নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য সহায়ক উপাদানকে তুষ্ট করবার মানসিক ফলশ্রুতি। প্রকৃতির উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানুষ সেদিন নারীর মিল খুঁজে পেয়েছিল। তাই পৃথিবীর আদিম সমাজব্যবস্থা হল মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ফলে এই উৎপাদনের নিরিখে বৃক্ষ ও নারী কোথাও এক হয়ে যায়। মানুষ বৃক্ষপূজা শুরু করেছে কৃতজ্ঞতার নিরিখে। মানুষ যেমন করে দেবদেবী ও পশু পাখির পুজো করেছে তেমন করেই মানুষ এই বৃক্ষ-পূজা করেছে। বৃক্ষের সঙ্গে কোন দেবদেবীর তুলনা বা তাদের অধিষ্ঠান অনেক পরে হয়েছে। আসলে মানুষের দেবদেবীর পূজার ইতিহাসে প্রথমে সেখানে কোনো মূর্তিভাবনা কাজ করেনি। বিমূর্ত ধারণা বা কোন শক্তিকেই তারা প্রাথমিক পর্বে পূজা করেছে। গাছ, পাথর প্রভৃতি পূজা মানুষের প্রাথমিক ধর্মের ইতিহাস। আসলে মানুষের এই পর্বে তার সহায়ক সমস্ত উপাদানকেই

পূজা করেছে। আর এর সঙ্গে কাজ করেছে নানা জাদুবিশ্বাস। বৃক্ষপূজাতে মূলত কাজ করেছে মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক ধারণা। এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—

> ভারতীয় আদিবাসীরা অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসীদের মতো, বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। বাঙলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছপূজা এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বট গাছ। এ-সমস্তই সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব ধারণা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের গাছ-পাথর পূজা, প্রজনন শক্তির পূজা, পশুপক্ষীর পূজা প্রভৃতির স্মৃতি বহন করে। বস্তুত, আমাদের আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে যাহা কিছু শিল্প-সুষমাময় তাহার অনেকখানিই এই আদিবাসীদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত।[৫৮]

লোকায়ত সমাজে বৃক্ষপূজা সুপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। বৃক্ষকে নিয়ে বিভিন্ন কাহিনি প্রচলিত আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এই কাহিনির মধ্যে কোনোটায় দেখতে পাব দৈব মহিমার প্রচার আবার কোনটায় দেখতে পাব যে নানা ভৌতিক কাহিনি। কোনো কোনো বৃক্ষে দেখতে পাব সেখানে দেবদেবীর অধিষ্ঠান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আবার কোথাও দেখা যায় অপদেবতার অধিষ্ঠান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে, পূর্ব আফ্রিকার ওয়ানিকা জাতি মনে করে একটি নারকেল গাছে আত্মা বসবাস করে। তাই একটি নারকেল গাছকে কেটে ফেলাকে তারা মাকে হত্যা করার সামিল বলে মনে করে। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে এই সময়কার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তাই কোনো পুরুষের হত্যার সঙ্গে মেলানো হয়নি এই ঘটনাকে; তারা একটি নারকেল গাছের মৃত্যুকে মাতৃ হননের সামিল বলে মনে করে। আসলে ওই জাতির কাছে নারকেল ছিল হয়তো প্রধান খাদ্যের উপাদান। ফলে সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি কেনো নারকেল গাছের সঙ্গে তারা মায়ের তুলনা করেছে। আবার মধ্য আফ্রিকার বাসোগাস জাতির বিশ্বাস গাছে অপদেবতা থাকে। ফলে ওই গাছ কাটলে গৃহের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হবে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা মনে করে যে, তাদের পূর্বপুরুষরা এক একটি গাছে আশ্রয় করে আছে। আবার চীনে দেখা যায় যে কবরের পাশে একটি করে বৃক্ষরোপন করা হয়। এই যে বৃক্ষে পূর্বপুরুষের অধিষ্ঠান তা আসলে মানুষের পূর্বপুরুষের প্রতি ভয় যেমন কাজ করেছে, আবার তেমনি ভাবেই তারা মনে করে ঐ গাছের আড়ালে থেকে সেই সমস্ত ব্যক্তি তাদের নানা অসুবিধা থেকে রক্ষা করছে। তার ফলেই ঐ গাছগুলোকে তারা কাটে না। আদিম সমাজব্যবস্থায় এই সমস্ত বৃক্ষকে পুজো করা হত তাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে ও এর সঙ্গে

উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস বা বাসনার চাপ কাজ করত। এই বৃক্ষপূজার সঙ্গে ধর্মভাবনা অনেক পরে হয়েছে।

আমরা বট ও অশ্বত্থের পুজোকেন্দ্রিক কিছু আলোচনা করব আর সেই সঙ্গে আমরা দেখব যে এই পুজোর মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের কোন চিন্তার প্রতিফলন ঘটছে। বট ও অশ্বত্থকে কেন্দ্র করে পুরাণ থেকে শুরু করে নানা লৌকিক আখ্যান প্রচলিত আছে। পুরাণে বলা হয়েছে হর-পার্বতীর রতি রত অবস্থাকে বিঘ্ন করবার জন্য দ্বিজবেশি অগ্নিকে দেবতারা পাঠান। পার্বতী তখন তাদের অভিশাপ দেয় বিষ্ণু অশ্বত্থ রূপে, শিব বট রূপে ও ব্রহ্মা পলাশরূপে জন্মগ্রহন করবে ;সঙ্গে বলা আছে এই তিন গাছকে যে পুজো করবে তার পাপ স্খলন হবে। অন্য আর এক মতে বলা হয়েছে, যখন দেবতারা দানবের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে পালাচ্ছিলেন তখন বিষ্ণু অশ্বত্থ গাছে আশ্রয় নেয়।

উদ্ভিদেরও যে প্রাণ আছে সেই সত্য বিজ্ঞানের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু আদিম মানুষ ঐতিহ্য-পরম্পরায় বিশ্বাস করত যে, উদ্ভিদের বিশেষত বৃক্ষের প্রাণ বা আত্মা আছে। এই সূত্র ধরেই আমরা দেখতে পাই বৃক্ষপূজা বা তাদের বিয়ে দেওয়ার রীতি চালু হয়েছে। এই মানসিকতার আচার হিসেবে আমরা দেখতে পাই বট ও অশ্বত্থের বিয়ে দেওয়ার রীতি। আমরা দেখতে পাই সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটি বট ও অশ্বত্থের চারাগাছ রোপন করা হয়। তারপর যখন সেই গাছ বড় হয় হিন্দু বিবাহের আচার-সংস্কৃতি মেনেই তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া গ্রামের মানুষকে সামর্থ্য মত ডেকে ভোজ দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে, সঙ্গে বট ও অশ্বত্থের মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক গান, ব্রত ও ছড়া প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়। বট ও অশ্বত্থের বিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে মহিলাদের সংযুক্তি তেমনভাবে চোখে পড়ে না। কিন্তু প্রতিদিনকার পূজাচার মেয়েরাই করে। সাধারণত বাতাসা, নকুলদানা, ফুল ও ছোট দুই পাত্রে জল সহযোগে এদের পূজা হয়। এখানে কেবলমাত্র বিয়ে দিয়েই গ্রামীন সমাজ থেমে থাকে না। এই লোকায়ত মানুষ বৃক্ষের সঙ্গে একাত্মতা মনে করেই তাদের যাবতীয় সম্মান প্রদর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণকালী মণ্ডলের আলোচনা আমাদের মনে পড়ে; যদিও তিনি মানুষের সঙ্গে বৃক্ষের বিবাহ নিয়ে কথা বলেছেন—

> মামার মায়ের এক জ্যাঠাইমা ছিল এইরকমই এক বেলফুলের গাছ- সেটি তাঁর (মায়ের) জ্যাঠামশাইয়ের চতুর্থ পক্ষের বিবাহিত স্ত্রী। এই ফুলগাছ বিয়ের পরে আরও একটি (মানুষী) বিয়ে

> করেছিলেন এবং তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। জ্যাঠামশাই মারা যাওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত ফুল গাছটি বেঁচে ছিল। এ বাড়ির পুত্রবধুদের ঐ ফুলগাছ দেখিয়ে বলা হত, তোমার শ্বাশুড়িকে প্রণাম করে ঘরে ওঠো।[৫৯]

মানুষের সঙ্গে বৃক্ষের একাত্মতা বোধের এক নিদর্শন বলে আমরা এই সংস্কারকে মনে করি। আবার আমরা কোথাও দেখতে পাই যে, বট ও অশ্বত্থের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে সন্তান কামনার চাপ থেকে। এই বিয়ের মধ্য দিয়ে আসলে লুকিয়ে আছে লোকায়ত মানুষের প্রজননকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কোনো দম্পতি যদি অপুত্রক থাকে তাহলে তারা বট ও অশ্বত্থের বিয়ে দেয়—

> নিঃসন্তান দম্পতি পূর্ণ মান্না ও তরুবালা মান্না পরজন্মে সন্তান লাভের আশায় অবতারণা করলেন এক অত্যাশ্চর্য ঘটনার- বট-অশ্বত্থ গাছের বিয়ে দিয়ে। শুধু নামেই বিয়ে নয়, সত্যিকারের বাজী-বাজনা সহকারে ঘটা করে বিয়ে। বর বট, কনে অশ্বত্থ, নিতকনে নিম আর নিতবর শিমুল।... এখন সেখানে পবিত্র বট-অশ্বত্থকে বর-বউ মনে করে দম্পতিকে আশীর্বাদ করাতে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় সন্ধ্যে দেখায়।[৬০]

আবার আমরা জানি যে, বট ও অশ্বত্থকে লোকায়ত সমাজ শিবদূর্গা বলে মনে করে। আর তাই তাদের বিয়ে দিয়ে বা তাদের লালনপালন করে দেবতাকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এখানে খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই আমাদের মনে পড়ে বড়কাছারির থান বা মন্দির বলে যে সমস্ত জায়গা বিখ্যাত সেখানে কিন্তু মূলত বট ও অশ্বত্থের অবস্থান লক্ষ করা যায়। বড়কাছারি শ্মশানকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এবং সেখানে শিব বা দুর্গার মূর্তি অনেকক্ষেত্রে দেখাই যায় না। মূলত ওই বৃক্ষকেই তারা পুজো করে বা তাদের নানা অভিযোগ ও বাসনার কথা জানান দেয়। রাতে শিব সেই সমস্ত সমস্যার কথা তার অনুচরদের নিয়ে কাছারি বা আদালতের মত পরিবেশ তৈরি করে ও সেখান থেকে মুক্তির পথ বলে দেয়। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুই বৃক্ষকে নিয়ে একটি ভৌতিক পরিবেশের আবহ লোকায়ত সমাজে প্রচলিত আছে। মানুষের এই ধারণা থেকেই কেউ এদের ডাল কাটে না। মানুষের মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে যে যদি কেউ ডাল কাটে তাহলে তার বিপদ হতে পারে। গ্রামের মানুষের জ্বালানির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল গাছের পাতা। কিন্তু বট ও অশ্বত্থের পাতা কেউ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে না। কারণ হিসেবে জানা যায় যে এদের পাতা যে পোড়াবে তার সমস্ত দেহ জ্বলবে। গ্রামের কেউ আবার এদের বিক্রি করতে পারবে না, যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে সেই অর্থ দুই বৃক্ষ সংলগ্ন থানের উন্নতির কাজে ব্যবহার হবে। মানুষ ভক্তি ও ভয়ে এদের কোন অনিষ্ট করে না। গোবর্ধন আচার্য একটি শ্লোকে বলেছেন যে গ্রামের মানুষ বটের ডাল কাটে না। তার পিছনে দেব-দেবীর

অধিষ্ঠানের বিষয় যত না দায়ি, তার থেকে বেশি দায়ি মহিষের শৃঙ্গ তাড়না। এখানে বট-অশ্বত্থের সঙ্গে মৃত্যু পরবর্তী চিন্তাভাবনার কথা বলা হয়েছে। কেননা আমরা পশ্চিম বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বট ও পাকুড়ের বিয়ে দেওয়ার মধ্যে যেমন সন্তান লাভের বিষয় থাকে তেমনি করে থাকে নরকভীতি দূর করার কামনা। আমরা সহজেই বুঝতে পারি এখানে যমের অধিষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে কোথাও। আমরা বট ও অশ্বত্থের বিয়ে বা পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে লোকায়ত সমাজের প্রকাশিত ভাবনাগুলি হলো—

১) বৃক্ষের প্রতি নির্ভরতা থেকেই মানুষ এদের পুজো করে।

২) এই বৃক্ষপুজোর মধ্য দিয়ে লুকিয়ে থাকে মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক মনোভাব।

৩) বৃক্ষের পুজো ও তাদের বিয়ের দেওয়ার মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষ প্রজননকেন্দ্রিক বিশ্বাসকে ধারণ করে চলে।

৪) বৃক্ষপুজোর মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের নাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য অর্জনের বিষয়টি মনে রাখে।

৫) আমরা বৃক্ষপুজোতে মানুষের পরিবেশকেন্দ্রিক মানসিকতার প্রতিফলনকে দেখতে পাই।

৬) বৃক্ষপূজা আসলে মানুষের পূর্বপুরুষ পূজার সমগোত্রীয় হিসেবে দেখার পরিসর তৈরি করে।

এই নানা ভাবনার সমাবেশ আমরা বৃক্ষকেন্দ্রিক পূজা বা বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের বিয়েতে লক্ষ্য করতে পারি। আমাদের এই পরিসরে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। আমরা মূলত বৃক্ষপূজা বা বৃক্ষের বিয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের উর্বরতা, প্রজননকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস ও এই গোটা বিষয়টির মধ্য দিয়ে মানুষের পরিবেশকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা কীভাবে ধরা পড়ছে সেই বিষয়েই আলোচনা করব। গ্রামের মানুষ যে এই বট ও অশ্বত্থকে পুজো করে তা কি কেবল নিজের পুণ্যলাভ বা নাম প্রতিষ্ঠার জন্য? নাকি বট ও অশ্বত্থকে কেন্দ্র করে যে পুজো-আচার ও সাহিত্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে গ্রামীন মানুষের পরিবেশভাবনা প্রকাশিত হয়? মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, যখন সে অরণ্যচারী ছিল তখন তার মধ্যে প্রকৃতি আর পরিবেশ এদের মধ্যে কোনো ভিন্ন ধারণা নিয়ে আসত না। ক্রমে মানুষ সভ্য হয়েছে। প্রকৃতি নিজের মত করে বিরাজমান কিন্তু মানুষ তার চারপাশের নানা পরিসরকে নিয়ে তৈরি

করেছে পরিবেশ। যেখান থেকে মানুষ তার সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপাদান সংগ্রহ করে। তাই প্রকৃতি আর পরিবেশ সমার্থক নয়। মানুষ নিজের সুবিধা মতো নিজের পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রকৃতি থেকে অবাধে লুণ্ঠন করছে। ফলে সমানতালে বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। মানুষ যখন এই বিপদের দিকটি বুঝছে তখন এই পরিবেশ সচেতনতার দিকটিও গড়ে উঠছে। মানুষ ও পরিবেশের সমস্ত উপাদানের সমান অধিকারের জন্য গড়ে উঠেছে ‘পরিবেশ নীতিবিদ্যা’। এই গড়ে ওঠা নানা তত্ত্বের মধ্য দিয়ে মানুষ আসলে পরিবেশকে দূষণমুক্ত ও পরিবেশে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে চাইছে। পরিবেশ রক্ষাকে কেন্দ্র করে যেমন নানা আন্দোলন গড়ে উঠছে তেমনি সাহিত্যিকরাও তাদের সাহিত্যের মধ্যে এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দিচ্ছে। বট ও অশ্বত্থকেন্দ্রিক যে সাহিত্য-সংস্কৃতি সেখানে আসলে মানুষের পরিবেশ ভাবনাই প্রকাশিত হয়। বট ও অশ্বত্থকে কেন্দ্র করে যে বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে তাকে রক্ষা করা উচিত বা প্রয়োজনীয় বলে মানুষ মনে করে। এই চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি দেখা যায় তার মৌখিক সাহিত্যে। মানুষ জানে যদি এই দুই সংসার বৃক্ষ বিনিষ্ট হয় তাহলে তার চারপাশের পরিবেশ চরমভাবে টাল খেয়ে পড়বে। তাই লৌকিক আখ্যানগুলিতে আমরা দেখতে পাই এদের প্রয়োজনীয়তার কথা। তার প্রতিদিনকার ব্যবহারিক জীবনে তাই এদের টিকিয়ে রাখার জন্য নানা গঠনমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেব-ভাবনা, নানা অলৌকক ভাবনা ও আচার-অনুষ্ঠান। এই সবটাই আসলে মানুষের পরিবেশ সচেতনতার কারণে বলে মনে হয়।

বট ও অশ্বত্থের বিয়ে বা পুজোকেন্দ্রিক আচার-সংস্কৃতিতে এই উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস কাজ করেছে বলে আমাদের মনে হয়। কেননা আমরা সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখতে পাই অপুত্রক দম্পতি নিজেদের সন্তান কামনায় বট ও অশ্বত্থের বিয়ে দিয়ে থাকে। আমরা এই সন্তান কামনা নানা জাতির সংস্কৃতিতে দেখতে পাই। আমাদের বাংলায় যে সমস্ত ব্রত প্রচলিত আছে তার বেশ কিছু সন্তান কামনা থেকে জাত। বাংলায় ষষ্ঠী ঠাকুরের পুজো হয় মূলত সন্তান কামনা থেকে। আমরা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত এলাকায় দেখতে পাই এই ষষ্ঠী ঠাকুরকে রাখা হয় বট বা অশ্বত্থের তলায় বা তার ডালে। ফলে লোকায়ত মানুষের মনে বট বা অশ্বত্থের সঙ্গে ফার্টিলিটি কাল্টের যে যোগ রয়েছে তা স্পষ্ট হয়—

> কোনো কোনো যায়গায় সুদূর পথের মাঝে বট-অশ্বত্থ গাছ বসিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তা নাকি শিবদূর্গার বিয়ে। বিবাহ মানেই উর্বরতাকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস থেকে তার উৎপত্তি।[৬১]

আমাদের মনে হয়েছে বট ও অশ্বত্থের সঙ্গে শিব দূর্গার প্রসঙ্গ আনা হয়েছে পরে। এই শিবদুর্গার প্রসঙ্গ আসলে লোকায়ত ধ্যান-ধারণাকে আর্যীকরণের জন্য বলে মনে হয়। কিন্তু সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ভাবনা প্রকাশিত হয়; যেখানে মানুষের উর্বরতা বা প্রজননকেন্দ্রিক আচার-সংস্কৃতির মধ্যে ধরা আছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এই বট ও অশ্বত্থের সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর থানের যোগ খুবই নিবিড় হয়ে থাকে। বাংলার লৌকিক দেবদেবীর বহু থান এই দুই বৃক্ষের নীচে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া দক্ষিণবঙ্গের লোকায়ত সমাজের প্রতিটি গ্রামের রাস্তার পাশে সাদা কাপড় পরানো, সিঁদুর ও মালা দিয়ে সাজানো বট-অশ্বত্থ দেখা যায়। এবং এই বৃক্ষের নীচে থাকে কোনো লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি। ফলে লোকায়ত সমাজে বট অশ্বত্থের সঙ্গে লৌকিক দেবদেবী মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আর এই দুই বৃক্ষকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি ও এদের সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর সম্পর্কের মধ্যে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ সংরক্ষণের ভাবনা প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

৪.৫ উপসংহার

বাংলার লৌকিক দেবদেবী মানুষের নির্দিষ্ট চাহিদার থেকে পূজিত হয়ে আসছে। জল-জঙ্গলে ঘেরা দক্ষিণবঙ্গের দেবদেবী মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনের নীরব সাক্ষী। জীবন-জীবিকার দিক থেকে অসহায় মানুষ এই সমস্ত দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করেই দিন শুরু করে। মানুষের জীবনের যা কিছু প্রাপ্তি হয় তা এই সব দেবদেবীর দান বলেই মনে করে। ফলে বলা যায় লোকায়ত মানুষ এই আদিম অরণ্যকেন্দ্রিক দেবদেবীকে পরম ভয় ও ভক্তিভরে পূজা করে আসছে। এই সমস্ত দেবদেবীর কৃপা ছাড়া কোনো কিছুই যে পাওয়া সম্ভব নয় তা এই সমস্ত মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করে। তাই কেউ জল-জঙ্গল থেকে মাছ ও মধু পেতে চায় তাহলে তারা বনবিবিকে পুজো করে সন্তুষ্ট করে। কৃষি থেকে ফসল পাওয়ার জন্য মাঠের আলে বেনাকি ঠাকুরের পুজো করে। আবার সন্তান পাওয়া বা সন্তানের সুস্থতার জন্য পঞ্চানন্দের থানে হত্যে দেয়। ফলে দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী মানুষের কৃষি, প্রজনন ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক মানসিকতার থেকে সৃষ্টি বলে ধরা হয়। এই সমস্ত দেবদেবীকে নিয়ে যে আখ্যান প্রচলিত আছে সেখানে এই সমস্ত বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে। আমরা উপরের আলোচনা

থেকে দেখতে পেলাম যে, লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক আখ্যানে নানা বিষয়ের সমবায়ে গড়ে উঠেছে। এই আখ্যানের মধ্যে বাংলার সমাজ ইতিহাস ও ধর্মের ইতিহাসকে পাঠ করা যায়। এই সমস্ত ছাড়িয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা হল এই সমস্ত আখ্যানে ও দেবদেবীর মধ্যে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ নিয়ে যে চিন্তাভাবনা তার হদিশ খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা জানি যে বর্তমান সময়ে আমরা সর্বাত্মক পরিবেশ বিপন্নতার যুগে বাস করছি। মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে। কৃষি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুতে বিজ্ঞানের প্রয়োগে পরিবেশের চরম ক্ষতি হয়ে চলেছে। সেখানে লৌকিক দেবদেবী আজকের সময়েও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আজন্মের ইতিহাসকে নিজের আচার-সংস্কৃতির মধ্যে ধারণ করে চলেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও সভ্যতার উন্নতির নাম করে আমরা প্রকৃতি থেকে দূরে চলে যাচ্ছি কিন্তু এই দেবদেবীর পুজোর মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষ প্রকৃতিকে রক্ষা করার মানসিকতাকে বহন করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখছে। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে মানুষ যে স্পর্শমূলক, অনুকরণমূলক আচার অনুষ্ঠান পালন করে তার মধ্যে মানুষের পরিবেশ চেতনা প্রকাশিত হয়। এই পরিবেশ চেতনায় কোনোভাবেই পরিবেশের উপাদানকে জোর করে বা মুনাফার জন্য কেড়ে নেওয়ার মানসিকতা থাকে না। বরং এই সমস্ত দেবদেবীকে ঘিরে মানুষের কর্মাকাণ্ডের মধ্যে পরিবেশকে রক্ষা করার কথা বলছে। দেবদেবীর থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আখ্যানে পরিবেশের ভারসাম্য বজায়ের মানসিকতা ধরা পড়ে। আমরা এই মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে দেখতে পেলাম মানুষ কিভাবে দেবদেবীর থানের পাশে পুকুর, বৃক্ষ থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত প্রাণকে রক্ষা করে সেখানকার পরিবেশের ভারসাম্যকে বজায় রাখছে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের অনেক আগেই লোকায়ত মানুষ নিজেদের দেবদেবী ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজের চারপাশের পরিবেশ রক্ষা করার কথা বলে এসেছে। এই পরিবেশকে রক্ষা করার মানসিকতা আজকের সময়ের মতো নয়। পরিবেশকে রক্ষা করা বা প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে থাকা লৌকিক দেবদেবীর মতো করে এদের পূজিত মানুষের সহজাত অভ্যাস। ফলে এই দেবদেবীর আখ্যানের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে মানুষের প্রকৃতিকে পুজো করে পরিবেশের ভারসাম্যকে টিকিয়ে রাখার মানসিকতা আর এই মানসিকতা দেবদেবীর আশ্রয়ে মৌখিক আখ্যানের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণেন্দু। *বিশ্বপরিবেশ আন্দোলনের পথিকৃৎ রাচেল কার্সেন।* কলকাতা: একাদেমী পত্রিকা। ২০০৮-০৯। পৃ ৭৬।

২। Glotfelty, Cheryll and Fromm, Harold (Ed.). *The Ecocriticism Reader: Landmarks In Literary Ecology.* London: The University Of Georgia Press. 1996. Pg. xix.

৩। Glotfelty, Cheryll and Fromm, Harold (Ed.) *The Ecocriticism Reader: Landmarks In Literary Ecology.* London: The University Of Georgia Press. 1996. Pg. xix.

৪। সেন, নবেন্দু (সম্পা)। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা।* কলকাতা: রত্নাবলী। ২০০৯। পৃ ৬৫৯।

৫। Glotfelty, Cheryll and Fromm, Harold(Ed.) *The Ecocriticism Reader: Landmarks In Literary Ecology.* London: The University Of Georgia Press. 1996. Pg. 69.

৬। চক্রবর্তী, পার্থ। *প্রকৃতি পরিবেশ নিসর্গনীতি: রাজনৈতিক ও দার্শনিক অনুসন্ধান।* কলকাতা: সেতু ।২০১২। পৃ ২৫।

৭। চক্রবর্তী, পার্থ। *প্রকৃতি পরিবেশ নিসর্গনীতি: রাজনৈতিক ও দার্শনিক অনুসন্ধান।* কলকাতা: সেতু। ২০১২। পৃ ২৬।

৮। নন্দী চক্রবর্তী, কবিতা। *বাংলা সাহিত্যে পরিবেশ চেতনা: রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ জীবনানন্দ।* কলকাতা: আশাদীপ। ২০১৭। পৃ ৪০।

৯। Glotfelty, Cheryll and Fromm, Harold(Ed.) *The Ecocriticism Reader: Landmarks In Literary Ecology.* London: The University Of Georgia Press. 1996. Pg xix.

১০। Glotfelty, Cheryll and Fromm, Harold (Ed.) *The Ecocriticism Reader: Landmarks In Literary Ecology.* London: The University Of Georgia Press. 1996. Pg. xvii

১১। Buell, Lawrence. *The Future of Environmental Criticism: Environmental crisis and Literary imagination.* Blackowell Publishing.2005. p. 138

১২। Glotfelty, Cheryll and Fromm, Harold (Ed.) *The Ecocriticism Reader: Landmarks In Literary Ecology.* London: The University Of Georgia Press. 1996. P 143.

১৩। চক্রবর্তী, বরুণ (সম্পা)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ।* কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ২০০৪। পৃ ৪৯৪।

১৪। মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *লোককথা।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী-সংস্কৃতি কেন্দ্র। ১৯৯৮। পৃ লেখকের অংশ।

১৫। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোক সাহিত্য (চতুর্থ খণ্ড)।* কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৬৬। পৃ ১৩।

১৬। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোক সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)।* কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৫৭। পৃ ৩৯৭।

১৭। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোক সাহিত্য (চতুর্থ খণ্ড) ।* কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৬৬। পৃ ১৩।

১৮। রায়, তপন। *লোককথার তত্ত্বকথা।* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। ২০১০। পৃ ১১।

১৯। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোক সাহিত্য (চতুর্থ খণ্ড)।* কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৬৬। পৃ ১৩।

২০। আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলকাতা। ২০০০। পৃ ২০০।

২১। প্রধান, শ্যামাসুন্দর। *কিংবদন্তি: উৎস নির্ণয় ও বিশ্লেষণ।* কলকাতা: প্রতিভাস। ২০১১, পৃ ১০৮।

২২। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে।* কলকাতা: বুক ট্রাস্ট। ১৯৯৯। পৃ ১৫২।

২৩। *শ্রী শ্রী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীপীঠের প্রাচীণ ইতিহাস এবং দেবী মাহাত্ম্য।* প্রকাশক: শ্রী শ্রী ত্রিপুরাসুন্দরী সেবা সমিতি। ২০০১। পৃ ১১।

২৪। তথ্যদাতা- সুনীল সরকার। ০৬। ০৪। ০২১৫। রবিবার। কালীমন্দির। গ্রাম+ পো: ময়দা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

২৫। তথ্যদাতা- সুনীল সরকার। ০৬। ০৪। ০২১৫। রবিবার। কালীমন্দির। গ্রাম+ পো:- ময়দা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

২৬। তথ্যদাতা- রবীন পাকড়াশী। ০৫। ০৪। ২০১৫। রবিবার। বিশালক্ষীর থান। গ্রাম- উত্তরপাড়া, পো:- ময়দা, থানা- মগরাহাট। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

২৭। তথ্যদাতা- রবীন পাকড়াশী। ০৫। ০৪। ২০১৫। রবিবার। বিশালক্ষীর থান। গ্রাম- উত্তরপাড়া, পো:- ময়দা, থানা- মগরাহাট। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

২৮। তথ্যদাতা- গোপাল চন্দ্র হালদার। ৭। ১০। ২০১৬। সোমবার। বিবিমায়ের থান ও আটেশ্বরের থান। গ্রাম- কৃষ্ণচন্দ্রপুর, পো:-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা- মথুরাপুর। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

২৯। তথ্যদাতা- গোপাল চন্দ্র হালদার। ৭। ১০। ২০১৬। সোমবার। বিবিমায়ের থান ও আটেশ্বরের থান। গ্রাম- কৃষ্ণচন্দ্রপুর, পো:-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা- মথুরাপুর। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

৩০। তথ্যদাতা- সুমন্ত চক্রবর্তী। ১২।০৬। ২০১৪। বৃহস্পতিবার। থান- দক্ষিণেশ্বর (দক্ষিণরায়)। গ্রাম-ধপধপি, থানা- বারুইপুর। দক্ষিণ ২৪পরগনা।

৩১। তথ্যদাতা- স্বপন মণ্ডল। ০৯। ০৩। ০২১৫। সোমবার। থান-পঞ্চানন্দ। গ্রাম+পো:- মালঞ্চ মাহিনগর, থানা- সোনারপুর।

৩২। তথ্যদাতা- সঞ্জয় ঘোষ ও মনিশংকর দেবনাথ। ২৮। ০৯। ২০১৬। শৈব তীর্থ। গ্রাম- বড়াশি, থানা- মথুরাপুর। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

৩৩। তথ্যদাতা- সুধীর ব্যানার্জি ও লীলা ব্যানার্জি। ২৭। ০৯। ২০১৬। বিবিমা ও রক্তাখাঁ গাজীর থান। রক্তাখাঁ পাড়া, জয়নগর।

৩৪। তথ্যদাতা- শকুন্তলা নস্কর, ভূপেন্দ্রনাথ নস্কর। ০৪। ০৪। ২০১৫। শুক্রবার। থান- খনেশ্বরীর থান। গ্রাম-বেলেদূর্গা নগর, পো: – বেলেদূর্গা নগর, থানা– জয়নগর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

৩৫। নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি।* কলকাতা: আনন্দ। ২০১৮। পৃ ১৪০।

৩৬। মণ্ডল, নীলরতন। *ডায়মন্ডহারবারের আঞ্চলিক ইতিহাস।* ডায়মন্ডহারবার: পি এম বাকচি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০২। পৃ ১১৩।

৩৭। মণ্ডল, নীলরতন। *ডায়মন্ডহারবারের আঞ্চলিক ইতিহাস।* ডায়মন্ডহারবার: পি এম বাকচি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০২। পৃ ১১৩।

৩৮। তথ্যদাতা- কৈলাস দাস ও সঞ্জয় ঘোষ। পঞ্চানন্দ ও পেঁচ খেচর থান। পালপাড়া, মজিলপুর,

জয়নগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

৩৯। মণ্ডল, নীলরতন। *ডায়মন্ডহারবারের আঞ্চলিক ইতিহাস।* ডায়মন্ডহারবার: পি এম বাকচি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০২। পৃ ৫৯।

৪০। মণ্ডল, নীলরতন। *ডায়মন্ডহারবারের আঞ্চলিক ইতিহাস।* ডায়মন্ডহারবার: পি এম বাকচি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০২। পৃ ৫৮।

৪১। সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ।* কলকাতা: পুস্তক বিপনি। ১৯৯৫। পৃ ৫৩।

৪২। পাড়ুই, অমৃতলাল। *গ্রামোন্নয়ন কথা।* আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৩। পৃ ৩৯।

৪৩। পাড়ুই, অমৃতলাল। *গ্রামোন্নয়ন কথা।* আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৩। পৃ ৪০।

৪৪। তথ্যদাতা- গোষ্ঠবিহারী হালদার। ৭। ১০। ২০১৬। সোমবার। আটেশ্বরের থান। উত্তর কঙ্কনদীঘী, রায়দিঘি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

৪৫। তথ্যদাতা- রাজীব মিশ্র। ০৩। ১০। ২০১৬। বিশালক্ষীর থান। গ্রাম+ পো:- প্রসাদপুর, থানা- সাগরদ্বীপ।

৪৬। রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৩৫৬। পৃ ৪৯১।

৪৭। ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস।* কলকাতা: জেনারেল। ২০১৪, তৃতীয় মুদ্রণ। পৃ ১৪।

৪৮। ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস।* কলকাতা: জেনারেল। ২০১৪, তৃতীয় মুদ্রণ। পৃ ১০।

৪৯। ঘোষ, বিনয়। *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৩৮৬। পৃ ৫৯।

৫০। রায়, ড. নরেন্দ্রনাথ। *উত্তরবঙ্গের লোক দেবদেবী ও লোককথা।* ছায়া পাবলিকেশন। ২০১২। পৃ ৮৫।

৫১। সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ।* কলকাতা: পুস্তক বিপনি। ১৯৯৫। পৃ ৭১।

৫২। ঘোষ, সঞ্জয়। *সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা।* সুচেতনা। ২০১২। পৃ ৮৭।

৫৩। নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশিং। পৃ ৪।

৫৪। নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশিং। পৃ ৪০।

৫৫। রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৩৫৬। পৃ ৪৮৯।

৫৬। অধিকারী, ইন্দুভূষণ। *লোকধর্ম: অতীত ও বর্তমান।* পূর্বাদ্রি প্রকাশনী। ১৯৮৯। পৃ ১০২।

৫৭। নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। পৃ ৩৮।

৫৮। রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৩৫৬। পৃ ৪৭৯।

৫৯। কৃষ্ণকালী, মণ্ডল। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা।* নব চলন্তিকা। ২০০১। পৃ ৩০৩।

৬০। মাল,স্বপন ও ঘোষ, সুখেন্দু নারায়ণ (সম্পা)। *লোক পরিচয়।* ২০১৪। পৃ ৫।

৬১। অধিকারী, গোপাল ও বেরা অমর (সম্পা)। *লোকপরিচয়।* ১৯৯৯। পৃ ১৫।

উপসংহার

দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে মানুষের বিচিত্র কামনার প্রকাশ দেখা যায়। জল-জঙ্গলে ঘেরা এই সমস্ত এলাকার মানুষকে প্রতিদিন জীবনযুদ্ধে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়। লৌকিক দেবদেবী এই সমস্ত মানুষের একান্ত আশ্রয়স্থল। জীবনের নানা উত্থান পতনের সাক্ষী এই সমস্ত দেবদেবী। লোকায়ত মানুষের কাছে এই সমস্ত দেবদেবী খুব কাছের হয়ে থাকে, যেন এদের ঘরের মানুষ এই সমস্ত দেবদেবী। এই সমস্ত দেবদেবীকে 'বুড়িমা' 'বাবা ঠাকুর' প্রভৃতি সম্বোধন প্রমাণ করে এই দেবদেবী লোকায়ত মানুষের একান্ত কাছের। মানুষ নিজের জীবনযাপনের নিরিখেই এদের থান নির্মাণ করে ও এদের পূজার উপাচার হিসেবে খুবই সাধারণ উপাদান দিয়ে পুজো করে থাকে। আসলে লোকায়ত মানুষের সর্বক্ষণের সাক্ষী এই দেবদেবীকে মানুষ নিজের ঘরোয়া পরিবেশে স্থান দিয়েছে। ফলে এদের পূজাচারের মধ্যে শাস্ত্রীয় দেবতার মতো কোনো উচ্চ দার্শণিকতা দেখা যায় না। এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবী মাটির কাছাকাছি অবস্থান করে লোকায়ত মানুষকে প্রহরীর মতো সর্বক্ষণ আগলে রাখে।

লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে মানুষ নানা রকমের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার মনের অব্যক্ত কথাকে প্রকাশ করে। এছাড়া এই সমস্ত দেবদেবী ও তাদের থানকে নিয়ে তৈরি হওয়া আখ্যানে বাংলার ইতিহাসের অনেক বিস্মৃত অধ্যায়কে সামনে হাজির করে। আবার এই সমস্ত আখ্যানের মধ্যে লোকায়ত মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক চিন্তার ছাপ প্রকাশিত হয়। লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মৌখিক সাহিত্যে ও এই সমস্ত দেবদেবীকে কেন্দ্র করে পালিত আচার-আচরণে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ নিয়ে নানা ভাবনার প্রকাশ হতে দেখা যায়। ফলে এই সমস্ত দেবদেবী মানুষের বিচিত্র কামনার দ্বারা পূজিত হয়ে আসছে। লৌকিক দেবদেবী তার অবস্থানের মধ্য দিয়ে এলাকার পরিবেশের ভারসায়কে বজায় রাখে। লৌকিক দবদেবীর থান সংলগ্ন পুকুর, যাকে লোকায়ত মানুষ দেবদেবীর পুকুর বলে মনে করে। এই পুকুরকে মানুষ নানা অলৌকিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পূজো করে এবং এই পুকুরকে তারা কোনোভাবেই দূষিত করে না। আজকের সময়ে যখন বড় বড়

পুকুরকে ভর্তি করে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ হচ্ছে সেখানে এই সমস্ত দেবদেবীর পুকুরে মানুষ কোনোভাবেই নষ্ট হতে দেয় না। লোকায়ত মানুষ এই পুকুরকে পরিবেশের জড় পরিসর ভাবে না। মানুষ এই পুকুরকে জীবন্ত বলে কল্পনা করে। পুকুরে মানুষের এই আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিশ্বাসের কারণে পুকুরের সমস্ত জীববৈচিত্র্য অটুট থাকে। একইভাবে থানের পাশে যে বৃক্ষ থাকে মানুষ তার কোনো ক্ষতি করে না। এর ফলে বৃক্ষের সমস্ত প্রাণ নির্ভয়ে বাস করতে পারে। ফলে লৌকিক দেবদেবীর থানের অবস্থানের মধ্য দিয়ে থানের চারপাশের পরিবেশের ভারসাম্য ও বাস্তুতন্ত্র অটুট থাকে। লৌকিক দেবদেবীর থানে মানুষ স্পর্শমূলক, অনুকরণমূলক যে সমস্ত জাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে তার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃতি নির্ভরতা ধরা পড়ে। আমরা লৌকিক দেবদেবীর আলোচনায় দেখলাম যে, লোকায়ত মানুষ দেবদেবীর থানে পশু পাখি বলি দেয় ও নিজের বুকের রক্ত পূজার উপাচার হিসেবে উৎসর্গ করে। এর মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতা প্রতিফলিত হয়ে। লোকায়ত মানুষ লৌকিক দেবদেবীর পূজার মধ্য দিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে আদিম অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপনের স্মৃতিকে ধরে রাখে। আমরা জানি যে, লোকায়ত মানুষ নাগরিক জীবনের মতো ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দী থাকতে চায় না। পরিবেশের অপার সৌন্দর্য ও মুক্ত বাতাসের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে ভালোবাসে। লোকায়ত মানুষের জীবনযাপনের এই অভ্যাসকে তাদের দেবতার মধ্যেও সঞ্চারিত করেছে। তাই লৌকিক দেবদেবীর থান খোলা আকাশের নিচে, মাথায় ছাদ বিহীন অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। এই সমস্ত চিন্তাভাবনার মধ্যে ও লৌকিক দেবদেবীর থান নির্মাণের মধ্যে আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে মানুষ প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ জানায়।

বর্তমান সময়ে আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। বিজ্ঞানের চরম বিকাশের ফলে আমাদের জীবনযাপনের মানোন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির কারণে পরিবেশের বিপুল ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের আলোকে আজকের মানুষ প্রকৃতির সমস্ত কার্য-কারণের রহস্যকে বুঝতে পেরেছে। ফলে প্রকৃতি নিয়ে মানুষের মনে যে রহস্যের, ধর্মীয় বাতাবরণ ছিল আজকে তা উধাও হয়ে গিয়েছে। এর ফলে মানুষ প্রকৃতিকে আর শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, প্রকৃতির সমস্ত প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে না। মানুষের প্রকৃতির প্রতি এই মনোভাব ও প্রকৃতিকে সম্পদ ভাবার ফলে পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু লোকায়ত স্তরে মানুষ বিজ্ঞানের এই মানসিকতার দ্বারা চালিত না হয়ে তাদের

বংশপরম্পরায় পরিবেশ সংরক্ষণের ঐতিহ্যকে বহন করে চলে। লোকায়ত মানুষ কৃষি থেকে বেশি ফসলের জন্য বিজ্ঞানের থেকে এই সমস্ত দেবদেবীর আশীর্বাদকে বেশি করে বিশ্বাস করে। তাদের এই বিশ্বাসের প্রতিফলন দেবদেবীকে কেন্দ্র করে মৌখিক আখ্যানে ধরা পড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন গ্রামের পর গ্রামের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়, মানুষের জীবন বিপন্ন হয় তখন মানুষ এই সমস্ত দেবদেবীর কাছে আশ্রয় নিয়ে প্রকৃতির রুদ্র রোষ থেকে বাঁচতে চায়। আমরা উপরের আলোচনায় দেখলাম যে, নদীর জল যাতে গ্রামে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য দেবদেবী নদীবাঁধ পাহারা দিচ্ছে। এই ঘটনা অলৌকিক, বা মনগড়া বলে মনে হতেই পারে কিন্তু লোকায়ত মানুষের পরিবেশ রক্ষার মানসিকতা ও প্রকৃতির তাণ্ডব থেকে বাঁচার জন্য এই দেবদেবী যে একান্তই ভরসা সেই মানসিকতা প্রকাশ পায়। এবং লোকায়ত মানুষ যে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারকারী মানসিকতা নিয়ে দেখে না সেই মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে গোটা বিষয়টিতে মানুষের পরিবেশ রক্ষা করার মানসিকতা ও বর্তমানের পরিবেশের ধ্বংস করার বিপরীত মানসিকতা প্রকাশ পায়। লোকায়ত মানুষের প্রকৃতিকে রক্ষা ও বিস্তারের যে মানসিকতা তা তাদের লৌকিক দেবদেবীর পূজার মধ্যে ধরা পড়ে। লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে প্রকৃতির যোগের কথা এদের পূজার উপকরণ ও পূজাপদ্ধতির মধ্যে কেবলমাত্র ধরা পড়ে না। আমরা উপরের আলোচনার মধ্যে দেখলাম যে, এই সব দেবদেবীর মূর্তির মধ্যেও মানুষের অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার নানা প্রসঙ্গ ধরা আছে। এবং এই সমস্ত দেবদেবী যে আদিম, অনার্য আদিবাসীদের পূজিত দেবদেবী তা এদের মূর্তির উগ্র, ভয়াল রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। লৌকিক দেবদেবীর আলোচনায় বলা হয়েছে যে, এই দেবদেবী কেবলমাত্র লোকায়ত মানুষের ধর্মের পরিসর নয়। এই দেবদেবীর মধ্যে আর্য-অনার্যের সংঘাত সমন্বয়ের কথা ধরা আছে। এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের জটিল রাজনীতির কবলে পড়ে এই সমস্ত দেবদেবীর রূপ ও পূজা পদ্ধতি কীভাবে পরিবর্তীত হয়েছে তা এই সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি ও পূজাপদ্ধতি দেখলে পরিষ্কার হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কবলে পড়ে বহু লৌকিক দেবদেবী শাস্ত্রীয় মর্যাদায় উন্নীত হলেও এই সমস্ত দেবদেবী তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে পালটে ফেলেনি। লোকায়ত সমাজে পূজিত এই দেবদেবীর বাইরের শাস্ত্রীয় খোলস সরিয়ে গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় এদের আদি উৎস ভূমিকে খুঁজে পাওয়া যায়। এবং দেখা যায় যে এই সমস্ত দেবদেবী মানুষের উর্বরতাকেন্দ্রিক, প্রজননকেন্দ্রিক ও সর্বোপরি

অরণ্যকেন্দ্রিক মানইকতার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়ার বাসনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা লৌকিক দেবদেবীর থানের স্বরূপ আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখলাম যে, এই সমস্ত দেবদেবীর থান মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা আমরা দেখতে পাই যে, লৌকিক দেবদেবীর বেশ কিছু থান খড় ও মাটির দেওয়াল যুক্ত হয় আবার কিছু কিছু থান টালির ছাউনিযুক্ত হয়ে থাকে এবং শেষে দেখা যায় যে, অনেক দেবদেবীর থান পাকা দেওয়াল যুক্ত ও উপরের ছাদ দ্বারা সুসজ্জিত মন্দিরে উন্নীত হয়েছে। মানুষ যখন অর্থনৈতিকভাবে অসহায় ছিল, মানুষের জীবনে খাদ্যের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। এই পর্বে মানুষ তাদের দেবদেবীকে স্থায়ী আস্থানা দিতে পারেনি তাই লৌকিক দেবদেবীর বহু থান প্রাকৃতিকভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা আসার ফলে তার মনে ধর্ম ও শিল্পের বিকাশ লক্ষ করা যায়। মানুষের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থার ফল হিসেবে লৌকিক দেবদেবীর থানকে পাকা মন্দিরে পরিণত হতে দেখা যায়। যদিও লৌকিক দেবদেবীর থান যতই সুসজ্জিত পাকা মন্দিরের পর্যায়ে উন্নীত হোক না কেন লোকায়ত মানুষ একে থানই বলে থাকে।

লৌকিক দেবদেবীর থান ও তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া আখ্যানে লোকায়ত মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনের নানা কামনা ধরা থাকে। এই কামনার মধ্যে প্রধানতম হল শস্যবৃদ্ধি, সন্তান লাভ, জীবন ও জীবিকার সুস্থিরতা লাভ। ফলে এই দেবদবীকে ঘিরে যে আচার পালন করা হয় তাতে উর্বরতাকেন্দ্রিক মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। দেবদেবীকে ঘিরে যে আখ্যান প্রচলিত আছে তার মধ্য দিয়ে এই সমস্ত দেবদেবী সমাজের নানা পরিবর্তনের মধ্যেও স্বমহিমায় লোকায়ত মানুষের মনে ভয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিরাজ করছে। আসলে লৌকিক দেবদেবী লোকায়ত মানুষের কাছে সব সময়ের জাগ্রত প্রহরী। মানুষের ভালোমন্দের সর্বক্ষণের সাক্ষী এই দেবদেবী। বাংলার গ্রাম তথা লোকায়ত সমাজের নানা পরিবর্তন, রূপান্তর হয়েছে কিন্তু এই সমস্ত দেবদেবীর প্রতি মানুষের ভয় ও শ্রদ্ধা কোনোভাবেই কমেনি। তাই আজকের বিজ্ঞানের দিনেও মানুষের সন্তান লাভের জন্য পাঁচু ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে, শস্যের বৃদ্ধির জন্য বেনাকি পুজো করে এবং পুকুর থেকে বেশি মাছের জন্য পুকুর পাড়ে অস্থায়ীভাবে মাকাল ঠাকুরের থান করে পুজো করে। এবং সর্বোপরি বর্তমানের

পরিবেশের চরম বিপন্নতার সময়ে লোকায়ত মানুষ এই সমস্ত দেবদেবী ও তাদের থানে যে আচার অনুষ্ঠান পালন করে তাতে পরিবেশের সমস্ত প্রাণের বাঁচার অধিকারের মানসিকতা প্রকাশ করে চলেছে। পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মূল কথা যদি হয় মানুষের পালিত সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কীভাবে পরিবেশ ভাবনা প্রকাশিত হয় তার খতিয়ান তৈরি করা বা মানুষ সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে কীভাবে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিচ্ছে তা দেখা; তাহলে লৌকিক দেবদেবীর থানকেন্দ্রিক আখ্যান ও থানে পালিত সংস্কৃতিতে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে চলেছে। তাই আমরা বর্তমান সময়েও দেখতে পাই লৌকিক দেবদেবীর থান খোলা আকশের নীচে বা জঙ্গলের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে অবস্থান করতে। দেবদেবীর এই খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করার মধ্যে লোকায়ত মানুষের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। লৌকিক দেবদেবীর থানে বৃক্ষের অবস্থান ও সেই বৃক্ষকে পুজো করার মধ্য দিয়ে মানুষ পরিবশে সংরক্ষণ রক্ষা করার কথা বলে চলেছে। আসলে লৌকিক দেবদেবীকে পুজোর মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষ প্রকৃতিকে পুজো করে চলেছে। এভাবেই লৌকিক দেবদেবীর মধ্য দিয়ে লোকায়ত মানুষের পরিবেশ চেতনা বা পরিবেশ রক্ষার মানসিকতা প্রকাশ পায় যা তার সাহিত্য-সংস্কৃতির হাত ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

পরিশিষ্ট

১। সাক্ষাৎকারদাতা- বিমল মণ্ডল (৭০)

০৫। ০৪। ২০১৪। রবিবার, দুপুর ১.৩০ মি।

থান- গাজিবাবা

ঠিকানা- হাসানপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আখ্যান— এখানকার জমিদার ছিলেন প্রতাপ রায়চৌধুরী। উনি ছিলেন জমিদার। একসময় এই জমিদারের জমির খাজনা সব বাকি পড়ে গিয়েছিল। ফলে জমি সব খাস হয়ে যায়। তখন সাহেবদের আমল, ফলে জমিদারের কোর্টে ডাক পড়ে। একদিন গাজিবাবা বলল— 'তুই চিন্তা করিস না। কোর্টে যখন তোকে ডাকছে সাহেবরা, তখন তুই কোর্টে যাস। আর একটি ভ্রমরা যখন তোর মাথার উপরে উড়বে ওই সময় তুই খাতাপত্রগুলো দেখাবি, খাজনা সব মুকুব করে দেব আমি।' তো সেই মত তিনি কোর্টে গেল। যখন ঐ ভ্রমরা মাথার উপরে ঘুরতে লাগল তখন তিনি খাতা খুলে দেখাল। কোর্টে তাঁর সমস্ত খাজনা শোধ হয়ে গেল। এর পর তিনি জমি সব আবার ফিরে পেল। তারপর এখানে তিনি মাজার তৈরি করে দেয়। চৌধুরীরা মাজারের পাশে একটা পুকুর তৈরি করতে চাইল। এক কোদাল মাটি কেটেছে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছা খুলে যায়। তার পর থেকে পুকুর কাটা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ঐ একটুখানি গর্ত থেকে বিশাল আকার পুকুর ধারণ করে ও তার চারপাশ বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। মক্কায় সিন্নি দিলে তা এই পুকুরেই ভেসে ওঠে। কেউ মনস্কামনা করে মাজারের পুকুরে সিন্নি দিলে তা যদি ভেসে ভেসে ঘুরে ঘুরে ঐ লোকের কাছে আসে বা হাতে আসে তাহলে তার বাসনা পূর্ণ হয়।

একবছর এই অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না। মাঠ সব শুকনো হয়ে ফেটে যাচ্ছে। ১৭ই শ্রাবণ মাসে গাজীবাবা একদিন বলল— 'আমি একটু পানি আনতে যাচ্ছি আল্লার কাছে, আমি যতক্ষণ না আসব তোরা কেউ মাজারের দরজা খুলিস না।' ১৭ই শ্রাবণ গাজিবাবা আল্লার কাছে পানি আনতে যায়। তিনি যখন পানি নিয়ে ফিরে আসছিল, সেই সময় আকাশে মেঘ করে এসে পানি শুরু হয়। তখন বাবার কথা ভুলে গিয়ে কেউ আচমকা দরজা খুলল আর সেই সময় থেকে উনি দেহ রাখলেন, আর জীবিত হলেন না। এর পর থেকে চৌধুরীবাবুরা প্রথম পূজা দেয়, তারপর অন্য ধর্মের মানুষেরা পূজা দেয়। এখন পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত আছে।

২। সাক্ষাৎকারদাতা- নগুরালি মোল্লা

০৫। ০৪। ২০১৪। রবিবার, দুপুর ১ টা।

থান- দরগা ও পঞ্চানন্দ

ঠিকানা- রামচন্দ্রপুর, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪পরগনা

আখ্যান- আমাদের আড়াপাঁচ মৌজায় একটা পঞ্চানন্দের থান আছে আর একটি মন্দির আছে সাত কাঠা জায়গা ঘিরে। পাকড়াশী বলে একঘর বামন ছিল ওখানে। তারাই এই থান প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা ওখানে পুজো দিত। এরাই খানিকটা পঞ্চানন্দের নামে জায়গা দিয়েছিল। সেই জায়গায় তখনকার সময়ে পুজো খুব হত। ঐ মন্দিরের একটা পুকুর আছে। পাকড়াশী ও রমজান মোল্লারও জমিদার ছিল। এরপর এদের মধ্যে হিংসা দেখা দিল। এতে পাকড়াশিরা জমি ছেড়ে চলে যায়। আবার রমজান মোল্লা তখনকার জমিদারী আমলে আকিলি কেটে সেই জমিটা আয়ত্ত করে। পরে বিনয়কৃষ্ণ মজুমদারে কাছে বেচে সে উঠে যায় ভাঙড় ব্লকে। তারপর বিনয়কৃষ্ণ ঐ থানকে মন্দিরে পরিণত করে। ওখানে দুটো পুরানো পুকুর আছে। সেখানে প্রচুর জঙ্গল ছিল। তাই প্রচুর সাপ ছিল। মানে কেউটে সাপ ছিল ভর্তি। আমরা জৈষ্ঠ্য মাসে যখন একটু একটু বৃষ্টি পড়ত, সাপের লড়াই দেখতে যেতাম। তারা ফোনা তুলে লড়াই করত। তার উত্তেজনা কী তা আমরা মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখতাম বসে বসে। আর ওরা ঘাসের উপর দিয়ে মাথা তুলে জড়িয়ে লড়াই করত। এরা আমাদের আক্রমণ করত না। ঐ থানের পাশে নরেন সরদার নামে একজন বসবাস করত। আর মাছ ধরতে গিয়ে আঁটলে কেউটে সাপ ঢুকে যেত ও আঁটলের মুখটা খুলে দিয়ে বলত- মা তুই চলে যা। আর সাপ কথা শুনত, সে আস্তে আস্তে চলে যেত।

৩। সাক্ষাৎকারদাতা- সুমন্ত চক্রবর্তী

১২।০৬। ২০১৪, বৃহস্পতিবার

থান- দক্ষিণেশ্বর (দক্ষিণরায়)

ঠিকানা- ধপধপি, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪পরগনা

আখ্যান- এমনিভাবে বনের ভিতর বাবার মহিমা কতদিন প্রচারিত ছিল কেউ জানে না। কাঠ কাটতে কাটতে একদিন বন প্রায় শেষ হয়ে গেল। দু-একজন করে মানুষ এল। বাড়ি তৈরি হল, রাস্তা তৈরি হল, ধীরে ধীরে গড়ে উঠল গ্রাম। নদী পার হয়ে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার জন্য আস্তে আরম্ভ করল এখানে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এই অঞ্চলের কথা বারুইপুরের জমিদার শ্রীমান মদনমোহন চৌধুরী শোনা মাত্রই নিজ অধিকার ভেবে জমিদারি ঘোষণা করে দিলেন এবং খাজনা আদায়ের জন্য দলবল সঙ্গে নিয়ে তিনি ভ্রমণের ছলে সেখানে যাত্রা করলেন। আসলে তিনি জানতেন না, স্বয়ং বাবা দক্ষিণেশ্বর সেখানে বনপতি হয়ে অবস্থান করছেন ঝাউগাছের তলায়। না জেনে জমিদার সেই ঝাউগাছের গোড়ায় প্রস্রাব করলেন। হঠাৎ কোথা থেকে রাশি রাশি বিষাক্ত ভিমরুল এসে জমিদার ও তার দলবলকে ঘিরে ফেলল। মনে মনে রাজা এই উৎপাতের কারণ কী তা অনুধাবন করতে লাগলেন। তখন তাঁর মনে হয় এ নিশ্চয়ই কোনো দৈব-বিপাকে পড়েছেন তিনি। এমত অবস্থায় জমিদার কাতরে বলেন—'আমি মূঢ় মতি, আমি কোন দোষ করলে ক্ষমা কর'। জমিদার স্তবে বাবা দক্ষিণেশ্বর তুষ্ট হন এবং তাঁকে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এমন সময় আকাশবাণী হয়—"সুন্দরবনে থাকি আমি দক্ষিণেরশ্বর/ রক্ষা করি বনপুরি হয়ে বনেশ্বর"। 'এই ঝাউগাছ তলে আমার বহুকাল অধিষ্ঠান। চারিদিকে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়। কিন্তু এসব ভয়কে উপেক্ষা করে যে সমস্ত জাঙ্গুলিয়ারা এসে আমার সেবা করে, আমার পূজা দেয় তারা যে ভাবে ডাকে আমি তাতেই খুশি হই এবং তারা বিপদে পড়লে তাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। আর যারা অহংকারে আমাকে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দেয় তারা কেউই আমার রোষের থেকে রক্ষা পায় না। আর তুই- ঝাউগাছ তলে আমার থান ছিল/ তুই সজ্ঞানে সেখানে প্রস্রাব করলি? সেই কারণেই তুই কষ্ট পেলি। যদি নিস্তার পেতে চাস তাহলে এখানেই আমার পূজার প্রচার কর এবং আমার থাকার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। প্রতি মধ্যাহ্নে আমার ভোগ হবে এবং সন্ধ্যায় আরতি। প্রতিদিন নিয়ম নীতি মেনে আমার ভোগের ব্যবস্থা করা হবে। মঙ্গল ও শনিবারে বিশেষ পূজা এবং হোম ও বলি দিয়ে আমার পূজা করবি। আর সমস্ত কাজের জন্য আমার প্রকৃত ভক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রী ঊর্ধ্বচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করবি।' এবং বাবা আরো বলে 'আমার প্রিয় ভক্ত পূজাভোগ দিয়ে নিত্য আমার গুণগান করলে তারা বংশানুক্রমে সুখে শান্তিতে থাকবে'। বাবার আদেশ শিরোধার্য করে জমিদার মদন চৌধুরী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—'অপরাধ ক্ষমা কর হে কৃপাময়, আমি

একজন মূঢ় ব্যক্তি তাই অজ্ঞানতার কারণে আজ দিবশেষে এই ভুল করলাম। হে প্রভু প্রসন্ন হও আমার প্রতি, তব আজ্ঞা যেন যথার্থভাবে পালন করতে পারি।' এরপর জমিদার সেই দিন থেকেই বন কেটে মন্দির তৈরির কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ঝাউতলেই তৈরি হল বাবার মন্দির। আজ থেকে প্রায় ৪৫০ বছর আগে মাঘ মাসের প্রথম দিনে বাবার মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। সেই থেকে প্রচারিত হল বাবার মহিমা।

প্রথমে বাবাকে নিরাকার ভেবে মাটির ঢিবির উপর ঘটে পূজা করা হত। কিন্তু লীলাময় ভগবান লীলার কারণে তাঁর মূর্তি স্বপ্নযোগে দেখান তাঁর প্রিয় ভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রী ঊর্ধ্বচন্দ্র মহাশয়কে। রণসাজে সজ্জিত বাবার ভীষণ রূপ দেখে পূজারি ব্রাহ্মণ ভয়ে শিউরে ওঠেন। তাঁর মনে হয় এখনই বোধ হয় বাবা কোনো প্রলয় লীলা আরম্ভ করবেন। কিন্তু করুণাময় জগত পিতা প্রিয় ভক্তকে আশীর্বাদ করে কিন্তু শুভলগ্নে ভয় নেই, রক্ষা পাবে তোমার বংশ। আর এই রুদ্রমূর্তি গঠন করে আমার পূজা করলে আমি খুশি হব এবং তুমি যখনই আমায় স্মরণ করবে তখনই আমাকে স্বপ্নে দেখা পাবে- স্বপ্নভঙ্গ হলে ঊর্ধ্ববাবার আদেশ সত্য জ্ঞান করে নিজের, গ্রামবাসী এবং ভক্তদের নিঃস্বার্থ দানে পুনরায় মন্দির করলেন ১৩১৫ সালে (ইং. ১৯০৯) প্রতিষ্ঠান হল, নব বিগ্রহ নির্মাণ হল তৈরি হল নতুন দালানবাড়ি। বাবার প্রিয় ভক্ত ঊর্ধ্ব নিত্য বাবার গুণগান ভজন করে।

কিন্তু আবারও ক্ষমতার দম্ভ এবং অর্থের নেশা জমিদারকে জ্ঞানশূন্য করে দেয়। তিনি কুচক্রে খবর পান পুরোহিত প্রচুর গুপ্ত অর্থ পেয়েছে। তিনি তার থেকে নিজের অংশ চায়। কিন্তু অসহায় ব্রাহ্মণের কাছ থেকে জমিদার কিছুই না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে পুরোহিতকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তার উপর প্রচুর অত্যাচার করতে আরম্ভ করেন। বিপদে পড়ে ঊর্দ্ধ ঠাকুর করুণাময় বিপদভঞ্জনকারী শ্রী বাবার শরণাপন্ন হন- 'কোথা বাবা দক্ষিণেশ্বর বিপদ দূর কর'- তিনি বাবার কাছে তাঁর অবস্থার কথা বাবাকে জানান। কোথায় পাব আমি এত অর্থ সম্পদ, বাবা তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো অমূল্য ধন নেই। তাই তোমার কারণে আজ আমি বন্দী হয়ে আছি। তোমারই কারণে আজ আমি তোমার পূজা করতে পারলাম না। হে দয়াময় সকলই তোমার ইচ্ছা, তুমিই আমার আশা-ভরসা। ব্রাহ্মণের ডাকে করুণাময় বিপদভঞ্জনকারী জগতপিতা সন্তুষ্ট হন। স্বপ্নে তিনি জমিদারকে ভীষণ রূপ ধারণ করে ভয় দেখিয়ে বলেন- 'তুই মোর প্রিয়ভক্তকে কারাগারে বন্দী করে, তার উপর

প্রচণ্ড প্রহার করেছিস। তাই আজ আমার পূজা হল না, জ্বলল না মোর মন্দিরের সন্ধ্যার প্রদীপ। তাই এখনই যদি তুই এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্য না করিস তোর বংশের অকল্যাণ হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে সব আমার রোষে'। স্বপ্ন দেখে জমিদার চমকে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঊর্ধ্ব ঠাকুরকে ছেড়ে দিলেন। পুনরায় বাবার মন্দিরে জ্বলল সন্ধ্যার প্রদীপ, আরম্ভ হল বাবার পূজারতি।

কিন্তু মোহজালে আরও একবার পড়েন জমিদার। আবারও তিনি ব্রাহ্মণকে ধরে এনে অপমান করেন। এইভাবে বারবার ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার করার ফলে বাবার পূজায় ব্যাঘাত হয়। কোন উপায় না দেখে ব্রাহ্মণ বাবার কৃপায় প্রাপ্ত একটি স্বর্ণমোহর জমিদারকে দান করেন। একজন গরীব ব্রাহ্মণের কাছে কী ভাবে এই বহুমূল্যবান মোহর এল! এই নিশ্চয়ই চুরি কিংবা অন্য কোন অসৎ উপায়ে ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করেছে। এইভেবে পুনরায় জমিদার ব্রাহ্মণকে বন্দী করে প্রচণ্ড প্রহার করতে থাকেন। প্রহারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মণ কাতরভাবে বিপদভঞ্জনকারী বাবা দক্ষিণেশ্বরের শরণাপন্ন হন— 'হে পরম পিতা তুমি ছাড়া এ জগতে আর কে বা আছে আমার। এ অসহ্য যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, তোমার নামেতে সর্বস্থানে মঙ্গল সাধিত হয়। তোমাকে যে ভক্তি করে তার সকল দুঃখের ভার তুমিই বহন কর, দূর কর তার কষ্ট, যন্ত্রণা। কিন্তু আজ যদি তুমি আমার বিপদের দিনে আমার বিপদ ভঞ্জন না কর তা হলে তোমার নামে কলঙ্ক রটবে, ক্ষীণ হয়ে যাবে তোমার নামে প্রতিভা।' ঊর্ধ্বের কাতর প্রার্থনায় ঠাকুর শ্রী দক্ষিণরায় তুষ্ট হয়ে পুনরায় রাজাকে (মদন রায় চৌধুরি) স্বপ্নে নিজ রুদ্র স্বরূপ দেখিয়ে বলেন- 'শোন চৌধুরি- তুমি আমার পূজারীকে ধরে এনে অত্যাচার করেছ। আজও আমার মন্দিরের প্রদীপ জ্বলে না। আমি দুর্জনের দমনকারী এবং সৃষ্টির পালনকর্তা মোহজালে আবৃত হয়ে তুমি একথা ভুলে গেছ। আমি কে তুমি তার পরিচয় নিশ্চয়ই পাবে। তোমার সোনার রাজ্য ছারখার হবে। ধনের দম্ভে তোমার এত অহংকার। সবংশে ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি। নিশ্চয়ই তুমি তোমার সমুচিত শিক্ষা পাবে। কত বল আছে দেখব তোমার বাহুতে।' স্বপ্ন দেখে রাজা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। হতভম্বের মত কোনো কিছু না বলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। চেতনা পেয়ে জমিদার সকাতরে বলেন- 'কুকর্ম করেছি আমি না জেনে। দয়া করে এই মূঢ়মতি অধমকে তোমার শ্রীচরণে ঠাঁই দাও, ক্ষমা কর সব অপরাধ। আমি অজ্ঞান মূঢ়মতি একজন সাধারণ ব্যক্তি। আমাকে তোমার ভক্তি মন্ত্রে দীক্ষা দাও হে প্রভু। হে দেব,

প্রসন্ন হও আমার প্রতি। আর কখনও তোমার শ্রীচরণে কোনো অপরাধ আমি করব না।' এই বলে জমিদার পুনরায় ব্রাহ্মণকে ফিরিয়ে আনলেন এবং সশ্রদ্ধভাবে ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানিয়ে বললেন- 'হে ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমি অজ্ঞানে আপনার প্রতি অনেক দুর্ব্যবহার, অনেক অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা কর ব্রাহ্মণ ঠাকুর। সকল রোষ পরিহার করে আমার এই সামান্য দান-নিষ্কর একান্ন বিঘা জমি আপনি গ্রহণ করুন। এই সম্পদ আপনি বংশানুক্রমে ভোগ করবেন এবং আমায় আশীর্বাদ করুন সারা জীবন যেন বাবার শ্রীচরণে আমার মতি থাকে।' তারপর থেকে জমিদার মদন রায়চৌধুরী প্রতি বছর নিয়ম করে ভক্তি ভরে রাজার পূজা দিয়ে থাকেন।

ব্রাহ্মণকে নিষ্কর একান্ন বিঘা জমি দান করার ফলে নবাবের হিসাব খাতায় জমিদারের কর বাকি পড়ে যায়। খাজনা দিতে না পারায় নবাবের লোকজন এসে জমিদারকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। বিপদের পড়ে জমিদার বাবা দক্ষিণেশ্বরকে স্মরণ করলেন। মদন রায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বিপদ জ্ঞানকারী দয়াময় ভগবান স্বপ্নে তাকে দেখা দিলেন- 'ভয় নেই, তোমার কোনো দোষ নেই। নবাবের ভুল আছে যোগের হিসাবে। এই অভিযোগ তুমি নিয়ে যাও নবাবের সম্মুখে। আমার বার্তা সত্য হবে।' স্বপ্নভঙ্গ হয়ে জমিদার নবাবের সম্মুখে এই অভিযোগই পেশ করেন। বাবার কৃপায় স্বপ্নের কথাই সত্য হল। নবাব দেখলেন সত্যিই তার হিসাব ভুল হয়েছে, বিনা দোষে বন্দি করে রেখেছেন তিনি জমিদারকে। নবাবের আদেশে জমিদার মুক্তি পান এবং সসম্মানে তাঁকে নিজ ভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

লীলাময় ভগবানের লীলার মহিমা জগতে কারো বোঝার ক্ষমতা নেই। অতএব এসো সবাই ভক্তি ভরে এক মনে বাবার গুণগান গাই। কখনো ঘোড়া, কখনও বা ব্যাঘ্র কিংবা কখনো স্বর্ণ রথে চড়ে বাবা ভ্রমণ করেন বনের মধ্যে। আর যে ভক্ত বিপদে পড়ে তাকে উদ্ধার করেন। বাবার এই লীলার কথা শুনে আপামর ভক্তসাধারণ বাবার শ্রীচরণে আশ্রয় নেন, শ্রদ্ধা ভরে ভক্তি ভরে বাবাকে পূজা করেন। যোগসিদ্ধ এক গাজি ঈর্ষান্বিত হয়ে এই বনের মধ্যে আসেন এবং এখানেই তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার করবেন বলে মনস্থির করেন। ভীষণ দুর্যোগ আরম্ভ হল বনের মধ্যে। অশ্বের শব্দ এবং অস্ত্রের আওয়াজে বনের শান্তি নষ্ট হল। অবশেষে সৃষ্টিকর্তা এসে বনের শান্তি ফিরিয়ে আনলেন।

বনাঞ্চলকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেন। দক্ষিণ দিকের বনের অধিপতি শ্রী দক্ষিণরায় আর উত্তর দিকের অধিপতি গাজি। এখনও পর্যন্ত তারা শান্তিভাবে নিজ নিজ এলাকায় স্বমহিমায় রয়েছেন।

৪। সাক্ষাৎকারদাতা- স্বপন মণ্ডল

০৯। ০৩। ০২১৫, সোমবার

থান- পঞ্চানন্দ

গ্রাম+পো:- মালঞ্চ মাহিনগর, থানা- সোনারপুর

আখ্যান— আমার ঠাকুরদা প্রায় একশত বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিল। ওই সময় একটি রোগ সারা গ্রামে ছড়িয়েছিল যার ঔষধ আমার ঠাকুরদাদা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পায়। ঠাকুরদাদা সবাইকে সকালে বলল যে, আজ আমাদের বাড়িতে একজন আসবে দুপুর বেলায়। যথারীতি দেখা গেল দুপুরে একজন বাড়িতে এসে উপস্থিত। তারপর থানটির কাছে যে বটগাছটি ছিল, সেই গাছটির কাছে মাটির কলসিতে গঙ্গা জল রাখা ছিল। সেই কলসিতে দুটি পাকানো কোনো এক অজানা গাছের শিকড় পাওয়া যায়। সেই শিকড় সবাইকে দেওয়া হয় ও খবর পাওয়া গেল যে সবাই সুস্থ হয়ে গেছে। এইভাবে বাবার নাম প্রচার হয়ে গেল। তারপর ঠাকুরদাদা একদিন মারা গেল। এরপর দাশরথি ভট্টাচার্য নামে একজন এসে সব শুনলেন ও গ্রামের সবার সহযোগিতা নিয়ে নিজের জায়গাতে ওই থানটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে একটি মাটির ঘর ছিল ও উপরে খড়ের ছাউনি ছিল। পরবর্তীকালে একজন মামলা জেতার জন্য মানসিক করেন যে, যদি সে মামলায় জেতে তাহলে পাকা মন্দির করে দেবেন। সে মামলায় জেতে ও পাকার মন্দির করে দেয়। একবার প্রবল ঝড়ে মন্দিরের পাশে যে প্রাচীন বট গাছ ছিল তা পড়ে যায় ও মন্দির একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু মজার বিষয় বটগাছের ডাল ভেঙে গাছের নীচে যে মানুষ ও গরু ছিল তাদের কারুর গায়ে পড়েনি। তারপর ঐ বটগাছটিকে বিক্রি করে ও গ্রামের মানুষের সবার সাহায্য নিয়ে নতুন করে থান করা হয়। ওই বটগাছে একবার একটি বড় মৌচাক হয়েছিল। একজন গ্রামের মানুষ নোংরা কাপড়ে ওই মৌচাক কাটতে গেল, তখন মৌচাকের মধ্য থেকে এক বিরাট সাপ তাড়া করে এল। তারপর সে পরিষ্কার কাপড় পরে এসে মৌচাক কেটে নিয়ে যায়।

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, একদিন বাবা অন্য গ্রামে যাত্রা শুনতে গিয়েছিল আর আমি বাড়িতে শুয়ে ছিলাম। যাত্রার আসরে বাবার পিঠে কে যেন চড় মেরে বলেছিল ‘ওই বেটা দেখবি যা তোর

বাড়িতে সব চুরি হয়ে গেছে।' বাবা দ্রুত বাড়িতে এসে দেখে যে সত্যি চুরি হয়েছে। কিন্তু বাবাকে কে জানিয়েছিল তা বাবা কোনো দিন জানতে পারেনি। আমাদের থানে বাবার পায়ের নীচে একটি বড় পাথর রাখা থাকে। নীলপূজার দিন সেই পাথর থেকে তিন চারটি ছোট ছোট পাথরের জন্ম হয়। পরে তারা আস্তে আস্তে বড় হয় ও রং পরিবর্তন করে।

৬। সাক্ষাৎকারদাতা- শকুন্তলা নস্কর, ভূপেন্দ্রনাথ নস্কর

০৪। ০৪। ২০১৫, শুক্রবার

থান- খনেশ্বরীর থান

গ্রাম– বেলেদুর্গানগর, পোস্ট– বেলেদূর্গানগর, থানা– জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আখ্যান— এখানে আগে জঙ্গল ছিল। ক্রমে জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে ওঠে। থান গড়ে ওঠে। এখানে শীতলা থান ছিল। আর এই খনেশ্বরীর মন্দির। এখানের পুকুর খুব পবিত্র ছিল। দেবতারা এই পুকুরের জল ব্যবহার করত বলে প্রবাদ প্রচলিত আছে। আমাদের এক ঠাকুরদাদা সন্ন্যাসীচরণ নস্কর দেবভক্ত মানুষ ছিলেন। তিনি ঐ পুকুরের কাছে গিয়ে কাঁদলে টাকা-পয়সা পেতেন, গ্রামের অনেকে দেখেছে যে এই পুকুরে দুটি বিশাল শাল মাছ ছিল। তিনি ওই শাল মাছে চড়ে সারা পুকুর ঘুরে বেড়াত। আর কেউ এই পুকুরে নামার সাহস পেত না। কথিত আছে এখানে বাঘ আর গরুকে হালে জুড়ে চাষ করা হত, কিন্তু মায়ের নির্দেশ ছিল যে ওই মাঠে চাষ করা যাবে না। শোনা যায় জীবন মণ্ডল, যার নামে হাট আছে, এরা মায়ের নির্দেশ অমান্য করায় মা ওই জীবন মন্ডলের কাছে চলে যায়। তখন জীবন মণ্ডল জমিদার ছিল না কিন্তু মায়ের কৃপায় তিনি জমিদার হয়ে গেলেন। এই গ্রামের অবস্থা তখন এমন খারাপ হল যে কেউ আর খাজনা দিতে পারে না। তখন এদের সব জমি নিলাম হয়ে গেল। একবার এখানে কলেরা মহামারীর আকার নেয়। তখন এত ডাক্তার-কবিরাজ ছিল না। মার কাছে মানত করে, দণ্ডী কেটে মানুষ সুস্থ হয়।

৯। সাক্ষাৎকারদাতা- অশোক সাধুখাঁ

০৫। ০৪। ২০১৫, শনিবার, দুপুর ১.৩০

থান- বিবিমা

গ্রাম- মাহিনগর বিবিমাতলা (কলুপাড়া রোড), থানা- সোনারপুর

আখ্যান— এখানে একটি বড় তালগাছ ছিল। তালগাছের তলায় তিনটি ইঁট দেওয়া ছিল, সেই ইঁটেই পুজো দেওয়া হত। এই থানটি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং এই থানের নীচ থেকেই আদিগঙ্গা প্রবাহিত হত। একবার আমার জ্যাঠামশাইয়ের তড়কা রোগ হয়। এই রোগ হওয়ার পর আমার জ্যাঠামশাই মানত করে যে, বিবিমা যদি রোগ সারিয়ে দেন তাহলে তিনি মায়ের মন্দির করে দেবেন। তারপর জ্যাঠামশাই সুস্থ হয়ে উঠলেন ও মায়ের এই মন্দির তৈরী করে দেন।

এক বছর কলেরা রোগ হয়েছিল সামনের মুসলিম পাড়াতে। ওই পাড়াতে একজন পাগল সারা রাত ঘুরে বেড়াত। মা একদিন রাত্রে গ্রাম পাহারা দিচ্ছেন, তো ওই পাগল বলল মা আপনি এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছেন? মায়ের একটা হাতে ঘটি আর একটা হাতে ঝাঁটা ছিল, মা বলল যে আমি আজকে গাজিপাড়া সাফ করতে যাচ্ছি। অন্য পাড়ায় এই কলেরা এখন চলবে। মা ওই পাগলটাকে একটা ঔষধ বলে দিয়েছিল কিন্তু লোকটি পাগল তাই সেই ঔষধের নাম কেউ জানতে পারেনি। অন্য একদিন একজন আমাদের গ্রামের মানুষ হরিনাম করে রাত্রে ফিরছিলেন, সেই লোক দেখেন যে একটি বাচ্চা মেয়ে রাত্রে একা চলেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সেই মেয়ে বলল যে, অন্য পাড়া সাফ করতে যাছে। তারপর সারা গ্রাম সুস্থ হয়ে উঠল।

১০। সাক্ষাৎকারদাতা- মোহন ভাট

০৫। ০৪। ২০১৫, শনিবার, দুপুর ১.৩০

থান- শীতলা

গ্রাম- শ্রীরামপুর, পো- ফুটিগোদা, থানা- জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আখ্যান— এই এলাকা এক সময়ে জঙ্গলে পূর্ন ছিল। এই থান কতদিনের পুরানো তা কেউ বলতে পারবে না। সুন্দরবন অঞ্চলের ধরণী মোহন রায় ছিলেন এই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জমিদার। এই সমস্ত এলাকা তাঁর জমিদারী এলাকার মধ্যে পড়ে। তিনি যখন এই এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করে জনবসতি বসাতে শুরু করেন তখন এখানে কয়েকটি মাটির বেদী পান। সেই বেদীতে আবার চারটি ঠাকুরের মুর্তি পাওয়া যায়। মা শীতলা, বাবা পঞ্চানন্দ, বসন্ত রায় ও মনসা। ফাঁকা মাঠের মধ্যে ইঁটের বেদী করে এদের পুজো দেওয়া হত। আজ থেকে দুই'শত বছর আগে এখানকার পূর্বপুরুষরা সেই বেদীকে

মাটি দিয়ে দেওয়াল করে ও উপরে খড়ের ছাউনি দিয়ে একটি থান করে ও এই চারটি ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর এনারা স্বপ্ন দেন বৈশাখ মাসের শুক্লা পক্ষের তিথিতে যেনো তাদের পুজো দেওয়া হয়। এরপর সারা গ্রামে রটে যায় যে জঙ্গল থেকে ঠাকুর পওয়া গেছে। আজ যে পাথর বসান থান মানুষের কামনা পূর্ণ হওয়াতে সাধারণ মানুষ করে দিয়েছে।

এখানে পুজো করত সনাতন ভট্টাচার্য। এই পুরোহিতের বাড়ি বিষ্ণুপুরে। তিনি কোনো এক কারনে এক বছর পুজো করতে পারেনি। আমাদের বাবা ঠাকুরদাদারা তখন মানিক ধর নামে একজন পুরোহিতকে এনে পুজোটা করিয়েছিলেন। তিনি এসে পুজো করছেন কিন্তু কিভাবে কেউ জানে না মায়ের উপরের চেহারা সব ঠিক আছে কিন্তু ভিতরে সব পুড়ে গেছে। যখন সবাই জানতে পারল তখন কী করবে কেউ কিছু ভেবে পেল না। তখন মা গ্রামে স্বপ্ন দিলেন যে তোমরা আমার যে পুজো করত তাকে অবহেলা করেছ। আমি এই পুজোয় সন্তুষ্ট নই তাই আমি পুজোতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। তোমরা পুনরায় তাকে এনে আমার পুজো করো। তারপর তিনি এসে পুজো করলে সব ঠিক হয়ে যায়।

আমাদের পাশেই আছে মুসলিম পাড়া। এখানে তিলক পাড়াতে ওয়েদালী বলে একজন মুসলমান সব্জি ব্যাবসা করত। এই চারজন ঠাকুর রাত্রে বের হতেন। একদিন বর্ষাকালে ঐ ওয়েদালী মোল্লা শিয়ালদহ কোলে মার্কেট থেকে রাত বারোটা নাগাদ ফিরছেন গ্রামের কাদা রাস্তা দিয়ে। এখানে তখন খুব ডাকাতি হত। ওই লোক আসার সময় দেখে যে থানের কাছে চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তখন ওই মোল্লা চুপিচুপি আমার বাবাকে ডেকে বলে যে, দাদা ওঠো ডাকাত পড়েছে। বাবা তখন বলল কোথায়? তখন সে বলে যে মায়ের মন্দিরের পাশে তারা দাঁড়িয়ে আছে। বাবা বলল মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে? তুই এক কাজ কর তুই বাড়ি চলে যা তোর ভাগ্য ভালো তুই ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিস। ও যেহেতু মুসলিম তাই কথাটা বিশ্বাস করেনি আর শোনেনি। তখন ও পাড়াতে গিয়ে বল্লল, চৌকি নিয়ে এসে থানের পিছনে সামনে এসে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করল। তখন আমার বাবা এসে বলল তুই আমার কথা শুনলি না? এইরকম ঘটনা তুই ঘটালি? তখন সেই লোকটি বলল যে এখানে ডাকাত পড়েছিল। কিন্তু কিছুই না পেয়ে তারা সবাই চলে গেল। সেই রাত্রে ওই লোকটার গায়ে দুটি মোটর কলাইয়ের মত পস্ক বের হল। দুটি পক্স বের হওয়ার পর গায়ে ব্যথা হতে শুরু করল। সকালে দেখা গেল সারা গায়ে প্রচুর পক্স বের হয়েছে। ওর মা বৃদ্ধা মানুষ সকালে আমার বাবার কাছে কাছে

কাঁদতে লাগল। বাবা তখন বলল যে আমি ওকে বারণ করেছিলাম ওর উপর মায়ের কোপ পড়েছে, তাই আমার কাছে না এসে মায়ের কাছে কাঁদতে বল। আমার বাবা সেই বৃদ্ধাকে মায়ের ঘটের জল দিল। তখন সেই ঘটের জল সে পান করল কিন্তু তাতেও কিছু হল না আরো বেড়ে চলল। একদিন রাত্রে তার মা স্বপ্ন পেল মা তাকে বলল তোর ছেলেকে আমি বাচাঁব না। তোর ছেলেকে আমি তুলে নেবই কারণ তোর ছেলে বারণ শোনেনি। তারপর সেই লোকটি মারা গেল। সেইদিন থেকে মুসলিমরা মাকে খুব শ্রদ্ধা করে। এবং মায়ের পুজোর সময় নানা উপহার দিয়ে থাকে।

বারুইপুরে পূর্ণিমা রায় বলে এক মহিলার মেয়ের এক মেয়ে বিকলাঙ্গ অবস্থায় জন্মে ছিল। তার মা মায়ের কাছে মানত করল যদি তার মেয়ে হাঁটতে পারে তাহলে তিনি মায়ের মুর্তি করে দেবেন। তার মেয়ে তারপর ভালো হয়ে গেল।

১১। সাক্ষাৎকারদাতা- পুলিন বিহারী মণ্ডল

০৫। ০৪। ২০১৫, রবিবার, দুপুর

থান- সাতবিবি, বসন্ত রায় ও পাঁচুগোপালের।

গ্রাম- হলিদিয়া, পো:- মনিপুর বাঁশতলা ,থানা- জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আখ্যান— এই থানগুলি জঙ্গল কেটে যখন মানুষ বসবাস করে তখনকার সময়ের। এই থান বহুদিন আগেকার থান। আমার ঠাকুরদাদার সময়ের আগেকার কথা। তখন এখানে বাঘ ঘুরে বেড়াত। তখন এখানে দুটি থান ছিল আমাদের ঐ মণ্ডল পাড়ায়। হলদিয়ায় ওই মণ্ডলপাড়া খুব বড়ো ছিল। আমাদের পাড়াও খুব বড়ো ছিল কিন্তু মড়ক ও নানাবিধ অসুখে আমাদের পাড়ায় লোকবসতি কমে যায়। মণ্ডলদের পাড়ায় লোকবসতি বেশি হওয়ার জন্য থানটিকে খুব ভালো করে কেউ পরিষ্কার করত না। তাই সাতবিবি মায়েদের মধ্যে ছোট বিবি মায়েরা বলল আমরা এখানে থাকব না। আমরা মণ্ডলপাড়ায় গিয়ে থাকব। তখন বড় বিবিমা বলল যে তোরা যখন মনে করেছিস ওখানে যাবি আমি তোদের আটকাব না। কিন্তু আমি আর এখান থেকে যাব না। তবে ওখানে তোদের পুজো হয়ে গেলে তবেই আমি পুজো নেব। সেই থেকে পৌষ মাসের গঙ্গা স্নানের সময় ওই মন্ডলেরা ও গ্রামের সবাই আগে ছয়বিবির পুজো দেবে তারপর নিজেদের গ্রামের বিবিমায়ের পুজো দেবে। ঠাকুর দাদারা যখন জঙ্গল পরিষ্কার করে তখন কয়েকটা বারামূর্তি পায়। তাদেরও ওই দিন পূজো দেওয়া হয়। এই থানটির পাশে

একটি বড় নিমগাছ আছে তাকে কেউ কাটে না। একবার ওই নিমগাছের কিছু পাতা একজন কুড়িয়ে উনুন ধরিয়েছিল তাতে গা ভর্তি হয়ে নানা রোগ বেরিয়েছিল। একবার গ্রামের সবাই মিলে ঠিক করে যে থানটিকে ঘিরে দেবে। কিন্তু মা স্বপ্ন দেয় যে আমি খোলা জায়গায় থাকব কেউ যেন আমায় না ঘিরে ফেলে। ওপারে বাঁশতলার আমার মামাতো ভাইয়ের ছেলে বলেছিল যে আমাদের এই থানে এক বিরাট আলো জ্বলে। আবার আনেকে দেখেছে যে এক আলতা পরা মেয়ে ঘুরে বেড়ায়।

১২। সাক্ষাৎকারদাতা- মাধব মণ্ডল ও সৌরেন মণ্ডল

০৫। ০৪। ২০১৫, রবিবার

থান- দ্বীপচণ্ডীর থান, গ্রাম- নারায়ণীতলা, পো:- মগরাহাট, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

আখ্যান— আমাদের পাড়ার শ্রীনিবাস হালদার বলে একজন এক মুসলমানের কাছে এই থানের উৎপত্তির ইতিহাস জানা যায়। তিনি বলেন নারায়ণ তলার যে হোগলাবন আজ আছে বহুদিন আগে এখানে গঙ্গা প্রবাহিত হত। এই জায়গাটিকে আগে লোক ঘূর্ণি বলে জানত। ওই মুসলমান গল্প করছে যে আমার আত্মীয়রা পূব-রাজ্যে বাস করে অর্থাৎ বাংলাদেশে। ঐ বাংলাদেশ থেকে প্রচুর ব্যবসায়ীরা এই নদীপথে যাতায়ত করতো। একবার এই ঘূর্ণির কাছে এসে আটটি নৌকা ডুবে যায়। তারা কোনরকমে সাঁতার দিয়ে পাড়ে ওঠে। ওই জায়গাটি আসলে ছিল ঘূর্ণি, বালি উঠে উঠে ওখানে দ্বীপ তৈরি হয়েছে। গ্রামের মানুষরা শালের ডোঙ্গা করে ওখানে যেত। ঐ থানে দুটি পাথর আছে বহুদিনের, তার মধ্যে সাদা পাথরটিকে সবসময় পাওয়া যায় না। ঠিক জাঁতাল পুজোর সময় ওখানে এসে হাজির হবে।

আমি একবার দুপুর বেলা কোনো এক কারণে ওই দ্বীপে গিয়েছি। থানের কাছে যেতেই কে যেন বলে উঠল পরে আসিস। আমার তখন ভয় হতে লাগল, আমি তখন ওখান থেকে পালিয়ে আসি ঢালি পাড়ায়। এসে দেখি একজন বড়ো কাগজে করে কিছু নিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম ওতে কি নিয়ে যাচ্ছ? তো সেই লোক বলল যে গতকাল আমাদের গাভীর বাছুর হয়েছে। কিন্তু সেই বাছুর একলা খেলা করতে করতে চলে গেছে সেই থানে। সেখানে গিয়ে হাঁড়িকাঠে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। আমরা

সারাদিন খুঁজেও পাইনি। ভোরে কে যেন বলছে ‘বাছুর ছেড়ে রেখে দিয়ে আরাম করে ঘুমচ্ছিস? বাছুর আমি রেখে দিয়েছি।’ সকালে গিয়ে দেখে যে বাছুর সেইভাবে ঘুমিয়ে আছে। তখন তিনি কোলে করে বাছুরকে বাড়ি আনল।

১৩। সাক্ষাৎকারদাতা- অরিন্দম চক্রবর্তী

০৫। ০৪। ২০১৫, রবিবার, দুপুর

থান- ধন্বন্তরি মন্দির

জয়নগর মজিলপুর, পো:- মজিলপুর, থানা– জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আখ্যান— আদিগঙ্গা মজে যাওয়ায় এই জায়গার নাম হল মজিলপুর। পূর্বপুরুষ রামরাম চক্রবর্তী তান্ত্রিক সাধনা করতেন। ওনার গুরুদেব ছিলেন ভৈরবানন্দ। তিনি এমন উঁচু স্তরের সাধক ছিলেন যে তিনি এখানে থেকেই তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে সুদূর বেনারসের কোনো স্থানে পূজা দিতে পারতেন। একবার রামরাম চক্রবর্তী স্বপ্নাদেশ পান যে গঙ্গা মজে গিয়ে যে পদ্মপুকুর তৈরি হয়েছে, তাতে মা অবস্থান করছেন। সেই মতো অনুসন্ধান করে রামরাম চক্রবর্তী পুকুরের মধ্যে একটি কষ্টি পাথরের মূর্তি পান। মূর্তি তোলার সময় মূর্তিতে কোদালের আঘাত লাগে সেই ক্ষত সিঁদুর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। মানুষ বিশ্বাস করে এই কারণে চক্রবর্তী বংশের সদস্যরা যখন মারা যায় তখন তাদের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। দশ পুরুষ ধরে এই রকম হওয়ার পর মৃত্যুর সময় মুখ দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

এখানে বহু রোগী দৈবী ওষুধ পান এবং আরোগ্য হন। প্রায় বছর চল্লিশেক আগে ২০-২২ বছরের এক ভদ্রলোক এখানে আসেন। ওঁনার নাম নিখিল রায়। কলকাতার শশীভূষণ দে স্ট্রীটে তাঁর নিবাস। সে ব্যধিতে পঙ্গু ছিল। হাঁটতে পারত না। হাসপাতালে চিকিৎসা করেও কোনো সুরাহা হয়নি। তাঁর মা স্বপ্নাদেশ পেয়ে গাড়িতে করে ছেলেকে নিয়ে এখানে আসে। ছেলেটি বলে যতদিন না আমি পুরো সুস্থ হচ্ছি ততদিন আমি এখান থেকে যাব না। এইভাবে ভদ্রলোক ওখানেই থেকে গেলেন। মাস দুয়েক পরে হঠাৎ তাঁকে আর সেখানে দেখতে পাওয়া গেল না। তারপর দিন সাতেক বাদে হঠাৎ অনেক গাড়ি নিয়ে, এক বিশাল ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে সেই ভদ্রলোক এসে হাজির। তিনি পুরোপুরি হাঁটতে পারছেন, একেবারে সুস্থ। ভদ্রলোক বলেন, তিনি তো প্রতিদিন মায়ের সামনে শুয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করত যাতে তিনি তাঁকে সুস্থ করে দেন। একদিন মাঝ রাতে হঠাৎ দেখেন একটা বাঘ ওঁকে

তাড়া করেছে। বাঘ তাড়া করায় ও ঘুমের ঘোরে ছুট মেরেছে। ছুট মেরে পদ্মপুকুরের ঘাটে গিয়ে ঝপাং করে জলের মধ্যে পড়েছে। জলে পড়ে তাঁর চিন্তা হল যে আমি এই পর্যন্ত এলাম কী করে! তখন ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখে এক কালো সুন্দরী মেয়ে লালপেড়ে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোক এক এক পা ঘাটের ওপর উঠছে আর মেয়েটি এক এক পা করে পিছিয়ে চলে যাচ্ছে। সেই ভদ্রলোক তখন ট্রেনে করে বাড়ি ফিরে যায়। ওঁনার মাকে বলেন, দেখো মা, আমি সুস্থ হয়ে গেছি। সেই ভদ্রলোক এখনও সুখে সুস্থভাবে বেঁচে আছেন। কালীপূজার দিন প্রতি বছর উনি মাকে বেনারসী শাড়ী দেন। এছাড়াও প্রায়ই এখানে আসেন। মাও তাঁকে উজাড় করে ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি দিয়েছেন।

একবার এখানকার পুরোহিত সকালবেলায় মায়ের পূজা দিয়ে বেরিয়ে আমাদের কাছে বললেন যে, আজ মাকে খুব কুপিত দেখলাম। ওনার জিভ যেন বেশি বড়, চোখগুলো যেন বেশি বড় করে তাকিয়ে ছিলেন। তা গ্রামবাসীরা পুরোহিতকে প্রবোধ দিয়ে বাড়ি পাঠায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় পুরোহিত দেবীর পূজা-অর্চনা-আরতিতে গরহাজির দেখে সবাই ওনার বাড়িতে গিয়ে দেখে উনি অসুখে একেবারে শয্যাশায়ী। সমানে মাকে ডাকছেন আর বলছেন, কেন মা তাঁকে এইরকম শাস্তি দিল। মা তাকে বলেন কেন সে সকালে অন্যের পা-ধোয়া জলে তাঁর চরণামৃত নিল। আসলে সেইদিন একজন না জেনে মায়ের চরণামৃতের জল যে বালতি থেকে নেওয়া হত, সেই বালতির জলে পা ধোয়। তো পুরোহিত খুব সাত্ত্বিক ছিলেন। তাই মার কাছে ক্ষমা চেয়ে সুস্থ হয়। সেদিন অনেক রাতে মায়ের আরতি সম্পন্ন হয়। মায়ের নাম ধন্বন্তরি। কারণ ওনার কাছ এসে সবার রোগভোগ দূর হয়। এখানে নিত্য পূজা হয়। বৈশাখ মাসের অমাবস্যার প্রতিপদ থেকে একমাস মেলা বসে। প্রচুর জনসমাগম হয়। পূর্ণিমায় মায়ের জন্মোৎসব পালন হয়। পূজা-অর্চনা, হোম-যজ্ঞ, চার পাঁচটা বলি হয়। যারা নৈশপ্রহরা দেন তাঁরা অনেক সময় শুনতে পান ঘাটে কেউ কাপড় কাচছে। কিন্তু ঘাটে গিয়ে কাউকে দেখা যায় না।

১৬। সাক্ষাৎকারদাতা- রবীন পাকড়াশী

০৫। ০৪। ২০১৫, রবিবার, দুপুর ১.৩০

থান- বিশালক্ষীর থান

গ্রাম- উত্তরপাড়া, পো- ময়দা, থানা- মগরাহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

আখ্যান— আমাদের পূর্বপুরুষ পাবনা জেলার বাসিন্দা। সেখানে আমরা জমিদার ছিলাম। ওখানে মুসলমানদের খুব উপদ্রব ছিল। তাদের উপদ্রব ছিল নানাবিধ। ওদের অত্যাচারে আমরা এখানে চলে আসি। আমার বাবার সাত আট বছর বয়সে এখানে চলে আসে। বাবারা এখানে যখন আসে তখন বিশালক্ষীর দুটি পাথর নিয়ে আসে। এখানে এসে আমার মামার বাড়ি থেকে আমাদের অল্প জমি দেওয়া হয়। সেখানে মাটির ঘর করে মায়ের পুজো দেওয়া হত। বহড়ুর বোসরা জানতে পারল আমাদের আসার কথা। তারা আমাদের অনেকটা জমি মায়ের নামে দান করে। তারপর গ্রামের সবাই মিলে থানটিকে পাকা করা হয়।

গ্রামের একদিকে মুসলমানরা কড়াই চাষ করত। মুসলমানরা দেখে যে প্রতিদিন কে শাক চুরি করে নিয়ে যায়। একদিন দুপুরবেলা দেখে যে, কে একজন লালপেড়ে শাড়ী পরে একটি বউ ঘোমটা দিয়ে শাক তুলছে। তখন মুসলমানেরা তাড়া করেছে। তখন তো এখানে দোকান হয়নি, চারদিকে মাঠ ও সরু রাস্তা। বউটি সেই রাস্তা দিয়ে দৌড় দিয়ে এসে ওই থানের কাছে এসে মিলিয়ে গেছে। তখন সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করল, কিন্তু কোথাও পেল না। তখন সবাই থানের মধ্যে গেল, গিয়ে দেখে বেদীর উপরে কড়াই শাক ছড়ানো আর সেই শাড়ি পরা সেই মেয়ে। সেখান থেকে মায়ের পুজোতে ওই কড়াই শাক দিয়ে যায়।

আমার আপন জ্যাঠাবাবু, ভুতনাথ পাকড়াশী উনি দুপুরে ঘুমতেন। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা এক শাঁখারি এসে বলে আপনার মেয়ে একজোড়া শাঁখা পরেছে, কিন্তু টাকা দেয়নি। সে আমায় বলল যে আমার বাবা ওখানে আছে আর বলল যে লক্ষী ঝাপিতে এক টাকা আছে দিয়ে দিতে। জ্যাঠামশাই বলল কিন্তু আমার তো কোনো মেয়ে নেই। শাঁখারি বলল, বাঃ! আমায় যে বলল আপনার নাম আর কোথায় টাকা আছে তাও বলে দিল, আপনি দেখুন না লক্ষী ঝাপিতে। তখন জ্যাঠাবাবু গিয়ে দেখে যে সত্যি এক টাকা আছে। তারপর জ্যাঠাবাবু বলল কোথায় তোর থেকে শাঁখা পরেছে? শাঁখারি তখন বলল যে এই পুকুরের কাছে বসে পড়েছে। আর ওই পুব দিকে চলে গেছে। তখন জ্যাঠাবাবু থানে গিয়ে দেখে যে মায়ের হাতে সত্যি শাঁখা পরা।

১৭। সাক্ষাৎকারদাতা- রামদাস নাইয়া

থান- বহড়ু ক্ষেত্র

গ্রাম- বহড়ু, পোস্ট– বহড়ু, থানা– দক্ষিণ বারাসত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আখ্যান— বহড়ু আসলে একটা অপভ্রংশ। এর প্রকৃত নাম বড় ক্ষেত্র। বড় মানে শিব। শিব ক্ষেত্র বা বড় ক্ষেত্র। তা থেকে বহড় ক্ষেত্র। তার থেকে বহড়ু। গ্রামের নামও এখান থেকেই বহড়ু। আনুমানিক ৫০০ বছরের পুরানো থান। গঙ্গার পারে গভীর জঙ্গল ছিল এখানে। এখানের প্রতিষ্ঠিত শিব শিলাটি গঙ্গার জলে ভেসে এসে এখানকার বকুল গাছ তলায় আটকায়। এখানে জনবসতি ছিল না। মাঝিরা এসে এখানে নোঙর করত, পূজা দিত। এই বকুল গাছটায় অজস্র ফুল হয়, কোন ফল হয় না। নদীয়া থেকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন দক্ষিণবঙ্গ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক সন্ধ্যায় এখানে তাঁর নৌকো নোঙর করে। সেই রাত্রে প্রভু এখানে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন সকালে মাঝি-মাল্লাদের এখানে ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে পদব্রজে হলদিয়া বন্দরে যান। এবং সেখান থেকে নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তো সেই মাঝি-মাল্লারা এখানেই জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাস করতে শুরু করে। তাদেরকে নাইয়া বলা হত। আমরা আশেপাশে সেই নাইয়াদেরই বংশধর বংশ পরম্পরায় বাস করছি। এবং এর থেকেই গ্রামের নাম বহড়ু নাইয়া পাড়া।

জনশ্রুতি একবার এই অঞ্চলে কলেরার উপদ্রব হয়। তখন এইখানে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তিনি এখানে সারাদিন ডাক্তারি করতেন, গ্রামের লোকজনের সেবাশুশ্রূষা করতেন, ঠিক সন্ধ্যার সময় থানের কাছে এসে তিনি মিলিয়ে যেতেন। আর তাঁকে দেখা যেত না।

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁর পূজারিকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে এখানে কোনো মন্দিরের কাঠামো না গড়তে, কারণ তিনি খোলামেলাই থাকতে চান। তখন পূজারি আবেদন করেন যে গাছতলায় কোনো আচ্ছাদন না থাকলে পাখির ময়লা জায়গাটাকে নোংরা করবে। তখন তিনি বলেন এই গাছে শুধু ফুল হবে কিন্তু কোনো ফল হবে না।

১৮। সাক্ষাৎকারদাতা- দুলাল হালদার

০৫। ০৪। ২০১৫ (রবিবার)

থান- নালিবাড়ি থান, গ্রাম– বিজয়গড়, পোস্ট– বিজয়গড়, থানা– জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আখ্যান— আগে এখানকার পুকুরে টাকা পাওয়া যেত। একবার এখান দিয়ে একজন এক বাক্স টাকা নিয়ে যাচ্ছিল। এক গয়লা তাকে দেখে। গয়লা তাকে ডেকে দুধ দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যায়। রাতে

গয়লা স্বপ্নাদেশ পায় যে ঐ টাকা ফিরিয়ে দিতে। এখানকার শ্যাওড়া গাছের নীচে এক তান্ত্রিক মানুষ ছিলেন। এক রাতে তিনি দেখেন একটা আলো ছুটে ছুটে আসছে। তিনি তাকে ধাওয়া করে। আলোটা ঐ শ্যাওড়া গাছে উঠে যায়। তান্ত্রিক ঐ গাছে মই নিয়ে উঠতে যায়, কিন্তু কিছু পায় না। তারপর থেকে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন থেকে বিশ্বাস ঐ গাছে আত্মারা থাকে।

১৯। সাক্ষাৎকারদাতা- নূরগাহাজ নস্কর

০৬।০৪।২০১৫, সোমবার

থান- আটেশ্বরের থান

গ্রাম- উড়েলচাঁদপুর, পোষ্ট– উড়েলচাঁদপুর, থানা– মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আখ্যান— আগে এই জায়গাটা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। মানুষজন এখানে মড়া ফেলত, সবাই এখানে যেতে ভয় পেত। ওইখানে একটি অশ্বত্থ গাছ ছিল, তার নীচে একটি গর্ত ছিল। সেই গর্তে খালি মাদুলি ফেলে দিলে ভর্তি হয়ে যেত আর এমনি হাত দিলে তামার পয়সা উঠত। তারপর থেকে এখানে সবাই ঐ অশ্বত্থ গাছ ও ওই গর্তকে পুজো দিতে লাগল। আমার ঠাকুরদাদারা তিন ভাই ছিল। আমার ছোট ভাই আমার ঠাকুর্দা মারা যাওয়ার পর থাকবার ঘর তৈরি করবার জন্য বাড়ির পাশেই মাঠের একটা তালগাছ কাটে। কেটে মাঠেই রেখে আসে। ওখানে তখন বিশাল হোগলাবন ছিল। সেই কাঠ চোরেরা চুরি করে নিয়ে খালের জলে লুকিয়ে রাখে। রাতে ঠাকুর এসে ঠাকুর্দাকে বলে তোর কাঠ তো চোরেরা নিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরদা ঘুমের মধ্যেই উত্তর দেয় ও কাঠ আমি একা কীভাবে বয়ে নিয়ে আসব? তখন ঠাকুর বড় ঠাকুরদাকে পরের দিন সিকিডোঙা আর কাছি নিয়ে যেতে বলেন। আরও বলেন যে তুই ডোঙা বেয়ে এসে কাঠের গায়ে কাছি বেঁধে ফিরে আসবি আমি বোঝা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে দেব। সেইমত বড় ঠাকুর্দা একাকী ডোঙা বেয়ে গিয়ে গাছ নিয়ে আসে। গ্রামের মানুষ খেতে ধান কেটে বাবার কাছে প্রার্থনা করে আসত, যে বাবা আমার ধানটা পাহারা দিও, ধান গোলাজাত করে তোমার পূজা দেব। সবাই নানা উপকার পেতে লাগল ও ক্রমে সবাই মিলে ঐ থানটি তৈরি করে। একবার আমার বাবা তখন সবে বিয়ে করেছে, আমি তখন ছোট কিছুই খেতে পারি না, খেলে বমি হয়ে যায়। আমার জ্যাঠাইমা খবর দিল বাবার শ্বশুরকে যে বাচ্চা তো মারা যাবে এইভাবে চলতে দেওয়া যাবে না। তখন সবাই মিলে জায়গা জমি বিক্রি করে বড়ো ডাক্তার দেখায়। কিন্তু তবু অসুখ সারে না।

একদিন রাত্রে আমার গালে কেউ চড় মেরে বলছে ঘরে ডাক্তার থাকতে অন্যকে দেখাচ্ছিস কেন? আমি সকালে উঠে ওই গর্তে হাত দিয়ে একটা শিকড় পাই। আমি তা চিবিয়ে খেয়ে ও পেটে বুলিয়ে চলে আসি। তারপর থেকে আমি সুস্থ। আবার একবার রাজাপুরের এক প্রফেসার, তার বউয়ের বাচ্চা হয় না, ডাক্তার দেখালেও কোন ভাবেই বাচ্চা হয় না। তিনি এই থানে মানসিক করেছিলেন ও বলেছিলেন- যদি আমার স্ত্রীর সত্যি বাচ্চা হয় তাহলে আমি এই থান পাকা করে দেব। ওই থানের কাছে একটি পুকুর আছে একবার এক মহিলা পুজো দিতে এসে ওই পুকুরে নিজের ছেলেকে স্নান করিয়েছে কিন্তু নিজে ঘৃণা করে স্নান করেনি। তারপর সে পুকুরের ঘাটে গিয়েছে কে যেন তাকে ঠেলে নিয়ে ওই পুকুরের জলে ফেলেছে। সে আর উঠতে পারে না। পুকুরে জল কিন্তু অল্প ছিল, সে যতবার উঠতে চায় ততবার কেউ তাকে চেপে ধরে। আমারা সবাই ভেবেছি ওর খিঁচুনি রোগ আছে সেই জন্য ও উঠতে পারছে না। তারপর তার মেয়ে ঠাকুরের কাছে কাঁদতে লগল। সেই মহিলা তখন গণ্ডি কাটতে কাটতে উপরে ওঠে। এরপর তার উপর ঠাকুরের ভর হয়। তখন তাকে ঠাকুর নির্দেশ দিল যে তোরা কেউ আচার পালন করিস না। পুজো নিয়ে অশান্তি আর দল ভাগাভাগি শুরু করেছিস। তারপর বলল আমার চরণামৃত এনে ওর মুখে দে। মেয়েটির মুখে তা দিলে সে ভালো হয়ে যায়। এখানে যদিও শনিবার আর মঙ্গলবার পূজা হয়, কিন্তু বাইরে থেকে প্রচুর লোকজন প্রতিদিনই আসে পূজা দিতে।

২০। সাক্ষাৎকারদাতা- শঙ্কর মণ্ডল

০৬। ০৪। ২০১৫ সোমবার

থান- বড় দুর্গা মন্দির

গ্রাম- বড় দূর্গা, পোস্ট- কেয়াতলা, থানা– বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আখ্যান— বাপ ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি এখানকার পুকুরে যক্ষের জালা ভাসত। অনেকে অনেক কিছু স্বপ্নে পেয়েছে। এক বুড়ো বেনের একটা ছেলে ছিল। ছেলেটার এক জায়গায় বিয়ের ঠিক হয়। বিয়ের রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বুড়োর ছেলে ঐ পুকুরে কিছু ভাত ছুড়ে ফেলে। তারপর থেকে সেই ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। মন্দিরে একটা প্রায় বুজে যাওয়া গর্ত আছে। সেখানে একটা মানিক ছিল বলে জনশ্রুতি। প্রায় ২০০ বছর আগে সেখানে এক সাধু এসেছিলেন। সে কিছু ঘুঁটে সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাত সন্ধেবেলা। তারপর তার চারপাশ ঘিরে নাচত আর খুব চিৎকার করত। তার চিৎকারে

আশেপাশে বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে আসত। প্রায় দুইমাস ওইভাবে চলার পর সাধু নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে মানিকটাও উধাও হয়। জনশ্রুতি এখানে একটা সোনার কুয়া আছে। এই মন্দিরে তো বটেই এই গ্রামের মধ্যে কোথাও তিন ঠাকুর দুর্গা, কালী আর শিবের মূর্তি তৈরি হয় না বা এই তিন দেবতার মূর্তি পূজা হয় না। কথিত আছে চাঁদ সওদাগর যখন বাণিজ্যে গিয়ে যে কমলে কামিনী দেখেছিলেন, সেই কমল বনের গজই এখানে পাথর রূপে পূজিত হচ্ছে। মন্দিরের পেছনে একটা প্রাচীন গাছ আছে, যজ্ঞি ডুমুর গাছ। জনবিশ্বাস যে গাছটা এত প্রাচীন যে তা শুধু ছালের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীনকালে বণিকরা যখন এখানে নোঙর করত, তখন এই গাছের গুঁড়িতে নৌকা বাঁধত। গাছের দেবতা এত জাগ্রত যে কেউ আঘাত করলে তার গা থেকে আঠার বদলে রক্ত ঝরে পড়ে।

২১। সাক্ষাৎকারদাতা- সুনীল সরকার, সন্তোষ ছাটুই

০৬। ০৪। ০২১৫, রবিবার

কালীমন্দির

গ্রাম+ পো- ময়দা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আখ্যান— এক সময়ে এই জায়গা দিয়ে আদিগঙ্গা প্রবাহিত হত। যে স্থানে মন্দিরটি আজ অবস্থিত সুদূর অতীতে এই স্থানটি জঙ্গলে ভর্তি ছিল। আর এর পাশেই আদিগঙ্গা বয়ে চলত। একদিন ঐ গঙ্গা দিয়ে এক মাঝি নৌকা নিয়ে যাওয়ার সময় শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছিল। ঐ সময় ওই সময় জঙ্গল থেকে এক বালিকা বলে উঠল, 'ওরে মাঝি ফিরে গা'। মাঝি বলল, 'সাধ থাকে তো ফিরে চা'। মাঝি আবার গান গায় কিন্তু সেই বালিকাকে আর দেখা যায় না। তারপর রাত্রে স্বপ্নে একটি পাতালভেদী শিলা পান ও সেখান থেকে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

আর একটি কাহিনি পাওয়া যায় যে এক রাখাল এই জঙ্গলে ভর্তি জায়গায় গরু চরাত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গাভীগুলির মধ্যে একটি গাভীর দুধ পাওয়া যেত না। গাভীর মালিক একদিন সন্দেহ করে একদিন ওই গাভীটিকে অনুসরণ করে ও দেখে যে জঙ্গলের একটি জায়গায় গাভীটির বাঁট থেকে আপনা হতেই দুধ বের হচ্ছে। তখন গাভীর মালিক স্বপ্ন পান ও ঐ জায়গাটি খুঁড়ে একটি শিলাখণ্ড পায় ও তিনি ওই মন্দির তৈরি করেন।

কালীমন্দিরের পূর্বদিকে কালীকুণ্ড নামে একটি পুকুর আছে, এই পুকুরে স্নান করলে মায়ের মৃত সন্তান রক্ষা পায়। এমনও শোনা যায় যে কালীবাড়ির মধ্যে মায়ের মূর্তি আনা নিষেধ, যে এই নিয়ম অমান্য করেছে তাকে বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে।

সন্তোষ ছাটুই-এর বলা কাহিনি— একবার সে অনেকদিন আগের কথা সুবর্ণ চৌধুরীদের কোনো এক পুরুষ বজরা নিয়ে বেড়াতে বের হন। গঙ্গা দিয়ে যাবার সময় তাদের চোখে পড়ে বকুল গাছের ডালে এক আট নয় বছরের মেয়ে খেলছে দুলছে। জমিদার অবাক হয়ে বজরা থামিয়ে বালিকার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলে বালিকা বনের মধ্যে মিলিয়ে যায়। জমিদার মাঝিদের কাছে জানতে চাইলে তারা বলে ও ডাইনি, আমরা অনেকবার ধরার চেষ্টা করেও পারিনি।

জমিদারকে পরে সেই বালিকা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে যে 'তুই আমাকে ধরার বৃথা চেষ্টা করছিস। আমি ময়দানবের পরমারাধ্যা দেবী কালী। তুই ওই বকুল গাছের কাছে সকালে গিয়ে দেখবি বিরাট মাটির স্তুপ আছে। আর তার উপরে বড় বড় গাছ আছে। গাছ কেটে মাটি খুঁড়লে আমায় দেখতে পাবি। সেইমতো জমিদার এসে মাটি খুঁড়ে একটি মাটির স্তুপ পান। স্তুপ খুঁজে এক শিলা পান। জমিদার মূর্তি না পেয়ে হতাশ হলে আবার স্বপ্নাদেশ পান 'তুই এভাবে আমায় তুলতে পারবি না। তুই ওখানেই আমার মন্দির করে দে। সেইমত এই মন্দির । মন্দিরের কোনো মূর্তি নেই। একটি চতুষ্কোণ গর্তে দেবীর প্রতীক স্বরূপ একটি শিলাখন্ডকে পুজো দেওয়া হয়। একটি কথা এখানে বলা দরকার যে মা যে বকুল গাছটির উপর খেলা করছিল সে গাছটি এখনও আছে। ঐ বকুল গাছটি চিরকুমার কারণ গাছটিতে ফুল হয় কিন্তু কোনো ফল হয় না।

২২। সাক্ষাৎকারদাতা- গোষ্ঠবিহারী হালদার, নিধিরাম মুদি, পাঞ্চালী মুদি।

৭। ১০। ২০১৬ সোমবার

থান- কুকুরঝাটি গাছ, নারায়নীর থান

দক্ষিণ কঙ্কনদীঘী, রায়দিঘি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

আখ্যান— এই গাছটি বহুদিনের পুরানো। আদিবাসীরা যখন জঙ্গল পরিষ্কার করে তখন এই গাছ ও থানটিকে পায়। এই থান ও গাছকে প্রথম আদিবাসীরা পুজো করত, তারপর আদিবাসীরা অক্ষম হয়ে পড়লে গ্রামের সবাই এর পূজা করে। আষাঢ় মাসের অম্বুবাচীর দিনে গ্রামের সমস্ত মানুষ মিলে পুজো দেওয়া হয়। একটি বিশেষ কারনে এই গাছকে কেউ কাটে না। কেননা দেখা গেছে কেউ এর ডাল কেটে বাড়িতে নিয়ে গেলে তাঁর ক্ষতি হচ্ছে। এই গ্রামের একজন গাছের ডাল কেটে ঢেঁকি বানিয়েছিল, সেই ঢেঁকি রাত্রে চলছে। গ্রামের সবাই মিলে একবার ঠিক করা হয় যে এই থান ও গাছটিকে আটচালা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হোক। আদিবাসীরা বলল না তা করা যাবে না। তারা বলল আমাদের দেবতা এইভাবে জলে বৃষ্টিতে থাকবে। ওদের মুখ থেকে আমরা শুনেছি যে এটা করলে ক্ষতি হবে ও তা নাকি হয়েছে। পাশের গ্রামে এই একই গাছের ডালপালা ঝড় ও বৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছিল। পাশের গ্রামের এক মুসলমান সেই ডাল নিয়ে পুকুরের ঘাটে লাগিয়েছিল। সেই ডাল রাত্রে পুকুরের মাঝখানে চলে যায়। তখন তারা সেই ডাল আবার এইখানে দিয়ে যায়। তখন থেকে আর কেউ এর ডালপালা নিয়ে যায় না। প্রায় পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ হাজার টাকার কাঠ এখনও পড়ে আছে কেউ হাত দেয় না। যাদের থান তারাও সাহস করে না।

তখন তো এইখানে জঙ্গলে ভর্তি ছিল। একবার একটি ছেলে নদীতে মাছ ধরতে যায়, মাছ ধরার সময় তাকে বাঘে ধরে। কিন্তু সে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে মার কাছে মানসিক করে গিয়েছিল। তাই সে বেঁচে ফিরে আসে ও মায়ের ছলন পুরোহিত দিয়ে পুজো করে কিন্তু মা তাকে জানায় যে কোনো পুরোহিত দিয়ে যেন পুজো না হয়। নিজেরা মন দিয়ে পুজো করলেই হবে। সেই থেকে এইখানে কোনো পুরোহিত না দিয়েই পুজো হয়। শিশির সর্দার বলে আমাদের এই গ্রামের এক লোকের সতের দিনের বাচ্চা প্রায় মারা গিয়েছিল। তো শিশিরের স্ত্রী আমায় এসে বলল ও পিসি আমায় একটা মানসিক করে দাও না মার কাছে? আমি তখন এক দাদার কাছে গিয়ে বললাম সমস্ত কিছু, তখন দাদা পুকুরের জলে স্নান করে মায়ের থানে গিয়ে মানসিক করল ও একটি ফুল গাছে দিয়ে দিল। আর ছেলেটির মা নীচে বসে কান্না করছিল। তখন সেই ফুলটি নিয়ে গিয়ে বাচ্চাটার কাছে রাখল আর ছেলেটি সুস্থ হয়ে গেল। এখন তো মা অনেক সহ্য করে আগে কেউ যদি মার দিকে কিছু ছুঁড়ত সেই জিনিস ঠিক তার গায়ে গিয়ে পড়ত। আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত বা পা খারাপ হয়ে যেত।

উত্তরপ্রদেশের কিছু মানুষের জমি এখন এখানে আছে তারা একবার এখানে এসে এই গাছের একটি সোজা ডাল কেটেছিল। তারপর তার প্রচুর বিপদ হয়। তখন তারা মানসিক করে রেহাই পায়।

২৩। সাক্ষাৎকারদাতা- গোষ্ঠবিহারী হালদার।

৭। ১০। ২০১৬ সোমবার

থান- আটেশ্বর।

উত্তর কঙ্কনদীঘী, রায়দিঘি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

আখ্যান— বাবা ঠাকুরদার মুখ থেকে শুনেছি, বর্ষাকালে কোটালের সময় নদীর বাঁধকে কাঁচা মাটি দিয়ে তৈরি করা হত। অনেক সময় হাওয়ায় নদীর জল এত ফুলে উঠত যে বাঁধকে কোনোমতে রক্ষা করা যাবে না। যদিও দিনের সময় সবাই মিলে কোন রকমে বাঁচান যেত, রাত্রে কোনভাবেই বাঁধ রক্ষা সম্ভব ছিল না। গ্রামের সবাই মিলে এসে বাবা আটেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে-'বাবা যদি কোনভাবে বাঁধ রক্ষা করা যায় তো আমরা সবাই রেহাই পেয়ে যাব।' এই অঞ্চলে তখন লোক বসতি খুবই কম ছিল। গভীর রাত্রে শোনা যায় বাঁধে কে যেন দুমদাম আওয়াজ করছে অথচ কাউকে দেখা যায় না। সকালে সবাই গিয়ে দেখে যে বাঁধটা ঠিক আছে ভেঙে যায়নি।

২৪। সাক্ষাৎকারদাতা- শোভন ভাণ্ডারী ও কুমারী নস্কর

৭। ১০। ২০১৬ সোমবার

থান- ছাওয়াল পীরের থান

গ্রাম- নলগোড়া, পো- নলগোড়া, থানা- কুলতলি

আখ্যান— এই থানের পিছন দিকে পুরো মাঠ ছিল। এই মাঠের মাঝখানে এই গাছটি প্রথম থেকেই ছিল কিন্তু এই গাছের নাম কেউ বলতে পারেনি। মাঠে যারা গরু চরাতো তারাই এই গাছের নীচে পুজো দিত। দুলাল চন্দ্র মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে একটি বাচ্চা ছেলে স্বপ্নে আদেশ দেয় এইখানে মন্দির করে দেওয়ার জন্য। তখন তিনি ইঁট ও খোলার টালি দিয়ে চালা মতো করে দেয়। এইভাবেই

পুজো চলে আসছিল। এইখানে একজন মানত করে গিয়েছিলেন যে তার গরুর প্রথম দুধ ঠাকুরকে দেবে কিন্তু তিনি তা না করে বাইরে থেকে দুধ কিনে এনে ঠাকুর পুজো করেন। এরপর থেকে সেই গরুর বাছুরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখন সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করে সে কোন অপরাধ করেছে কিনা? সে তখন সব কিছু বলে। গ্রামের সবাই তাকে বলে যে ঠাকুরের কাছে সে যেন মিনতি করে। সে তাই করল ও একদিন পরে দেখে না বাছুরটি ঠিক সেই থানে বসে আছে।

একবার জামাল বলে এক মুসলমান বলেছিল হিন্দুদের কি সব ঠাকুর নিয়ে মাতামাতি। আসলে সে এই ঠাকুরকে অবহেলা করেছিল। এই মুসলমান খুব সাহসী ছিল। আমরা ওর মুখ থেকে শুনেছি যে একদিন রাত্রে ও এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এবং চার-পাঁচটা ছেলে তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। কোনোমতেই সে আর যেতে পারছিল না। এই ঘটনার পর থেকে বাৎসরিক পুজোর সময় অন্তত সাতশত মুসলমান এই থানে চাঁদা দিয়ে যায়।

একটি মুসলিমের ছেলে এই পথ দিয়ে সন্ধ্যে সাতটার সময় যাচ্ছিল। আমাদের ছেলেরা বলেছিল বাবা তুমি এই পথ দিয়ে যেও না কেননা এইখানে বাবা ছাবালপির আছে। এই কথা শুনে সে বলে যে হিন্দুদের দেবতা হিন্দুকে ধরবে আমার কিছু করবে না। কিন্তু তাকে আর যেতে দেয়নি। আরও একবার একজন জটার পারে গিয়েছিল সাইকেল নিয়ে ওই থানটির পাশ দিয়ে, থানের পাশেই একটি পুকুর আছে। সেই পুকুরে সে দেখে তিন চারটি ছেলে কাদার মধ্যে খেলা করছে। সেই লোকটা তখন বলেছে ‘তোরা কার মার ছেলে? এই কাদা ও ঘোলা জলে খেলছিস?’ তোরা তো মারা পড়বি।’ তখন সেই ছেলেগুলো বলে কে মরে দেখ। সেই লোকটাকে কে যেন এমন জোরে টেনেছে সে জলে গিয়ে পড়েছে। আর ছেলেগুলো পালিয়ে যায়। একজন একবার বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে বলে বাবা ছাবালপির আজ যদি না মাছ হয় তোমাকে জলে চুবাবো। সারাদিন সেই লোকটির একটিও মাছ হয়নি। তখন সেই লোকটি বাবাকে জলে ফেলতে যায় ও তার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে যায়।

২৫। সাক্ষাৎকারদাতা- গোপাল চন্দ্র হালদার

৭। ১০। ২০১৬ সোমবার

থান- বিবিমায়ের থান ও আটেশ্বরের।

গ্রাম- কৃষ্ণচন্দ্রপুর, পো- কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা- মথুরাপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

আখ্যান— এই থানের কাছে একটি পুকুর আছে। কথিত আছে কারোর বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান থাকলে যদি সে শুদ্ধ মনে ও কাপড়ে ওই পুকুরে গিয়ে কিছু চায় সে তা পায়। আবার কাজ হয়ে গেলে তা ফিরিয়ে দিতে হয়। আর যদি কোনো বাসনে বা জিনিসে খারাপ কিছু থাকে সেই জিনিস ডুবে যাবে না তা ভেসে থাকবে। এই পুকুরের জল কোনদীন শুকোয় না।

আমাদের এই থানের পাশেই আটেশ্বরের থান আছে। সবাই বলে কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে ওই থানে গিয়ে মানত করলে তা নাকি পাওয়া যায়। আমার নিজের একবার পয়সা হারিয়ে গিয়েছিল। আমি বাবা আটেশ্বরের কাছে গিয়ে মানত করলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম যে বাবা বলছে 'তুই তো টাকা নিয়ে আসিসনি ব্যাঙ্ক থেকে। তুই চিন্তা করিস না ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখ তোর টাকা ঠিক আছে।' আমি গিয়ে দেখি সত্যি ম্যানেজার আমার টাকা সরিয়ে রেখেছে। আমি তখন আটেশ্বরের কাছে এসে গাঁজা ও কিছু উপকরণ দিয়ে পুজো করলাম।

একবার আমার নাতনির কানের মাকড়ি চলে যায়। সে গিয়ে আটেশ্বরের কাছে মানত করে। তারপর সে নিজেই বলল যে কলতলার ড্রেনে মকড়ি পড়ে আছে। আমরা সবাই বললাম তুই কি করে জানলি? ও তখন বলে কে যেন মাথায় পাগড়ি পরা লোক এসে বলল 'তুই এত খোঁজাখুঁজি করছিস আর ড্রেনে পড়ে আছে দেখছিস না? পেলে পূজা দিস' ভালো করে। আমার নাতনি বললো 'কার পূজা দেব?' তখন সেই লোকটা বলছে 'যার কাছে মানসিক করেছিস তাকে দিবি।'

আর একটি ঘটনা হল, আমার জ্যাঠামশাই, তিনি অপুত্রক ছিলেন আর খুব দাপুটে ছিলেন। তিনি মদ খেতেন। তখন এই আটেশ্বরের থান একেবারে ভেঙে পড়েছিল। জ্যাঠামশাই একদিন বলছে তোর এত টাকা আছে আমায় দিতে পারিস না? আমি তোর ঘর ভালো করে তৈরি করে দেব। সেই দিন রাত্রে উনি স্বপ্ন দেখলেন যে কেউ যেন বলছে 'তুই টাকা চেয়েছিস আমি দেব। সাত ঘোড়া রুপোর টাকা আছে। তোকে তার আগে আমায় দুটো নারকেল দিতে হবে।' মানে দুটো ছেলেকে চাইছেন। জ্যাঠামশাই বললেন 'না ওটা হবে না, তার উপর আমার কোনো সন্তান নেই।' তখন সেই লোকটা বলল 'আছে তুই একবার হ্যাঁ বল না।' তখন উনি রাগ করে বললেন 'তুই যা এখান থেকে,

তোর কোনো টাকার দরকার নেই।' কিন্তু সে যায় না। জ্যাঠামশাই তখন রেগে মারতে যায়। তারপর সেই লোকটি বলে 'তুই আমায় দিলি না তো। তবে একটা কাজ কর বাড়ির পিছন দিকে একটি থলে পাবি সেই দিয়ে কিছু না কর আমার থানটা তৈরি করে দে।' কত টাকা উনি দিয়েছিলেন তা আমরা জানি না। সেই টাকা দিয়ে এই থানটি তৈরি করা হয়।

২৬। সাক্ষাৎকারদাতা- যতিন সর্দার ও দেবপ্রসাদ পেয়াদা

২০। ০৯। ২০১৬

থান- ত্রিপুরা সুন্দরী

ছত্রভোগ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

আখ্যান— মা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরটা চার থেকে পাঁচ শত বছরের পুরনো। যখন মা দেহ ত্যাগ করেন এবং শিব সেই দেহ কাঁধে করে ঘুরে ছিলেন, তখন তার দেহের একটি অংশ এইখানে পড়ে। আগে এইখানে জঙ্গল ছিল। সাতাশ নম্বর লাটের এক ভদ্রলোক ঈশান কর্মকারকে একদিন দেবী স্বপ্নে বলে 'আমি এই লোহা কাটা জঙ্গলে আছি আমায় এখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা কর।' তখন ঈশানবাবু এই মন্দিরটা তৈরি করে দেয়। মা গঙ্গাকে যখন ভগীরথ মর্ত্যে আনেন গঙ্গা এই মন্দিরের সামনে থেকে বয়ে যায়। এবং চৈতন্য লীলাচলে এই পথ দিয়েই যায়। এর থেকে একটু দুরেই যে অম্বুলিম্ব ঘাট আছে সেখানে চৈতন্য স্নান করেছিল। এর পাশেই অন্ধ মুনির আশ্রম আছে, শোনা যায় উনি আগে অন্ধ ছিলেন না। উনি একদিন মাঠে চাষ করছিলেন। দূর থেকে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আসতে দেখে উনি মুগ্ধ হয়ে যান। মেয়েটি কাছে আসলে বুঝতে পারে যে মেয়েটি তার মা। এই লজ্জায় সে নিজের চোখ অন্ধ করে নেয়।

মায়ের এক সময় কলমি শাক খাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। এই মন্দিরের সামনে যে মাঠ আছে সেই বাগানে মা শাক চুরি করতে গিয়েছিল। বাগানের মালিক তা দেখতে পেয়ে মাকে তাড়া করে, মায়ের হাতে একটি জাঁতি ছিল যা ওই বাগানেই মা ফেলে আসে। পুরোহিত এসে দেখে মায়ের

হাতে জাঁতি নেই, তারপর সবাই খুঁজে দেখে যে বাগানে পড়ে আছে ও মা যে শাক চুরি করেছিল তাও পড়ে আছে।

তখন জমিদারের আমল। এই মা যখন এইখানে থাকতেন তখন এই সমস্ত এলাকা জঙ্গলে ভর্তি ছিল। এক শাঁখারি এই মাঠের সরু পথ ধরে বাপুলির বাজারে শাঁখা বিক্রি করতে যেত। মা একদিন কি করেছে সেই শাঁখারিকে ডেকে বলল 'আমার দু হাতে শাঁখা দাও।' শাঁখারি টাকা চাইলে মা বলল 'আমার বাবা মথুরাপুরের আশু চক্রবর্তী, তার কাছে গিয়ে বলবে তোমার সিকেতে যে হাড়ি আছে তাতে একটি সিকে আছে সেখান থেকে পয়সা দাও, তোমার মেয়ে যাকে ছত্রভোগে বিয়ে দিয়েছ সে শাঁখা পরেছে।' এরপর সেই লোক গিয়ে সব বলল কিন্তু আশু চক্রবর্তী বলল যে 'এখানে তো আমার কোনো মেয়ে নেই।' তারপর সেই লোক হাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখল যে সত্যি পয়সা আছে। সেই টাকা ব্যাপারিকে দিল কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগল যে ওখানে তো আমার কোন মেয়ে নেই! তিনি তখন মায়ের মন্দিরে গিয়ে দেখে যে মায়ের হাতে শাঁখা পরা আছে।

একবার এক ভদ্রলোক মাকে একটি শাড়ী দিয়েছিল। সে সবাইকে বলতে লাগল যে আমি মাকে যা শাড়ী দিয়েছি তা অনেকে দিতে পারবে না। রাত্রে সেই শাড়ি মা খুলে ফেলে দিয়েছিল। সকাল বেলায় সেবায়েত এসে দেখে যে মা উলঙ্গ ও শাড়ী ছিঁড়ে ফেলে রেখে দিয়েছে। সবাই বুঝতে পারেনি কেন মা এমন করল। তারপর জানা গেল সেই লোকটিকে মা স্বপ্ন দিয়েছে যে 'তুই আমায় একটা শাড়ী দিয়ে এত অহংকার করছিস? তাই আমি তোর শাড়ী পরব না।' সেই ব্যক্তি তখন মার কাছে এসে কান্নাকাটি করার পর সব ঠিক হয়। মায়ের এই খানেই দুইখানা পাথর আছে বহুদিন থেকে। এই পাথরকে খুব শক্তিমান লোকও তুলতে পারে না। কিন্তু মায়ের নাম নিয়ে তুলতে গেলে তারা তুলে ফেলে। নালুয়া থেকে একদল লোক পাঁঠাবলি দিতে এসে ঝগড়া করে চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা একটি পাথর নিয়ে চলে যায়। কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে পাঁঠা বলি দিতে পারেনি। তারপর তারা মায়ের পায়ের ফুল নিয়ে যাওয়ার পর তবেই বলি দিতে পারে।

সেকালে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যেত ছুতোরভোগ নদী। একবার বাগদীদের মেয়েরা এই নদীতে মাছ ধরতে আসছিল। তাদের সঙ্গে ছিল হাঁড়ি, খাঁচা, জাল আর খাবার জন্য

শুকনো চিড়ে গুড়। দেবী ত্রিপুরার মন্দিরে তারা জলখাবার খেয়ে নেবার মনস্থ করে। খাবার বের করে তাদের মনে হল মা ত্রিপুরাকে না দিয়ে কী করে খাব? তারা তখন পাশের পদ্মপাতার বন থেকে একটি পাতা এনে মাকে ভোগ সাজিয়ে দেয়। এবং বলে যে মা আজ যেন অনেক মাছ পাই। নদীতে গিয়ে সার দিয়ে জাল বাইতে লাগল বাগদিনীর দল। কিন্তু জালে মাছ পড়ছে না। তারা তখন কপাল চাপড়ে বলে, 'আজ মায়ের পুজো দিলাম অথচ আজ একটি চুনো মাছ পড়ছে না'। এরপর বাগদির দল কানে নুপুরের শব্দ শুনতে পায়। তারা দেখতে পায় একটি শ্যামলা মেয়ে রক্তজবার মত শাড়ী পরে তাদের দিকে আসছে। নদীর কাদা মাড়িয়ে সেই মেয়ে তাদের দিকে নেমে আসছে। এক বাগদি বলে 'তুমি কে গো?' সেই মেয়ে বলে 'আমিও বাগদির মেয়ে।' আর মন্দিরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে 'ওই দিকে আমার ঘর।' বাগদিরা বলে 'এমন সেজে তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সেই মেয়ে বড়াশি শিবের মন্দিরের দিকে হাত দেখিয়ে বলে ওই দিকে আমার বরের কাছে। 'তবে তুমি যে জলে নামলে?' বাগদিরা বলে। সেই মেয়ে তখন বলে 'তোমরা মাছ ধরছ, দেখে আমার মনে হল আমিও মাছ ধরি।' মেয়েটি তখন বলে 'তোমাদের একটা ছাগুন জাল দাও না আমি মাছ ধরি।' বাগদিরা ছাগুন জাল দিলে সেই মেয়ে মাছ ধরতে লাগল। বাগদিরা আশ্চর্য হয়ে দেখল যে সেই মেয়েটির জালে মাছ ভরে উঠছে। এই দেখে বাগদীর দল জাল বাইতে শুরু করে ও তাদের জালেও মাছ ভরে উঠতে লাগল। বাগদির দল আনন্দে মাছ ধরতে লাগল। এমন সময় মন্দিরে ঘন্টা বেজে ওঠে। মন্দিরে পুজোর সময় হয়েছে। হঠাৎ মেয়েটি বলে 'আমি এইবার যাই। আমায় ডাকছে বলে সে মন্দিরের দিকে দৌড়তে লাগল।' বাগদিরা বলে যে বরের কাছে যাবে বলে মন্দিরের দিকে যাচ্ছ যে? তারা তখন দেখে অবাক হয়ে যায় সেই মেয়েটি যে পথে দিয়ে গিয়েছে তার চলে যাওয়া ছাপগুলো যেন আলতারাঙা। সেই বাগদিরা পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে এগিয়ে যায় ও দেখে যে পায়ের ছাপ ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে গিয়ে মিশেছে। তারা শিহরিত হয় মা ত্রিপুরাসুন্দরী কি তাহলে এতক্ষণ তাদের সঙ্গে বাগদির বেশে মাছ ধরেছে? তারা অদ্ভুত এক আনন্দে মেতে ওঠে। এই খবর যখন সবাই পায় তখন সবাই মায়ের মন্দিরের সামনে দৌড়ে আসে। মন্দিরের সেবক দৌঁড়ে যায় মহামাণ্ডলিকের কাছে। পাইক পেয়াদা লাঠিয়ালসহ মহামাণ্ডলিক আসেন ও কী ব্যাপার জানতে চান। তারা বলে, 'মহারাজ আজ মা ত্রিপুরা আমাদের সঙ্গে মাছ ধরেছেন। মন্দিরে পুজোর ঘণ্টা শুনে চলে আসেন'। প্রমাণ কই? মহারাজা জানতে

চান। তারা তখন বলে ওই দেখুন আলতারাঙ্গা ছাপ। মহারাজা দেখে কোথাও সেই ছাপ নেই। মায়ের পদচিহ্ন উধাও। বাগদিনীর দল বিস্মিত হয়। মহারাজ গর্জে ওঠেন 'মায়ের নামে মিথ্যে কথা, এদের বেঁধে রাখ'। মহারাজ পুরোহিতকে বললেন 'আপনি পুজো শুরু করে দিন'। পুরোহিত মন্দিরের দ্বার খুলে চমকে ওঠেন। পুরোহিত দেখেন গর্ভগৃহ জলে থৈ থৈ করছে। দেবীর শাড়ির ভাঁজে, হাতে, মাথার চুলে কাদা মাখামাখি। তিনি চিৎকার করে ওঠেন ' মহারাজ বাগদিনীরা ঠিক কথা বলেছে। এখুনি ওদের মুক্ত করুন। মা আজ ওদের সঙ্গেই মাছ ধরেছে'। নদী জল আর কাদায় মাখামাখি মাকে দেখে মহারাজ বিস্মিত হয়। তিনি তখন ওই বাগদিনীদের মুক্ত করে দেন।

২৮। সাক্ষাৎকারদাতা- সঞ্জয় ঘরামী ও পঞ্চানন্দ হালদার (৭৩)

থান- বুড়িমার থান (নারায়নীর থান)

গ্রাম+ পো- দক্ষিণ জয়কৃষ্ণপুর, থানা- রায়দিঘি

আখ্যান— আমার বাবা ঠাকুরদার কাছ থেকে শোনা যে এক ঠাকুর মশায় নদীর ওপার থেকে এসে এখানকার জমিদারের বাড়িতে পুজো করত। একদিন এক বুড়ি সাদা থান পরে তাকে বলে যে 'বেটা তুই এইখানে জঙ্গল পরিষ্কার করে আমার পুজো করবি।' তারপর ঠাকুর মশাই সবার সাথে এসে আলোচনা করে এবং সেইখান থেকে মায়ের পুজো করা হয়।

মায়ের যে প্রতিদিন পুজো দেন সেই পূজারিণী একদিন পুজো শেষ হলে মন্দিরে চাবি দিতে গিয়ে দেখে কোনমতেই চাবি লাগছে না। সেই সময় একটি বাচ্চার রূপ ধরে মা এসে বলে যে দেখ মন্দিরের বাইরে কী পড়ে আছে। তখন তিনি দেখে যে মায়ের শত প্রদীপ বাইরে পড়ে আছে। তারপর তিনি কান্নাকাটি করার পর তালা সাথে সাথে লেগে যায়। আর একবার পুরোহিত মশায় মায়ের একটি কাপড় নিয়ে গিয়েছিল। সেই পুরোহিত বাড়িতে থাকতে পারছিল না, তাকে শূন্যে তুলে কেউ যেন আছাড় মারছে। তখন সেই পুরোহিত শাড়ি ফেরত দিয়ে মায়ের কাছে ক্ষমা চায় তারপর পুরোহিত সুস্থ হয়।

জমিদারের আমলে ছাতুয়া নদী যখন ছিল। তখন ধনঞ্জয় কয়ালের স্ত্রীকে একবার কুমীরে ধরেছিল। ধনঞ্জয় কয়াল তখন মায়ের কাছে মুদো বাঁধে ও বলে মা আমি এই মেটের খালে ফাঁস দিচ্ছি যদি সারাদিনের মধ্যে কুমীর এই ফাঁসের মধ্যে পড়ে তাহলে আমি তোমার মূর্তি তুলে পুজো দেব। সেই কুমীর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ধরা পড়ে। এমন একবার শোনা গেছে অভাবের জ্বালায় এক বামুন মায়ের কানের থেকে সোনার মাকড়ি খুলে নিয়ে গিয়েছিল। তখন জমিদারের আমল। মায়ের কানের মাকড়ি না পাওয়ায় সবাই খুঁজতে লাগল। দারোয়ান তখন সেই বামুনকে ধরে আনে। মা সেই রাতে জমিদারের কাকাকে স্বপ্ন দেয় যে ওকে কিছু বলিস না ও অভাবের জ্বালায় এই কাজ করেছে। পরদিন জমিদার সেই বামুনকে ছেড়ে দেয়।

সাক্ষাৎকারদাতা- লক্ষীরাণী দাস

থান- নারায়নী।

ধনবেড়িয়া।

আখ্যান— উনপঞ্চাশ সালে একবার বন্যা হয়। সেই সময় মায়ের সোনার মূর্তি একটি গেঁয়ো গাছে আটকায়। সকালবেলা দেখি বামুনপাড়া থেকে লোক সব ছুটে ছুটে আসছে। আমাদের পাড়ার সবাই তাদের জিজ্ঞেস করছে তোমরা কেনো ছুটে আসছ? বামুন পাড়ার সবাই বলে যে মা নাকি রাতে তাদের স্বপ্ন দিয়েছে যে ‘আমি মা নারায়ণী এই গেঁয়ো গাছে আছি আমায় এখান থেকে নামা।’ তারা মাকে নামাল ও আমাদের বলল যে তোমাদের তো গরিব পাড়া তোমরা কি মাকে রাখতে পারবে? আমাদের গ্রামের সবাই বলল যে তোমরা মাকে নিয়ে যাও। তারা সেই মত মাকে নিয়ে গিয়ে তাদের পাড়ায় মন্দির করে দিল। তারপর আমাদের গ্রামের সবাই মনে করল যে এইটা আমাদের মায়ের আদি থান, তাই এখানে একটা মায়ের থান করা দরকার। সবাই মিলে তখন ছিটে বেড়া দিয়ে মায়ের ঘর করে দিল।

একবার এক ব্রাহ্মণের বাবা মারা গিয়েছিল। সে তখন চান করে গায়ে যে সাদা থান ছিল তার একটা খুঁট ওই গাছে শুকনো হতে দিয়েছিল। তারপর থেকে ওই গাছটি মারা যায়। মা রাতে তাকে স্বপ্ন দেয় যে তুই আমার উপর আশৌচ অবস্থায় কাপড় শুকোতে দিয়েছিস তাই আমি মরে গেছি। যদি

পারিস তো ঐখানে ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে পুজো দিয়ে ঘট স্থাপন কর। কিন্তু সে তা করেনি। তার যে কটা ছেলে ছিল সবাই মারা গিয়েছিল। তখন তারা এই পাড়া ছেড়ে চলে যায়। পরে তারা ওইখানে ঘট বসিয়ে দিয়ে যায়। এরপর তারা আবার এই পাড়ায় এসে বসবাস করে।

নাপিত পাড়ায় অনেক কুকুর ছিল। মা রাত্রে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যাতায়াত করে। নাপিত পাড়ায় মা কুকুরের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। ঐ পাড়ায় একজনকে স্বপ্ন দিয়েছিল যে নাপিত পাড়ায় কেউ যেন কুকুর না পোষে, কেউ যদি কুকুর পোষে তাহলে তার বিপদ হবে। সেদিন থেকে নাপিত পাড়ায় কেউ কুকুর পোষেনি।

আমাদের এই ধনবেড়িয়া গ্রামে মায়ের নির্দেশ ছিল যে অন্য কোন ঠাকুরের যেন পুজো না দেওয়া হয়। একবার এখানে সরস্বতীর পুজো হচ্ছে। গ্রামের সবাইকে খিচুড়ি দেওয়া হবে। আমি এইখানে একা বসে বসে আনাচ কাটছি হঠাৎ দেখি যে কোথাও আগুন নেই কিন্তু প্যাণ্ডেলে আগুন লেগে গেছে। তখন আমাদের সবার মায়ের নিষেধের কথা মনে পড়ে যায়।

প্রতি বছর বাৎসরিক পুজোর সময় মায়ের নতুন মূর্তি আনা হয়। এক বছর এক পটুয়া মায়ের কাছে মানসিক করে যে আমি মায়ের নতুন মূর্তি দেব। তিনি এসে বলে যে ওই আদি ঠাকুরকে বের করে দাও। আমি যে ছলন দিচ্ছি ওই আদি ঠাকুরের কাছে বসিয়ে দাও। সবাই তখন মায়ের পুরানো মূর্তি থানের পিছনে রেখে এসে ওই নতুন মূর্তি আদি ঠাকুরের কাছে রেখেছে। সেই দিন আমার ভর হয়েছে। মায়ের নামে যে গান হয় সেই গান শুরু হয়েছে। ওই গানের দলের মৌসুমী নামে একটি মেয়ে গান শুরু করার আগে মায়ের থানে প্রনাম করতে এসেছে। সে প্রনাম করতে এসে নিজেই দুলতে শুরু করেছে। সেই মেয়েকে নিয়ে মায়ের থানের দাওয়ায় বসিয়ে দেওয়া হল, এর একটু পরে আর একজন পড়ে গেল। ওই মেয়ের বর এসে আমায় বলল যে মা তুমি দেখো যাতে আমার বউয়ের কোন সমস্যা না হয়। এরপর প্রচণ্ড বৃষ্টি নামে কিন্তু যেখানে ওই মায়ের পুরান মূর্তি আছে সেখানে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি। আমি তখন বললাম যে এই নতুন ঠাকুরকে বের করে দে আর ওই যে পুরানো ঠাকুর আছে তাকে নিয়ে আয়। তারপর মায়ের পায়ের ধোয়া জল দুজনকে খাইয়ে দেওয়ার পর তারা সুস্থ হয়।

যাদের বাচ্চা হয় না আমি তাদের ঔষধ দেই। আমি এই ঔষধ স্বপ্নে পাই। আমার কাছে ঔষধ খেতে হবে মা যখন ঋতুমতী হবে তার থেকে তিন দিন ধরে। এরপর যখন তার গর্ভে পাঁচ মাসের বাচ্চা হবে তখন ঐ মায়ের হাতে একটি কবচ বাঁধা হয়। যখন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে তখন তার কোমরে আর একটা কবচ দেওয়া হয়। এরপর বাচ্চার যা কিছু আসুখ হবে তা সব ওই বাবা মা দেখবে। আমি যদি বলি যে বাচ্চাকে ডাক্তারের কেছে নিয়ে যাও, তবেই সে ডাক্তারের কাছে যাবে, নাহলে সে যাবে না। একবার আমার এক ভাইপোকে ভূতে ধরেছে এইখানের এক গাছ থেকে। সেই ছেলে তো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। তার মা এসে বলছে যে দিদি তুমি আমার ছেলেকে বাঁচাও। সেই ছেলেকে তো হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আমি তখন দেখলাম যে ছেলেকে ভুতেও ধরেছে আবার জন্ডিস হয়েছে। সেই ছেলেকে আমি ঘরে আনতে বলি। আমার ছেলেরা আমায় বকতে লাগল যে ওই ছেলেকে আমি বাঁচাতে পারব কিনা। আমি তখন বললাম যে ওই ছেলে ভালো হয়ে যাবে। সেই ছেলে কিছুদিন পরে ভালো হয়ে গেল।

একবার আমাদের এই পাড়ায় হালদারদের বউ সুশীলার বাচ্চা হয় না। গ্রামের সবাই বলে যে ও বাঁজা ওর কখন বাচ্চা হবে না। ওই হালদারদের বউ আমার কাছ থেকে ঔষধ নিল তার তিনটি ছেলে হল। আবার পরিতোষ বলে আমাদের গ্রামের একজন তার বউয়ের বাচ্চা হয় না। সে আমার কাছ থেকে ঔষুধ নিল তার বউয়ের দুটি বাচ্চা হয়। ওই পরিতোষ মায়ের কাছে মানত করে যে আমি যতদিন বাঁচব ততদিন মায়ের নামে ডালা দেব। এই পরিতোষের বড় ছেলের একবার প্রসাব বন্ধ হয়ে গিয়ে পেট ফুলে গিয়েছিল। ওরা আমার কাছে না নিয়ে এসে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে দেখে ডাক্তারখানা বন্ধ। তখন পরিতোষ মায়ের চরণামৃত নিতে আসে। মায়ের থেকে চরণামৃত নিয়ে সেই ছেলেকে খাওয়ালে ছেলে সুস্থ হয়ে যায়। মায়ের বাৎসরিক পুজোর সময় পরিতোষ সব কিছু নিয়ে আসে কিন্তু থানে যে পঞ্চানন্দ বাবা আছে তার জন্য গাঁজা নিয়ে আসেনি। সে ছেলেকে নিয়ে আসলে ছেলে কিছুতেই থানে আসছে না। থানে এলেই সে চিৎকার করছে। তখন পরিতোষ আমায় বলল দিদি ছেলে কেন এমন করছে? আমি বললাম যে একদিন বাবার কাছে গাঁজা কলকে দিয়ে পুজো দিয়ে আয়। সেই ছেলে সবে হাঁটতে শিখেছে। যেদিন পুজো দেওয়া হয়, তার পরদিন থানের বেড়া ফাঁক করে থানে গিয়ে বসে আছে। তখন আমি ওর মাকে ডেকে এনে বললাম

যে দেখ তোর ছেলে কোথায় বসে আছে! তখন তার মা গিয়ে বলল যে তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে গিয়ে বস। সেই দেড় বছরের বাচ্চা ছেলে বেড়া ফাঁক করে যে পথে এসেছিল সেই পথে আবার ফিরে যায়। আমি তখন বললাম যে দেখ যে থানে আসতে তোর ছেলে ভয় পেত আজ কেমন থানে বাবার কাছে এসে বসে আছে। আমাদের গ্রামের আর এক জন নাম ঝন্টুর যমজ বাচ্চা আছে। সেই যমজ বাচ্চার থেকে মেয়েটির অসুখ হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। একদিন ঝন্টু এসে বলে যে কাকিমা দেখবে এসো আমার মেয়ে কেমন করছে। আমি তখন বলি আমায় বলে কি হবে? যা তোরা মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যা। তারপর আমি গিয়ে দেখি যে মেয়ের আর কিছু নেই তার হাত পা কেমন হয়ে গেছে, তার চোখ উলটে গেছে। আমি তখন ঝন্টুর বউকে বললাম যে তরা মেয়েকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যা। ঝন্টুর বউ বলে যে আমি ডাক্তারের কাছে যেতে পারব না, আমার কাছে কোন টাকা পয়সা নেই। মেয়েকে নিয়ে আমি বাবার কাছে ফেলে দেব তারপর বাবা যা করে করবে। তখন আমি সেই মেয়েকে নিয়ে বাবার কাছে ফেলে দিলাম আর বললাম যে বাবা হয় তুমি একে মেরে দাও নাহলে এর যা আসুখ আছে ভালো করে দাও। তারপর দেখি সেই বাচ্চা থানের মধ্যে বাইছে ও কাঁদছে। এরপর মেয়েটি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যায়।

৩৩। সাক্ষাৎকারদাতা- প্রভাস হালদার

২৩। ০৯। ২০১৬

থান- বোলসিদ্ধি বুড়োশিব।

গ্রাম- ধনবেড়িয়, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

আখ্যান— আমাদের গ্রামের এক বাড়িতে এক গরু ছিল। গরু দেখাশোনা করত এক ছেলে। সেই গরুর কোনভাবেই দুধ হয় না। বাড়ির সবাই ছেলেটাকে বকাবকি করে যে গরুর দুধ হয় না কেন? তুই নিশ্চয় ভালো করে গরুকে খেতে দিস না। সেই ছেলেটা তারপর থেকে লক্ষ্য রাখে গরুটার দিকে, সে কোথায় যায়। একদিন ছেলেটি দেখে যে গরুটা একটি বনের মধ্যে ঢুকে গেল। সে চুপি চুপি গরুটার সঙ্গে যেতে লাগল। সে দেখল যে বনের মধ্যে একটি ঝোপ মতো আছে, সেখানে একটি শিব আছে। গরুটি দাঁড়িয়ে সেই শিবের মাথায় দুধ দিচ্ছে। ছেলেটি বাড়িতে এসে সব ঘটনা বলে।

৩৬। সাক্ষাৎকারদাতা- কৈলাস দাস ও সঞ্জয় ঘোষ

থান- পঞ্চানন্দের থান ও পেঁচ খেচর থান

গ্রাম- পালপাড়া, থানা- জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

আখ্যান— আমরা আগেকার মানুষদের কাছ থেকে শুনেছি যে এই তেঁতুল গাছে বড়রা কেউ উঠলে গাছ থেকে পড়ে যেত। তারা বলত যে তাদের ভয় লাগে আর গা হাত পা কাঁপে। কিন্তু বাচ্চারা গাছে উঠলে তাদের কিছু হয় না। আমরা লোকের মুখে শুনেছি যে আগে বাবা এই থানের কাছে হাওয়া খেতে আসত। কয়াল পাড়ায় বাবা ভোগ ক্ষেত আর এই পাল পাড়ার থানে রাতে বাবা হাওয়া খেতে আসত। বাবা এই তেঁতুল গাছের তলায় থাকে, কেউ কোনদীন বাবার মাথার উপর চালা দিতে পারেনি। আমাদের গ্রামের অনেকে বাবার মাথায় চালা করে দিয়েছিল কিন্তু সকালে গিয়ে দেখে সেই চাল উড়ে যায়। বাবা তাদের স্বপ্ন দেয় আমি এইখানে হাওয়া খেতে আসি আমাকে তোরা ঘেরার চেষ্টা করছিস? সেখান থেকে কেউ আর বাবার মাথার উপর চাল তৈরি করে না।

৩৭। সাক্ষাৎকারদাতা- সুধীর ব্যানার্জি ও লীলা ব্যানার্জি

২৭। ০৯। ২০১৬

থান- বিবিমা ও রক্তাখাঁ গাজীর থান

গ্রাম- রক্তাখাঁ পাড়া, থানা- জয়নগর, জেলা- জয়নগর

আখ্যান— আমাদের এখানে তখন আদিগঙ্গা বয়ে যেত। আমার বাবা একদিন ছিপ নিয়ে রাত্রে মাছ ধরছিল। তখন অনেক রাত হয়ে গেছে, গ্রাম একদম নিঝুম। হঠাৎ আমার বাবা শুনতে পায় ঘোড়ার খুরের শব্দ। বাবা তখন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে যে একজন সুপুরুষ ঘোড়ায় চড়ে আসছে। বাবা অবাক হয়ে যায় আর ভাবতে লাগে এই পাড়া-গাঁয়ে এত রাতে ঘোড়ায় কে চড়ে আসে! তখন বাবা দেখে যে সেই ব্যক্তি এখন যেখানে বিবি মায়ের থান আছে সেইখানে নামল। এরপর বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর আবার ঘোড়ায় চেপে চলে যায়। পরে বাবা জানতে পারে গ্রামের অনেকে এই দৃশ্য দেখেছে। তারপর সবাই ঠিক করে ওই জায়গা খুঁড়বে। সবাই মিলে ওই জায়গা খুঁড়তে গিয়ে দেখে যে

পুকুর দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। কোন মতেই পুকুর কাটা গেল না। রাতে আমার এক পূর্ব পুরুষকে মা স্বপ্ন দেয় আমি এইখানে আছি। সেখান থেকে এইখানে বিবিমা ও রক্তান গাজীর থান প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই পাড়ার নাম হয় রক্তাখাঁ পাড়া।

৩৮। সাক্ষাৎকারদাতা- অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, শুভ্রা ভট্টাচার্য ও সঞ্জয় ঘোষ

২৭। ০৯। ২০১৭

থান- জয়চণ্ডীর থান

গ্রাম- মজিলপুর, থানা- জয়নগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

আখ্যান— এটা একসময় সুন্দরবন এলাকা ছিল। এক সময় এইখান দিয়ে আদিগঙ্গা বয়ে যেত। কোন এক সময়ে গুনানন্দ মতিলাল এই গঙ্গা দিয়ে বানিজ্য করতে গিয়েছিল। অনেক রাত হয়ে যাওয়ার জন্য এই খানের এক বাদাম গাছে তিনি জাহাজ বেঁধে ছিলেন। অনেক রাতে দেখে ছোট একটি মেয়ে জল নিতে আসছেন। তিনি তখন ভাবতে লাগলেন এত রাতে এই বাচ্চা মেয়ে জল নিতে কোথা থেকে আসছে। রাতে তিনি স্বপ্ন পান সেই মেয়ে তাকে বলছে আমি এই পুকুরে আছি তুই আমায় এইখানে প্রতিষ্ঠা কর। সেই এঁদো পুকুর থেকে মায়ের একটি পাথর পাওয়া যায়। সেখান থেকে মায়ের নামে এই থান।

মা একদিন ভোরবেলায় ব্যানার্জি পাড়ায় একজনের নোটে শাকের ক্ষেতে লালপাড় শাড়ী পরে শাক তুলতে গিয়েছিল। খেতের মালিক দেখে ভোর বেলায় দেখছে কেউ শাক তুলছে। সে তখন চোর চোর বলে তাড়া করে। মা তখন অর্ধেক শাক নিয়ে পালিয়ে আসে। কিন্তু পায়ের একটি নূপুর সেখানে থেকে যায়। পুরোহিত এসে দেখে থানে শাকের ছড়াছড়ি। এমন সময় সেই লোক এসে বলে যে আমার বাগানে কেউ ভোর বেলায় লোটে শাক চুরি করতে গিয়েছিল তার পায়ের একটি নূপুর বাগানে পড়ে গেছে। সেই মেয়েটি এই থানের দিকেই এসেছে। সেই সময় পুরোহিত আর সবাই বলল যে মায়ের পায়ের একটি নূপুর পাওয়া যাচ্ছে না। কই দেখি তোমার পাওয়া নূপুরকে? তখন সবাই দেখে যে সেই

হারিয়ে যাওয়া নূপুরের সাথে আর একটি নূপুর হুবহু মিলে যাচ্ছে। সবাই তখন বুঝতে পারে মায়ের নোটে শাক খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। সেইদিন থেকে মায়ের পুজোর সময় ওই শাক দেওয়া হয়।

সঞ্জয় ঘোষের থেকে পাওয়া কাহিনি— গুণানন্দ মতিলাল জয়নগরের প্রথম জমিদার। আজ থেকে চারশ বছর আগে যশর থেকে যাচ্ছিলেন এই আদিগঙ্গার পথ ধরে। তখন উনি এই জায়গায় সন্ধ্যেতে জাহাজ নোঙ্গর করে। সেই সময় উনি দেখতে পান এক সুন্দরী মেয়ে কলসি নিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান। উনি তখন ভাবতে লাগল যে এই মেয়ে এই বনের মধ্যে কি করে এলো! সেই মেয়ের পিছু করতে করতে একটি বকুল গাছের কাছে এসে সেই মেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাতে জমিদার স্বপ্ন পান জয়চণ্ডী বলছেন আমি এই বকুল গাছের নীচে আছি আমাকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা কর।

৩৯। সাক্ষাৎকারদাতা- সঞ্জয় ঘোষ ও মনিশংকর দেবনাথ

২৮। ০৯। ২০১৬

থান- শৈব তীর্থ

গ্রাম- বড়াশি, থানা- মথুরাপুর, জেলা- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

আখ্যান— বহুদিন আগেকার কথা, শোনা যায় আলিবর্দি খাঁ একবার এইখান থেকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি কিছু মানুষের চিৎকার শুনতে পান। তিনি নিজের কৌতুহল ভরে এইখানে আসেন। তিনি দেখতে পান যে একটি বকুল গাছ থেকে কিছু সন্ন্যাসী সূচাগ্র অস্ত্রের উপর ঝাঁপ দিচ্ছেন ও তাদের কিছুই হচ্ছে না। তিনি তখন তাদের বলেন যে আমি এই আমার বর্শা রাখছি তোমরা এর উপর ঝাঁপ দাও। সেই সময় প্রধান সন্ন্যাসীকে কেউ যেন বলে যে আমি যখন শঙ্খচিল হয়ে মাথার উপর থেকে উড়ে যাব তখন তুই ঝাঁপ দিস। সেই সন্ন্যাসী সেই মত সময় ঝাঁপ দিল আর বর্শাটি ভেঙে গেল।

আলিবর্দির আমলে এই জায়গাটি জঙ্গলে ভর্তি ছিল। সেই সময়ে এইখানে কিছু যোগী ছিল। তারা ওই বকুল গাছের নীচে থাকত আর হর হর বলে আওয়াজ তুলত। সেই সময় আলিবর্দি ঘোড়ায় করে এই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হর হর আওয়াজ শুনে ঘোড়া থেকে নামলেন। আলিবর্দি খাঁ

তখন জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা এখানে কেন? তারা তখন বলল আমরা শিবের ভক্ত, এখানে আমরা যোগ সাধনা করি। তখন আলিবর্দি খাঁ বলল তোমরা যে শিবের ভক্ত তার প্রমাণ কি আছে? তখন তারা বলল যদি প্রমাণ চান তাহলে প্রমাণ দেব। তখন আলিবর্দি খাঁ বলে যে আমি এইখানে তিন চারটি বর্শা রাখব তোমরা ওই গাছ থেকে বর্শার উপর ঝাঁপ দাও যদি তোমাদের শিব থাকে তাহলে সে তোমাদের বাঁচাবে। সেই কথা শুনে যোগীরা তাই করল কিন্তু তাদের কিছু হল না বর্শা ভেঙে গেল। তখন আলিবর্দি খাঁ বলে যে সত্যি তোমাদের শিব আছে। তিনি তখন তাদের বলল তোমরা আমার এই ঘোড়া নিয়ে সারাদিন যতটা ঘুরতে পারবে সেই জমি তোমাদের এই বাবার নামে হবে। সেই সময় কিছু গরু ওইখানে থাকত। সেই গরু শিবের মাথায় আপনা হতেই দুধ দিত। সেই দুধ শিব যেমন খেত আবার যোগীরাও খেত। এখানে তেমন কিছু চাষবাস হত না। তখন যোগীরা বাবার কাছে বলল ‘বাবা আমরা এখানে কি খাবো?’ তখন বাবা তাদের বলল ‘যাও মাঠে যাও, সেখানে চাষবাষ কর’। তখন তারা মাঠে গিয়ে ধান চাষ করতে লাগল। এর ফলে সেই যোগীদের খাওয়ার চিন্তা চলে গেল।

বাবার নামে যে পুকুর তাকে পরশমণি পুকুর বলা হত। শোনা যায় বাবার যে সাপ আছে সে ওই পুকুর দিয়ে চলাচল করত। একবার ওই পুকুরে সাপের মাথার মণি পড়ে যায়। সেখান থেকে বাবার পুকুরকে পরশমণি পুকুর বলা হয়। শোনা যায় যে কিছু এখানে তখন খাওয়ার জলের প্রচুর সমস্যা ছিল। তখন কিছু মানুষ একটি ছোট গর্ত করে বাবার কাছে প্রার্থনা করে যেন ওই গর্ত ভরে যায়। সকালে সবাই দেখে যে সত্যি সেই গর্ত জলে ভরে গেছে। তখনকার সময়ে ওই পুকুরে নানা রকম জিনিস মানুষে পেত। বাবার কাছে কেউ কিছু পার্থনা করলে পুকুরে সেই জিনিস ভেসে উঠত। আবার কাজ সারা হয়ে গেলে তা জলে ফিরিয়ে দিত।

৪০। সাক্ষাৎকারদাতা- রবীন্দ্রনাথ পাল

২৮। ০৯। ২০১৬

থান- নারায়নীর থান

পাড়া- খাঁড়ির ঘাট, গ্রাম- খাঁড়ি শ্রীনগর, পো- কাশীনগর, থানা- রায়দিঘি

আখ্যান— আগে এখানে জঙ্গলে ভর্তি ছিল। এই খাঁড়ি পথে মানুষ যাতায়ত করত। এই থানের কাছে কিছু মানুষ আগে বসবাস করত। মা রাতে যখন চলত মায়ের সঙ্গে তার জীবজন্তুরাও চলত ও নানাবিধ আওয়াজ করত। মানুষের বসতি থাকার জন্য মায়ের যাতায়তের অসুবিধা হত। মা যখন রাতে চলত সেই সময় তারা জানালা খুলে দেখত। মা তাদের স্বপ্ন দেয় যে আমি এই পথে যাই তোরা আমার অসুবিধা করিস না। তারা শোনেনি তাই তাদের বংশ শেষ হয়ে যায়। যারা নদীতে মাছ ধরতে যায় তারা এই মায়ের কাছে পুজো দিয়ে যায়। তারা যখন মায়ের পুজো করে যদি মায়ের কাছ থেকে ফুল পড়ে তবেই তারা নদীতে যায়। যদি কেউ অমান্য করে নদীতে যায় তার বিপদ হয়। একবার রবীন সর্দার নামে এক জেলে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে মায়ের কাছে পুজো দিতে আসে। সেই সময় থানে আরো অনেক জেলে পুজো দিতে আসে। সবার বেলায় মায়ের ফুল পড়ল কিন্তু রবীন সর্দার বেলায় ফুল পড়ল না। সবাই তখন নদীতে মাছ ধরতে গেল। তখন সেই জেলে ভাবতে লাগল সবার বেলা ফুল পড়ল আর আমার বেলা মা এমন করল! তখন সে মনে মনে ঠিক করল যা হয় হবে সবাই যখন জঙ্গলে গেছে আমিও যাব। যদি কিছু হয় মা ঠিক করে দেবে। তার বউ বারবার নিষেধ করতে লাগল আর বলতে লাগল যে মায়ের যখন অনুমতি নেই তুমি জঙ্গলে যেও না। তবু সে কারোর নিষেধ না শুনে জঙ্গলে যায়। সেই নৌকায় তিনজন জেলে থাকে। তারা যখন জঙ্গলে নামল একটি বাঘ এসে ওই রবীন সর্দারকে ধরল। তাকে আর ফিরিয়ে আনা গেল না।

৪১। সাক্ষাৎকারদাতা- মধুসূদন মিদ্যা

২৮। ০৯। ২০১৬

থান- মাইবিবির থান

গ্রাম+ পো- কাশীনগর, থানা- রায়দিঘি

আখ্যান— আমি আমার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনেছে যে এই থানটা জয়নগরের জমিদার ভদ্রেশ্বর নন্দী তৈরী করে দিয়েছিল। একবার আমাদের পাড়ার এক বউয়ের বাচ্চা হচ্ছিল না। সেই বউ তখন মায়ের কাছে মানত করে যে মা যদি আমার সন্তান হয় তাহলে আমি তোমায় পুজো দেব। সেই বউয়ের পরে সন্তান হয় কিন্তু সে ও তার স্বামী মায়ের শাড়ি দিয়ে পুজো দিতে ভুলে গিয়েছিল।

একদিন সেই বউ মায়ের কাছে পুজো দিতে এলে মা তাকে বেঁধে ফেলে। মা তখন তার উপর ভর করে। তার স্বামী এলে সেই বউ তখন বলে যে ‘ এই বেটা তোর বাচ্চা হল না বলে আমায় মানত করলি আর পুজো দেওয়ার বেলায় ভুলে গেলি? যদি তোর ভালো চাস তো আমায় নতুন শাড়ি দিতে পুজো দে। তারপর তারা মায়ের পুজো দেয়।

সাক্ষাৎকারদাতা- বিষ্ণুপদ নস্কর (৯০)

২৯। ০৯। ২০১৬, বৃহস্পতিবার

থান- মুকুট রাজার দিঘি ও কালুগাজী চম্পাবিবির থান

গ্রাম- শাহাজাদপুর, পো- নিমপীঠ, থানা- জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

আখ্যান— আজ থেকে পাঁচ পুরুষ আগেকার কথা, আমি আমার পূর্বপুরুষদের মুখে শুনেছি যে এটা মুকুট রাজার দিঘি। মুকুট রাজা বামুন ছিলেন। একদিন মুকুট রাজার মেয়ে চম্পাবতী চান করছে মুকুটের দীঘিতে, গাজী সাহেব যাচ্ছিলেন সেই পথে। গাজী সাহেবের চোখ পড়েছে মেয়েটির ওপর। তিনি তখন রাজাকে গিয়ে বললেন যে আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করব। তখন রাজা বলল আমি বামুন হয়ে মুসলমানকে মেয়ে দেব! তিনি বললেন যে হবে না। তখন আমাদের এই গ্রামের অনেক খাল ছিল ও অনেক খাঁড়ি ছিল। তার মধ্যে একটি ঘাটের নাম বুড়োর ঘাট। তো গাজী সাহেব ঠিক করলেন যে রাজা ও প্রজাদের শাসন করতে হবে। তিনি ঠিক করলেন প্রত্যেক প্রজার বাড়ির সামনে একটা করে বাঘ বসিয়ে রাখবেন। তখন তিনি এক দল বাঘকে ভেঁড়ায় পরিণত করে উপস্থিত হলেন। ঘাটে এসে দেখে যে একজন বুড়ো খেয়া পার করছেন, তখন তিনি সেই মাঝিকে বললেন আমার ভেঁড়াগুলোকে পার করে দেবে? নৌকায় যে মাঝি ছিল তার মা মারা গেছে, সে গলায় পৈতা নিয়ে পারাপার করছিল। বাবা বলল যে পারাপারের জন্য কি দেবো? তখন মাঝি বলল যে বাবা আমার মা মারা গেছে তাই তুমি যদি ওই বড় ভেঁড়াটা দাও তাহলে আমি ভালো করে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে পারি। ওই বড় ভেঁড়াটা ছিল দলের সেরা বাঘ, তো বাবা বলল আচ্ছা তাই হবে। এইভাবে তিনি নৌকায় উঠলেন ও নৌকার গুড়িতে ভেঁড়াগুলোকে বেঁধে দিলেন। নৌকা পাড়ে এসে লাগলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন ও ভেঁড়াগুলো সব বিরাট বিরাট বাঘ হয়ে গেলো! তখন মাঝি ভয় পেয়ে সব কিছু ফেলে দিয়ে

পালিয়ে গেল। এরপর তিনি সমস্ত প্রজার বাড়ির সামনে একটি করে বাঘ বসিয়ে রাখলেন। কেউ বাইরে বেরোতে পারে না তখন রাজা ভাবে কি হবে? শেষে তিনি রাজি হলেন ও এইখানে তিনিটি খুঁটি পুঁতে মুকুট রাজার মেয়েকে বিয়ে করেন। ওই থানের কাছে একটি পুকুর আছে, গাজী সাহেবের পুকুর এর নাম। ওই পুকুরে বিরাট শাল মাছ ঘুরে বেড়াত, তাদের মাথায় সিঁদুর দেওয়া। বিরাট কাঠ মাঝে মাঝে ভেসে উঠত আর কোন সময় জল শুকোতে পারা যেত না। ওই পুকুরের পাশেই ছিল ভুবন নস্করের বাড়ি। তার কোন ছেলে ছিল না একটি মাত্র মেয়ে ছিল। তাই সে বাবার কাছে কেঁদেছিল আর বলেছিল আমায় একটি ছেলে দাও। গাজীসাহেব ভুবন নস্করকে স্বপ্ন দিয়েছিল যে বুড়ো বয়সে তোর পরিবারের গর্ভে একটি ছেলে হবে, আর সে তালুক হবে। কিন্তু ছেলে যখন হবে তখন যেন কেউ না জানতে পারে। তখন তো কোন ডাক্তার ছিল না বাচ্চা দাইয়ের হাতে হত। যখন ছেলে হচ্ছিল দাই চিৎকার করে ওঠে– ও বাবা ছেলে উল্টো ভাবে হচ্ছে। দাইয়ের চীৎকারে সবাই জানতে পারে ও সেই ছেলেটি মারা যায়।

৪৪। সাক্ষাৎকারদাতা- নারায়ণ দাস

০৩। ১০। ২০১৬

থান- মনসার থান

ধবলাহাট, শিবপুর, সাগরদ্বীপ

আখ্যান— আমার জ্যাঠামশাই কোনোদিন ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করত না। তিনি সবসময় যাত্রা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ওই থানের কাছে একটি গেঁওয়া গাছ আছে। রাত্রে ওই গাছের কাছ দিয়ে মানুষ যেতে ভয় পেত। একটি চাঁদনি রাতে জ্যাঠামশাই রিহার্সাল করে ওই থানের কাছ দিয়ে ফিরছেন। ওই থানের কাছে এসে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তিনি দেখেন একটি মেয়ে সাদা শাড়ি পরে ওই থানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উনি আর ভয়ে এগোতে পারেনি, কিছুক্ষণ পরে সেই মেয়ে আসতে আসতে চলে যায়। তারপর জ্যাঠামশাই বাড়ি চলে আসেন, রাত থেকে ওনার প্রচুর জ্বর হয়। তিনি কিছুতেই আর সুস্থ হয় না। কলকাতার নানা ডাক্তার দেখিয়েও তিনি সুস্থ হন না। ডাক্তাররা দেখে বললেন ওনার আলসার হয়েছে। কলকাতা থেকে ওনাকে ফিরিয়ে আনা হয়। তখন জ্যাঠামশাইয়ের এমন অবস্থা যে বিছানা

থেকে উঠতে পারে না। সারা দিন-রাত বিছানাতেই শুয়ে থাকেন। একদিন রাতে তিনি স্বপ্ন পান কেউ যেন জ্যাঠামশাইকে বলছেন, ‘সেদিন রাতে তুই যে আমায় দেখেছিস আমি ওইখানেই আছি তুই আমার পুজো কর।’ পরদিন সকালে জ্যাঠামশাই বলে যে আমি ওই থানে যাব। সেখানে গেলে সেই থানের পুরোহিত বলে যে ‘তুই আসবি আমি আগে থেকে জানতে পেরেছি।’ তখন পুরোহিত জ্যাঠাকে কিছু পান্তা খেতে দেয় আর জ্যাঠামশাই আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যায়।

৪৫। সাক্ষাৎকারদাতা- রাজীব মিশ্র

০৩। ১০। ২০১৬

থান- বিশালক্ষীর থান

গ্রাম- ধবলাট পো- প্রসাদপুর, থানা- সাগরদ্বীপ

আখ্যান— প্রতি রাতে মা বিশালাক্ষী নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেত। মা গঙ্গার সাথে ওনার বিরোধ কেননা গঙ্গা যেহেতু গ্রামে ঢুকে আসছে তাই তিনি গঙ্গার সাথে যুদ্ধ করতে যেত। থানে যে আশাবাড়ি আছে সেই নিয়েই মা যুদ্ধ করতে যেত। মায়ের নাকের নথ মাঝে মাঝেই পাওয়া যেত না। সেই রাতেই মা আমার ঠাকুরদাকে স্বপ্ন দিত যে ‘আমি ওইখানে নাকের নথ ফেলে এসেছি তুই নিয়ে আয়।’ ঠাকুরদা সকালে গিয়ে দেখে যে সেইখানেই নথ পড়ে আছে। আবার কোনো কোনো সময়ে দেখা যায় মার কাপড়ে কাদা মাখা। রাত্রে ঠাকুরদা স্বপ্ন পায় যে আমি কাল রাতে গঙ্গার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম তাই আমার কাপড়ে কাদা লেগে গেছে। তুই আমায় নতুন শাড়ি কিনে দে।’

৪৬। সাক্ষাৎকারদাতা- শান্তি নস্কর

২৯। ০৯। ২০১৬

থান- বনবিবির থান

গ্রাম- দক্ষিণ কল্যাণপুর, পো- বারুইপুর, থানা- বারুইপুর

আখ্যান— আগে এইখানে বড় মাঠ ছিল। মাঠ যখন জলে ভর্তি থাকত যক্ষ তখন জালায় পসয়া নিয়ে যাতায়াত করত। আর কেউ যদি কোনো বিপদে পড়ে গলায় কাপড় দিয়ে মানত করত, তাহলে পয়সার থালা জলে ভেসে উঠত। একবার আমাদের গ্রামের এক বউ বিপদে পড়ে ওই মাঠে গিয়ে মানত করে। সে তখন অনুষ্ঠানের জন্য নানা জিনিস পায়। কিন্তু তার কাজ হয়ে গেলে সে লোভে পড়ে সেই সমস্ত জিনিস ফেরত দেয় না। সেইখান থেকে ওই মাঠে আর কোনো জিনিস ওঠে না।

আমাদের এই বনবিবি মায়ের থানের দরজা রাতে খোলা রাখতে হয়। কেননা মা রাতে যাতায়াত করে। একবার আমাদের পাড়ার এক বউয়ের ছেলের পেট খারাপ হয়েছিল। সে তখন মায়ের থান থেকে পুজোর ফুল নিয়ে মায়ের দরজা বন্ধ করে চলে যায়। রাত তিনটের সময়ে আমি হঠাত শুনতে পাই যে দরজায় কেউ দড়াম দড়াম করে লাথি মারছে। আমি তখন ভয়ে যেতে পারি না। আমার সঙ্গে আর একজনকে নিয়ে আমি তখন মায়ের দরজা খুলে দিয়ে আসি তারপর আওয়াজ বন্ধ হয়।

আরও একবার তখন অনেক রাত। আমি বারান্দায় শুয়ে আছি। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি তখন বারান্দায় চেয়ে দেখি যে চার জন অপরূপ মেয়ে ওই থানের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর আমার মনে হল কেউ যেন আমায় ডাকচ্ছে। আমি উঠে গিয়ে দেখি কেউ নেই। এই থানের সঙ্গে যে লিচু গাছটি আছে তার উপর মায়ের আশীর্বাদ আছে। কেননা এই লিচু গাছে কোন বছর ফল বন্ধ হয়নি। আর সব গাছে ফল বন্ধ হলেও এই গাছে কোনদীন ফল বন্ধ হয় না। আসলে এই গাছটি মায়ের গাছ বলে এই গাছে প্রচুর ফল হয়।

৪৭। সাক্ষাৎকারদাতা- প্রতাপ বারিক

৩০। ০৯। ২০১৬

থান- পঞ্চানন্দের থান

গ্রাম- দক্ষিণ কল্যাণপুর, পো- বারুইপুর, থানা- বারুইপুর

আখ্যান— কথিত আছে যে আমাদের এইখানে যে আদিগঙ্গা বয়ে চলেছে, আগে এই আদি গঙ্গার ঘাটে বাবা পঞ্চানন্দ স্নান করতে আসত। আমাদের গ্রামের মানুষ দেখত যে বাবা স্নান করে যেখানে থান

আছে সেইখানে জামাকাপড় পালটে অদৃশ্য হয়ে যেত। তখন গ্রামের সবাই বুঝতে পারে যে বাবা আসলে এই খানে থাকে। এই ঘটনা আমার বাবা-ঠাকুরদার আমলের কথা, তখন সবাই মিলে এইখানে বাবার থান করে দিয়ে বাবার পুজো করে।

৪৮। সাক্ষাৎকারদাতা- আশীষ দেবরায়

৩০। ০৯। ২০১৬

থান- বিশালাক্ষীর থান

গ্রাম- বিশালাক্ষীতলা, পো- বারুইপুর, থানা- বারুইপুর

আখ্যান— আজ থেকে অনেক বছর আগে এইখান দিয়ে আদিগঙ্গা বয়ে যেত। একবার মায়ের বেদী এই জায়গায় ভেসে ওঠে। মা তখন রাতে চৌধুরীদের স্বপ্ন দেয় যে আমি এইখানে আছি তোরা আমায় প্রতিষ্ঠা কর। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শোনা যে মা রাতে লাল শাক তুলতে যেত পুকুরের পাড়ে। মা পুকুরের পাড়ে লাল শাক তুলতে যায় সেখানে দেবদুলাল বলে একটি ছেলে ওই শাক মাড়িয়ে চলে যায়। মা তাকে রাতে স্বপ্নে তাড়া করে। সে তখন সকালে ওই জায়গায় গিয়ে প্রণাম করে আসে।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থ

বাংলা

আহমেদ, ওয়াকিল। *বাংলার লোকসংস্কৃতি।* ঢাকা: বাংলা একাডেমি। ১৯৭৪।

ইন্দু, কমল। *ভারতীয় সামাজিক সমস্যা।* কলকাতা: বানী প্রকাশন। ২০০৮।

ইন্দুভূষণ, অধিকারী (সম্পা)। *লোকধর্ম: অতীত ও বর্তমান।* কলকাতা: পূর্বাদ্রি প্রকাশন। ১৯৮৯।

ইসলাম, মযহারুল। *লোককাহিনি সংগ্রহের ইতিহাস।* ঢাকা: স্টুডেন্টোয়েজ। ১৩৭৬।

ইসলাম, শেখ রেজওয়ানুর। *সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন ও ঐতিহ্য।* কলকাতা: সমকালের জিয়নকাঠি। ২০১৩।

গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার। *বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন।* কলকাতা: অবভাস। ২০০৮।

গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার। *সমাজ সাহিত্য ও দর্শন।* কলকাতা: অবভাস। ১৩৭৩।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষনা পরিষদ। ২০০২।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ। ১৯৯২।

গুপ্ত, শুভেন্দু। *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১২।

ঘোষ, অমল কুমার। *বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮৯।

ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি(চতুর্থ খন্ড)।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৯৮৬।

ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি(তৃতীয় খন্ড)।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৯৮০।

ঘোষ, বিনয়। *বাংলার সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন। ১৩৮৬।

ঘোষ, রীতা। *বাংলার লোককথার রূপতত্ত্ব ও স্বরূপ সন্ধান।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ২০০৩।

ঘোষ, শিপ্রা। *লোকসংস্কৃতির আঙিনায়।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৭।

চক্রবর্তী চিন্তাহরণ। *হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান।* কলকাতা: প্যাপিরাস। ১৩৭৭।

চক্রবর্তী, নিশীথ। *বৈদিক লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: এবং মুশায়েরা । ২০১০।

চক্রবর্তী, পার্থ। *প্রকৃতি পরিবেশ নিসর্গনীতি: রাজনৈতিক ও দার্শনিক অনুসন্ধান।* কলকাতা: সেতু। ২০১২।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার। *লোক উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮৪।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা)। *লোককথার সাত কাহন।* কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ২০১১।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *প্রসঙ্গঃ লোকপুরাণ।* কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ১৯৯১।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *বাংলার লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৯।

চক্রবর্তী, বরুন কুমার(সম্পা)। *বঙ্গীয় লোকসংকৃতি কোষ।* কলকাতা: অপর্না বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ১৯৯৫।

চক্রবর্তী, বরুন কুমার(সম্পা)। *লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান।* কলকাতা: অপর্না বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ২০০৮।

চক্রবর্তী, বরুন কুমার। *বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস।* কলকাতা: পুস্তকবিপণি। ১৯৯৭।

চক্রবর্তী, রামাকান্ত। *বাঙালির ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: সুবর্ণরেখা। ২০০২।

চট্টোপাধ্যায়, ড. তুষার। *লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা।* কলকাতা: দে'জ। ২০০১।

চট্টোপাধ্যায়, তুষার। *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান।* কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ। ১৯৮৫।

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *অগ্রন্থিত রচনা: দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব।* কলকাতা: অবভাস। ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, সাগর। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পুরাকীর্তি।* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৫।

চট্টোপাধ্যায়, সৌগত(সম্পা)। *লোককথার বর্ণমালা।* কলকাতা: বঙ্গীয়সাহিত্য সংসদ। ২০১৪।

চৌধুরী কামিল্যা, মিহির। *বাংলার নারী সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুনশ্চ। ২০০৩।

চৌধুরী, কমল। *প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান।* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৬০।

চৌধুরী, ড. সুকোমল। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি। ১৯৯৭।

চৌধুরী, দুলাল। *বাংলার লোকউৎসব।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮৫।

চৌধুরী, প্রমথ। *উত্তর চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত।* কলকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস। ১৯৮৭।

চৌধুরী, সাধনকমল। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। ২০০২।

ছাটুই, তুহিনময়। *লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণে পীর, গাজী, বিবি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)।* কলকাতা: ১৯৯৮।

জানা, মনীন্দ্রনাথ। *সুন্দরবনের সমাজ সংস্কৃতি।* কলকাতা: দিলীপ বুক হাউস। ১৯৮৪।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিন্নপত্রাবলী। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১৯৬০।

ড. রায়, নরেন্দ্রনাথ। *উত্তরবঙ্গের লোক দেবদেবী ও লোকাচার।* কলকাতা: ছায়া পাবলিকেশন। ২০১২।

দাশ, বিবেকানন্দ। *গঙ্গারিডি দেশ ও জাতি।* কলকাতা: নানদনিক। ২০১৮।

দাশগুপ্ত, শশীভূষণ। *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য।* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ১৩৬৭।

দাস, গিরীন্দ্রনাথ। *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা।* বারাসাত: শেহিদ লাইব্রেরী। ১৩৮৩।

দাস, গোকুলচন্দ্র (সম্পা)। *চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০০৯।

দাস, গৌতম কুমার। *সুন্দরবন-মানুষ ও পরিবেশ।* কলকাতা: শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটর। ২০০৫।

দাস, নির্মেলেন্দু। *সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: জ্ঞানপ্রকাশ। ১৯৯৬।

দাস, বৃন্দাবন। *শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত।* কলকাতা: দে'জ। ১৯৯৫।

দেবনাথ, দোলা। *সাহিত্য বিচারে পরিবেশকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।* কলকাতা: গ্রন্থমিত্র, ২০১৩।

নন্দী চক্রবর্তী, কবিতা। *বাংলাসাহিত্যে পরিবেশচেতনা।* কলকাতা: আশাদীপ। ২০১৭।

নস্কর, ড. দেবব্রত। চব্বিশ *পরগনার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা।* কলকাতা: দে'জ। ১৯৯৯।

নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজ সংস্কৃতি।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৮।

নস্কর, দেবব্রত। *সুন্দরবন সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি অন্বেষণ।* কলকাতা: দে'জ। ২০১৭।

নস্কর, ধূর্জটি। *সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ।* কলকাতা: শ্যামলী পাবলিশর্স। ১৯৯৭।

নস্করও, ধূর্জটি। সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ। কলকাতা: শ্যামলী পাবলিশার্স। ১৯৯৭।

পোদ্দার, সুস্মিতা। *লোকসংস্কৃতিঃ ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।* কলকাতা: রুবি প্রকাশনী। ২০০১।

প্রামানিক, শঙ্করকুমার। *সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন।* কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ। ২০০৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর। *পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসীবাসী কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০১।

বসাক, শীলা। *বাংলার কিংবদন্তি।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৩।

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা।* কলকাতা: দে'জ প্রকাশনী। ১৯৬৬।

বাগচী, দীপক কুমার। *ভারতীয় দর্শন।* কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক। ১৯৯৭।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা)। *লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য।* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। ২০০৮।

বিশ্বাস, মন্টু। *সুন্দরবনের লোককথা।* কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী। ২০১২।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার-লোকসংকৃতি।* নয়াদিল্লি: ন্যাশানাল বুকি ট্রাস্ট। ২০০৫।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *ধর্ম ও সংস্কৃতি: প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট।* কলকাতা: আনন্দ। ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, মিহির (সম্পা) । *লোকশ্রুতি।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসীবাসী কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ১৯৯৯।

ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পা)। *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী।* কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৮।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ১৩৯৪।

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ। *হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।* কলকাতা: ফার্মা কেএল এম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮০।

ভুক্ত, অনিন্দ্য। *পরিবেশ প্রসঙ্গ: তত্ত্বে ও তথ্যে।* কলকাতা: মিত্রম। ২০০৬।

মজুমদার, তুলিকা। *বাংলার বনদেবতা।* কলকাত: লক্ষী নারায়ণ প্রেস। ২০০৭।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *আদিবাসী প্রেমের লোককথা।* কলকাতা: এবং মুশায়েরা।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *আদিবাসী মিথকথা।* কলকাতা: পরম্পরা। ২০১৩।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। লোককথার ঐতিহ্য। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮৬।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *লোককথার টাইপ মোটিফ ইনডেকস।* কলকাতা: গাঙচিল। ২০১২।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *লোককথার লিখিত ঐতিহ্য।* কলকাতা: গাঙচিল। ২০০৯।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। *লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ও লোকায়ত মন।* কলকাতা: গাঙচিল। ২০১০।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ।* বারুইপুর: ১৯৯৭।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায়।* কলকাতা: নব চলন্তিকা। ১৯৯৯।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য।* কলকতা: নব চলন্তিকা। ২০১০।

মণ্ডল, বরেন্দু (সম্পা)। দ্বীপভূমি সুন্দরবন। কলকাতা: ছোঁয়া। ২০২০।

মণ্ডল, শশাঙ্ক। *বৃটিশ রাজত্বে সুন্দরবন।* কলকাতা: পুনশ্চ। ১৯৯৫।

মণ্ডল, সুজিত কুমার (সম্পা)। *বনবিবির পালা।* কলকাতা: গাঙচিল। ২০১০।

মল্লিক, পান্নালাল। *বসিরহাট মহকুমার ইতিকথা।* বসিরহাট: প্রদেশ। ২০০৮।

মান্না, অসীমকুমার। *দক্ষিণবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি।* কলকাতা: লোকসখা পকাশনী। ২০১১।

মিস্ত্রি, সুভাষ। *দক্ষিণ বঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র।* সোনারপুর: লোকপ্রকাশনী। ২০০০।

মিস্ত্রি, সুভাষ। *লোকায়াত সুন্দরবন।* সোনারপুর: লোকপ্রকাশন। ২০১৩।

মুখোপাধ্যায়, অসীম। চব্বিশ পরগনার মন্দির। কলকাতা। ১৩৭৭।

মুখোপাধ্যায়, নির্মেলেন্দু। *আদিগঙ্গা প্রত্ন-পরিক্রমা।* কলকাতা: ভস্তক। ১৯৯৫।

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। *গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি।* কলকাতা: জি. এস. পাবলিকেশন। ১৯৯৫।

মুখোপাধ্যায়, সোমা। *রাঢ়বঙ্গের লোকমাতৃকা।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসীবাসী কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৪।

মুখোপাধ্যায়, সোমা। *সংস্কৃতির উত্তারাধিকার ও বাংলার লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: একুশ শতক। ২০১০।

মৈত্র, অলোক। *বাংলার লৌকিক ধর্মাচারের ঐতিহ্য সন্ধানে।* কলকাতা: পুস্তক বিপণী। ২০০০।

রফিকুল ইসলাম, খোকন। *সুন্দরবনের লোকায়তজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি।* খুলনা: রূপান্তর। ২০১৩।

রহিম, আবদুর। *গাজী কালু চম্পাবতী কন্যার পুথি।* কলকাতা: গাওসিয়া লাইব্রেরী.২০০১।

রায়, অরুন কুমার। *লোকায়ণ চর্চার ভূমিকা।* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসীবাসী কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ১৯৯৫০।

রায়, তপন। *ভারতের লোকসংস্কৃতি তুলনামূলক বিশ্লেষণ।* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। ২০১০।

রায়, তপন। *লোককথার তত্ত্বকথা।* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। ২০১০।

রায়, তপন। *লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানে তুলনামূলক পদ্ধতি।* কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স। ২০১০।

রায়, ভব। *বাংলার লোকবৃত্ত ও লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা।* কলকাতা: জয়দূর্গা লাইব্রেরী। ১৪০৮।

রায়, মোহিত (সম্পা)। *পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন।* কলকাতা: অনুষ্টুপ। ২০১৫।

রায়, মোহিত। *পুকুরের রূপকথা।* কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ। ২০১৫।

লাহা, জাতক। *ভারতের লোককথা।* কলকাতা: পুনশ্চ। ২০০৩।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। *বিষয়: বৌদ্ধধর্ম।* কলকাতা: করুণা প্রিণ্টার্স। ২০০২।

শেখ, মকবুল ইসলাম। *চৈতন্যমহাপ্রভু ও লোকসংস্কৃতি।* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১২।

সরকার, কনকচন্দ্র। *বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: রত্না প্রকাশন। ২০০৩।

সরকার, কল্যাণ কুমার। *পরিবেশবিদ্যাবাদ পরিবেশ ও রাজনীতি: বিদেশ-বিশ্ব ও ভারতবর্ষ একটি অনুসন্ধিৎসু বীক্ষা।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০১৫।

সরকার, প্রণব। *বাংলার লোকসমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: লোক। ২০১৩।

সরকার, রেবতীমোহন। *লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিদ্যা।* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০৫।

সাঁতরা, তারাপদ। *কলকাতার মন্দির, স্থাপত্য, অলংকরণ, রূপান্তর।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০০২।

সাঁতরা, তারাপদ। *পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্যঃ মন্দির ও মসজিদ।* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ১৯৯৮।

সাহা, সঞ্জীব। *ধর্মীয় উদ্ভিদ লোককথা, সংস্কৃতি ও আধুনিক বিজ্ঞান (১) ।* কলকাতা: কানন প্রকাশনী। ২০১৩।

সাহা, সঞ্জীব। *ধর্মীয় উদ্ভিদ লোককথা, সংস্কৃতি ও আধুনিক বিজ্ঞান (২) ।* কলকাতা: কানন প্রকাশনী। ২০১৪।

সুর, সুজিত। বনবিবি- উৎস সন্ধানে। কলকাতা: লোকলৌকিক প্রকাশনী। ১৩৮৮।

সেন, অঞ্জন ও সিংহ উদয়নারায়ণ (সম্পা)। *মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি।* কলকাতা: ভাষা বন্ধন প্রকাশনী। ১৯৯১।

সেন, অতুলচন্দ্র, তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ ও ঘোষ, মহেশচন্দ্র (অনুদিত ও সম্পাদিত)। কলকাতা: *উপনিষদ।* হরফ প্রকাশনী। ২০১০।

সেন, গোপীনাথ। *পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৩৯৪।

সেন, সৌমেন। *লোকসংস্কৃতির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা।* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসীবাসী কেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৩।

সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পা)। *লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮২।

সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৫।

সেনগুপ্ত, পল্লব। *পূজা পার্বণের উৎসকথা।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৩৯১।

সেনগুপ্ত, পল্লব। লোককথার অন্তর্লোক। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ২০০০।

সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ।* কলকাতা: পুস্তকবিপনি। ১৯৯৫।

হাফিজ, আবদুল। *লোককাহিনির দিক-দিগন্ত।* ঢাকা: মুক্তধারা। ১৯৭৬।

হাফিজ, আব্দুল। *লোককাহিনির দিক দিগন্ত।* ঢাকা: মুক্তধারা। ১৯৭৬।

হাফিজ, আব্দুল। *লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ।* ঢাকা: মুক্তধারা। ১৯৭৫।

হাবিব, ইরফান। *মানুষ ও পরিবেশ: ভারতবর্ষের বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ২০১৫।

হালদার, বিমলেন্দু। *দক্ষিণবঙ্গের জনসংস্কৃতি ও ইতিহাস বিচিত্রা(প্রথম খন্ড)।* কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া। ২০০১।

হালদার, মঞ্জু। *প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য।* কলকাতা: উর্বী প্রকাশনী। ২০১৩।

হোসেন, মোহা.। মোশাররফ। *প্রসঙ্গ পুরাকীর্তি।* ঢাকা: দিব্য প্রকাশ। ২০১২।

ইংরেজি

Buell, Lawrence. *The Enviornmental Imagination: Thoreau, Nature writing and Formating Of American Culture.* Havard University Press. 1995.

Carson, Rachel. *Silent Spring.* London : Penguin Classics. 2000.

Frederick O, Waage (ed.). *Teaching environmental Literature: Materials, Methods, resources.* New York: MLA. 1985.

Garrard Greg, I. *Beginning: Pollution, Ecocriticism.* London & New York: Routledge. 2007.

Garrard, Greg(ed.). *The Oxford Handbook of Ecocriticism.* New York: Oxford University press. 2014.

Glotfelty, Cheryll and Harold, From (eds.) *The Ecocritism Reader: Landmarks in Literary Ecology.* London: University of Georgia. 1996.

Huggan, Graham & Tiffin, Helen. *Post Colonial Ecocriticism: Literature, animal, Environment*. London & New York: Rouledge. 2010.

Kerridge, Richard. *Environmentalism and Ecocriticism : Literary Therory and Criticism*. New York: Oxford University Press. 2007.

Love, Glean A. *Practical Ecocriticism: Literature, Biology and Environment*. London: University Of Virginia Press. 2003.

Waugh, Patricia (ed.) *Literary Theory and criticism.* New York: Oxford University Press. 2006.

প্রবন্ধ

ঘোষ, দিলীপ। 'জটার দেউল এক অনন্য স্থাপত্য কীর্তি'। *সুচেতনা,* ৪০ তম সংকলন। বারুইপুর। ২০১৬।

ঘোষ, সঞ্জয়। 'জটার দেউল: সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোন থেকে'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* তৃতীয় সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৫।

চৌধুরী, ড. দুলাল। 'দক্ষিণরায়'। *বাঘ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮০।

দাস, ড. গৌতম কুমার। সুন্দরবনের জলবায়, প্রকৃতি ও পরিসংখ্যান'। নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, তৃতীয় সংখ্যা। ২০০৩।

নস্কর, দেবব্রত। 'রায়দিঘি কঙ্কনদীঘী ও লুপ্ততীর্থ জটা'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* চতুর্থ সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৩।

নস্কর, ধূর্জটি। 'সুন্দরবনের গ্রামদেবতা ও সর্বজনীন মেলা-উৎসব'। *শ্রীখণ্ড সুন্দরবন।* কলকাতা: দীপ প্রকাশন। ২০০৫।

নস্কর, ধূর্জটি। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন: শৈবপ্রভাব ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* চতুর্থ সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৬।

নস্কর, ধূর্জটি। 'সুন্দরবনের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি'। *সুচেতনা,* দ্বিতীয় সংখ্যা। বারুইপুর: তিতীর্ষা গ্রাফিস্ক সেন্টার। ২০১৪।

পত্রনবীশ, সৈকত। 'বোধিবৃক্ষ'। *সুন্দরবনের মুখ,* চতুর্থ সংখ্যা। ক্যানিং: সুন্দরবন অনুভব। ২০১৫।

পুরকাইত, দেবাংশু। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মেলাআ ও উৎসব: আলিদার বিবিমার মেলা'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* নদী সংখ্যা-৭, চতুর্দশ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১৪।

পেয়াদা, দেবপ্রসাদ। 'দারুময়ী দূর্গা, বিশালাক্ষী ও অন্যান্য দেবী এবং কিংবদন্তি'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* বিংশ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১৭।

বসু, প্রসেনজিৎ। 'ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির: কিংবদন্তি-সমীক্ষা'। *সাহিত্যতক্কো।* বারাসাত: মিলেনিয়াম প্রিন্টার্স। ২০১৩।

বাগ, রাধানাগ। 'বিবাহিত বট-অশ্বত্থ'। *লোকপরিচয়।* বাখরাহাট: লোকপরিচয় গবেষণা পরিষদ। ২০১৪।

ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ। 'নিম্নবঙ্গের ব্যাঘ্র-বিশ্বাস ও সাহিত্য। *বাঘ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮০।

ভট্টাচার্য, নন্দদুলাল। 'সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে'। *শ্রীখণ্ড সুন্দরবন।* কলকাতা: দীপ প্রকাশন। ২০০৫।

ভূঞ্যা, ফাল্গুনি। 'বনবিবি পালাগানঃ বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের স্বরূপ নির্ণয়ে একটি মনঃসমীক্ষণ'। *সমকালের জিয়নকাঠি,* দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস। ২০০৮।

মজুমদার, মেহেন। 'আটঘরার দমদমা ঢিপি আর কালিদাস দত্তের অনুপ্রেরণা টেনে নিয়ে গেল স্থানীয় ইতিহাস চর্চা'। *সুচেতনা* (দ্বিতীয় সংখ্যা)। রাজগড়া: তিতীর্ষা গ্রাফিক্স সেন্টার। ২০১২।

মণ্ডল, অজয়। 'ক্ষেত্রানুসন্ধানে আলোকে সন্দেশখালির চড়ক'। *অভিযাত্রী ফেরী: লোকউৎসব সংখ্যা,* প্রথম সংখ্যা। কলকাতা: ফেরী। ২০১২।

মণ্ডল, অঞ্জলি বিকাশ। 'সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতিঃ বনজীবী সম্প্রদায়ের দেবদেবী-বনবিবি ও দক্ষিণরায়'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র: জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-১,*ষষ্ঠ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১০।

মণ্ডল, উত্তম কুমার। 'সুন্দরবন: আদিবাসী সংস্কৃতির সংকট'। *সমকালের জিয়নকাঠি* (যুগ্ম সংখ্যা)। বারুইপুর: এল টি এম গ্রাফিক্স। ২০১৫।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মন্দির শিল্প: কেশবেশ্বর মন্দির'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র।* ২০০২।

মণ্ডল, গৌতম। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 'দ্বীপচণ্ডী' আসলে নারায়ণীতলার 'নারায়ণী'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* দ্বিতীয় সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৩।

মণ্ডল, জীবন। 'জাঁতাল মেল'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৪।

মণ্ডল, শৈলেন্দ্রনাথ। 'সুন্দরবনের মেলা ও উৎসব: কাশীপুরের ধর্মের জাতের মেলা'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* নদী সংখ্যা-৭, চতুর্দশ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১৪।

মিত্র, সনৎকুমার। 'দক্ষিণবঙ্গের লোকদেবতা বাঘ'। *বাঘ ও সংস্কৃতি।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮০।

মিদ্যা, দেবীশংকর। 'জটার দেউল'। *গ্রামোন্নয়ন কথা,* দ্বিতীয় সংখ্যা। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ। ২০১৩।

মিদ্যা, দেবীশঙ্কর। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবী: বেনাকি'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* চতুর্থ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০০৪।

মিদ্যা, দেবীশঙ্কর। 'মাকাল ঠাকুর: প্রত্ন সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* পঞ্চম সংখ্যা। সোনারপুর। ২০০৫।

মিস্ত্রি, ড. সুভাষ। 'সুন্দরবনের লৌকিক দেবী বনবিবি: একটি পর্যালোচনা'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* পঞ্চম সংখ্যা। সোনারপুর। ২০০৫।

মিস্ত্রী, অভিজিৎ ও বানু, নাসরিন। 'পরিবেশনীতি বনাম সুন্দরবনের মৎস্যশিকারী'। *আন্তর্জাতিক পাঠশালা।* কলকাতা: পাঠশালা প্রোডাকসন্স। ২০১৩।

মুখোপাধ্যায়, সোমা। 'অলক্ষী বিদায়'। *লোকশ্রুতি,* সংখ্যা-১১। কলককাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০১৩।

মৃধা, শশাঙ্ক শেখর। 'সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি,* সংখ্যা-৬, ত্রয়োদশ সংখ্যা। ২০১৩।

রমা, মণ্ডল। 'পরিবেশ আন্দোলনে নারীর ভূমিকা'। *ঋতবীনা: বিশ্ব পরিবেশ ভাবনা।* কলকাতা: ইন্টারন্যাশানাল প্রিন্টিং। ২০০৯।

সরকার, প্রদ্যুৎ। 'বারাঠাকুর'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* দ্বাবিংশ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১৮।

সরদার, প্রদ্যুৎ কুমার। 'সুন্দরবনের মেরীগঞ্জ অঞ্চলের লোকায়ত জীবন ও গ্রামীন সংস্কৃতি'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* তৃতীয় সংখ্যা। ২০০৩।

সরদার, মায়ারানী। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং সুন্দরবনের লোকদেবতাও উৎসব: ধর্মঠাকুর ও ধর্মের জাত'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* দ্বাবিংশ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০১৮।

সর্দার, সত্যচরণ। 'সুন্দরবনের নদীতীরে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র,* নদী সংখ্যা-৩, চতুর্থ সংখ্যা। সোনারপুর। ২০০৯।

সিরাজ, সাজাহান। 'সুন্দরবনের মেলা, পার্বণ ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন'। *শ্রীখণ্ড সুন্দরবন।* কলকাতা: দীপ প্রকাশন। ২০০৫।

সেনগুপ্ত, প্রদীপকুমার। 'পরিবেশ উন্নয়ন ও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি'। *ঋতবীনা: বিশ্ব পরিবেশ ভাবনা।* কলকাতা: ইন্টারন্যাশানাল প্রিন্টিং। ২০০৯।

হালদার, বিমেলেন্দু। 'সুন্দরবনের লোকাচারঃ পূজা পার্বণে-গাছড়া-লতা-পাতার ব্যবহার'। *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি,* সংখ্যা-৬, ত্রয়োদশ সংখ্যা। ২০১৩।

পত্রিকা

চট্টোপাধ্যায়, অর্ঘ্যচন্দন। *জটার দেউল এর ইতিবৃত্ত।* কুলতলী: প্রভাবতী অফসেট প্রিন্টার্স। ২০১২।

চৌধুরি কামিল্যা, মিহির। *রাঢ়ের লৌকিক দেবদেবী।* লোকদর্পণ (প্রথম সংখ্যা)। নদীয়া: লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৫।

ছাটুই, সন্তোষ কুমার। *ময়দা ও ময়দার পাতালভেদী কালী।* দক্ষিণা কালীবাড়ী উন্নয়ন কমিটি।

দাস, আনন্দ। *সুন্দরবনের অঞ্চলিক ইতিহাস,* সুন্দরবন সংখ্যা-৭। ক্যানিং: অধিকারী প্রিন্টিং সেন্টার।

পাল, সত্যব্রত (সম্পা)। *সোনারপুরের ইতিহাস।* সোনারপুর: অনুভব প্রকাশনী। ২০০৪।

বিশাস, অচিন্ত্য। *অভিযাত্রী ফেরী,* চতুর্থ সংখ্যা। কলকাতা: ফেরী। ২০১০।

মণ্ডল, শ্যামাপদ। আয়ত: গাছপালা বিশেষ সংখ্যা। কলকাতা: মাইতি ডিটিপি। ২০১৩।

সরকার, প্রণব। *সংবাদপত্রে সেকালের মেলা ও উৎসব।* কলকাতা: পদ্মনাভ ইমপ্রেশান। ২০১০।

সরকার, প্রণব। *সুন্দরবনের আঞ্চলিক জীবন, বিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতি।* কলকাতা: পদ্মনাভ ইম্প্রেশান। ২০১০।